পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য অনুমোদিত।
[*Vide Notification No. Syl/80/54, Calcutta, the 27th December, 1954*]

সরল গার্হস্থ্য বিদ্যা

(দ্বিতীয় ভাগ)

(৭ম ও ৮ম শ্রেণীর বালিকাদের জন্য)

পাটনা প্রিন্স অব ওয়েলস্ মেডিক্যাল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শারীর বিদ্যা বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও কলিকাতা, আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজের শারীর বিদ্যার অধ্যাপক

শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

ডি. এস্-সি (এডিন) ; এম. এস্-সি. ; এম. বি. (কলিকাতা) ;
এম. আর. সি. পি. ; এফ্. আর. এস্. ই.

প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান—

উদীয়মান প্রকাশক

২০৮।২ জি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীজানকীপ্রসাদ সেন
জে. পি. সেন এণ্ড ব্রাদার্স
৯।৭ বি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মূল্য—আড়াই টাকা মাত্র

মুদ্রাকর—শ্রীফণিভূষণ হাজরা
গুপ্তপ্রেস
৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

সরল গার্হস্থ্য বিদ্যা

দ্বিতীয় ভাগ

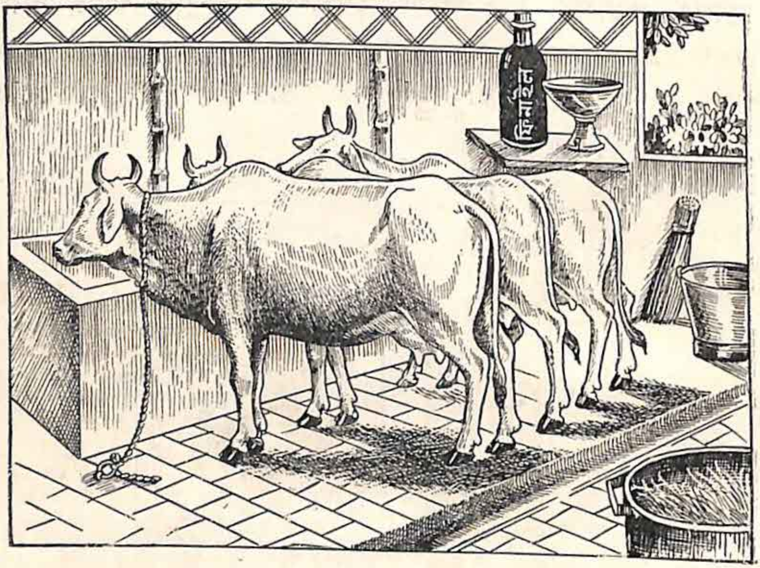
সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য

প্রথম অধ্যায়

বাসগৃহ

বাসগৃহ বলতে আমরা যেখানে থাকি বা বাস করি, তাহাই বুঝায়; কিন্তু তাই ব'লে বাসগৃহ ত আর শুধু কোন রকমে মাথা গুঁজে থাকবার ঠাঁই নয়। যেখানে আমরা হাত-পা ছড়িয়ে, আরাম করে শোওয়া-বসা, খাওয়া-দাওয়া, পড়া-শোনা, চলা-ফেরা করি, তাই আমাদের যথার্থ বা প্রকৃত বাসগৃহ বা বাড়ী। শহরের ঘিঞ্জি অলি-গলিতে, যেখানে একবাড়ীর সঙ্গে চারপাশের বাড়ীগুলি অনবরত মাথা ঠোকাঠুকি করছে, সেখানে দিনের বেলায় সূর্যের আলো কিংবা রাতেও আকাশের চাঁদ বা তারা দেখবার জো নেই এবং বাতাস শুধু নিজের খেয়াল-খুসীমতই ছুটি পাঁচিলের উপর ধাক্কা খেতে খেতে অতি সংকীর্ণ বদ্ধ স্থানে এসে ঢুকতে পারে। এরকম গৃহে বাস করতে হলে কার না প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে? মানুষ ত সাপ-ব্যাঙের মত শীতকাতুরে অন্ধকারের জীব নয়, সুতরাং সে সকল সময়েই খোলা-মেলা স্থানে, প্রচুর আলো ও মুক্ত বাতাসের মধ্যে থাকতে চায়। উপযুক্ত খাদ্যের মতই উপযুক্ত আলো ও হাওয়া তার সুস্থ জীবন-ধারণের জন্য একান্ত আবশ্যক। তাই বাড়ীর চারিদিকে খানিকটা খোলা জমি তার চাই-ই, যাতে তার বাড়ীর মধ্যে সর্বদাই প্রচুর আলো ও বাতাস আপনিই এসে ঢুকতে পারে। আর খোলা জায়গায় সে ইচ্ছে ও পছন্দমত তৈরী করে নরম সবুজ গালচের মত 'লন' কিংবা নানা ফুলের সুবাসে ও হাসিতে উজ্জ্বল ছবির মত একটি বাগান! মানুষ স্বভাবতই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপাসক, তাই বাসের জন্য বিলাস-ব্যসনের উপযুক্ত প্রাসাদের মত বাড়ীতে থেকেও সে তৃপ্ত হয় না, যদি না তার আশপাশে

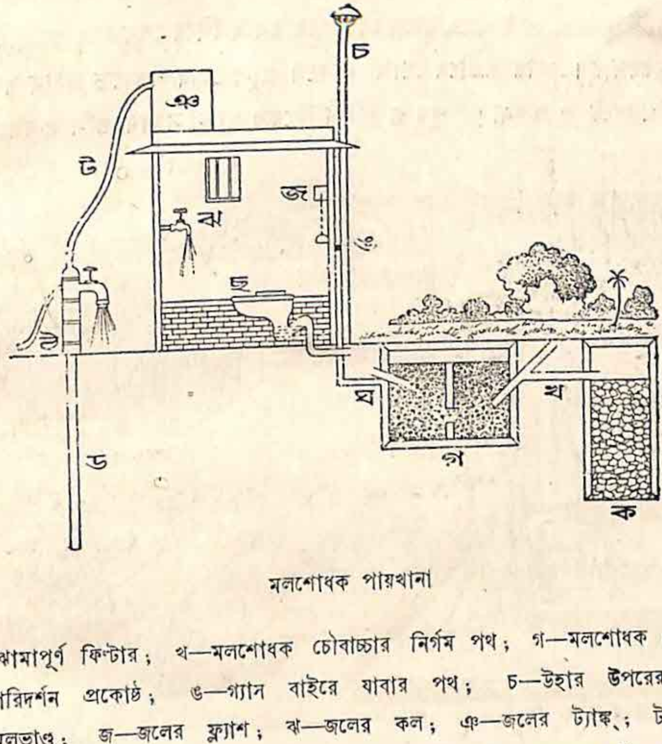
হয়, যাতে নীচের ধানগুলি জল শোষণ ক'রে ভিজে না উঠে। উত্তর-পশ্চিমের দিকে শাক-সবজির বাগান পার হয়ে গরুর জন্য গোয়াল-ঘরের ব্যবস্থা করা উচিত। গোয়ালের মেঝে অবশ্যই পাকা হবে, এবং তা পিছনের দিকে হবে খানিকটা ঢালু, যাতে গরুর প্রস্রাব, গোয়াল-ধোওয়া জল প্রভৃতি অনায়াসে



আদর্শ গোয়ালঘর

গড়িয়ে বাড়ীর বাইরে কোন গর্তে চলে যেতে পারে। খুব কাছে কিন্তু ঘোড়ার আস্তাবল থাকা উচিত নয়। তারপর আরও উত্তর-পশ্চিম কোণে থাকবে পায়খানার স্থান। পাড়াগাঁয়ে মলশোধক পায়খানাই সকলের চেয়ে ভাল। কারণ এই পায়খানায় মলত্যাগের পর প্রচুর জল ঢেলে দিলে আর একটুও দুর্গন্ধ থাকে না। কিন্তু এ ব্যবস্থার জন্য খানিকটা জায়গার আবশ্যক, কারণ মলত্যাগের পাত্র ও তার নীচের ইংরেজি অক্ষর Uর মত জলাধারটি ঘরের মধ্যে থাকলেও, মল-নিকাশের নলটি খানিক দূরে গিয়ে পড়বে একটি মলশোধক চৌবাচ্চায়, যেখানে জীবাণুর সাহায্যে দূষিত ও দুর্গন্ধ কঠিন মল কতকটা নির্দোষ ও গন্ধশূন্য তরল পদার্থে পরিণত হবে এবং তা আর একটি নলের সাহায্যে ঝামা ও কয়লা-ভর্তি আর একটি চৌবাচ্চার মধ্য দিয়ে গিয়ে নির্দোষ ও সম্পূর্ণ দুর্গন্ধহীন অবস্থায় ঢালু বড় ড্রেন বা নরদমায় পড়বে।

মেথরের বন্দোবস্ত থাকলে খাটা পায়খানা করা যেতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে মল এবং প্রস্রাব ও শৌচের জলের জন্য ছুটি আলাদা পাত্র থাকবে। খাটা পায়খানার স্থানে যাতে প্রচুর রোদ পড়ে তার ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক। মেথরের অভাবে কুয়ো পায়খানা করাই ভাল। একটা কুয়োর মত গর্ত করে



মলশোধক পায়খানা

ক—ঝামাপূর্ণ ফিল্টার; খ—মলশোধক চৌবাচ্চার নির্গম পথ; গ—মলশোধক চৌবাচ্চা; ঘ—পরিদর্শন প্রকোষ্ঠ; ঙ—গ্যাস বাইরে যাবার পথ; চ—উহার উপরের অংশ; ছ—মলভাণ্ড; জ—জলের ফ্লাশ; ঝ—জলের কল; ঞ—জলের ট্যাঙ্ক্; ট—নলকূপ থেকে জল উপরের ট্যাঙ্কে যাবার পাইপ; ঠ—নলকূপ; ড—নলকূপের নীচের অংশ।

তার উপর কাঠের পাটাতনে বসবার ব্যবস্থা থাকবে। আর কাছেই একটা বড় কাঠের বাক্সে কিংবা টিনের ড্রামে থাকবে ছাই বা মাটি ও একটি বড় হাতা; যাতে প্রতিবার ব্যবহারের পরেই ঐ হাতার সাহায্যে প্রচুর ছাই বা মাটি দিয়ে মল ও মূত্রকে চাপা দেওয়া যায়।

গৃহসংলগ্ন প্রাঙ্গণ ও উদ্যান

আবার বাসগৃহের দক্ষিণে কিংবা পূবে যদি থাকে ফুলের বাগান, তা হ'লে নানা রঙের মরসুমী ফুল যখন ফুটতে থাকবে, তখন তা হবে চোখের পক্ষে উপাদেয়। আবার বেল, জুঁই, রজনীগন্ধা, গোলাপ, গন্ধরাজ, শিউলি, হাসনাহানা

প্রকৃতি-রাণীর নিজস্ব সৌন্দর্যের কিছু না কিছু ছোঁয়াচ থাকে। তাই বহু প্রাসাদোপম বাড়ীর গায়ে দেখা যায় লাগানো হয়েছে দেশী বা বিদেশী লতা, কোথাও উঠানে গড়ে তোলা হয়েছে কৃত্রিম পাহাড়, ঝোপ-ঝাড় কিংবা জলের ফোয়ারা। উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে, চোখের বা মনের কতনা তৃপ্তি যোগায় এ সকল পারিপার্শ্বিক আড়ম্বর! কিন্তু শহরে ক'জনের পক্ষে বিলাস-ব্যসনের উপযোগী বিরাট বাড়ী ও প্রশস্ত উঠানের সর্বত্র এজাতীয় রুচি বজায় রাখা সম্ভব? একমাত্র অতুল ঐশ্বর্যশালী যারা, শুধু তাদের পক্ষেই শহরে বাস করেও এরূপ বিলাসিতা বা আরাম উপভোগ সম্ভবপর। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে, যেখানে জমির দাম খুব বেশী নয়, সেখানে দালান-কোঠাতেই হোক, আর কুঁড়েঘরেই হোক, মধ্যবিত্ত ও সাধারণ লোকের পক্ষেও এভাবে কতকটা ছড়িয়ে ও আরাম ক'রে বাস করা সহজ। ইচ্ছে থাকলে নিজ নিজ বাড়ীর চারদিকে এরকম চোখের ও মনের তৃপ্তিদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা খুব কঠিন নয়। তাতে একদিকে যেমন মন ভাল থাকে, অন্যদিকে তেমনি খোলা-মেলা স্থানে মুক্ত হাওয়া ও প্রচুর সূর্যালোকে শরীর নীরোগ হয় এবং স্বাস্থ্যও অটুট থাকে। সুতরাং স্বাস্থ্যকর ও নয়নাভিরাম বাসগৃহের অধিকারী হতে হ'লে সুষ্ঠু ও উপযুক্ত পরিকল্পনা চাই।

গৃহের বিভিন্ন অংশ

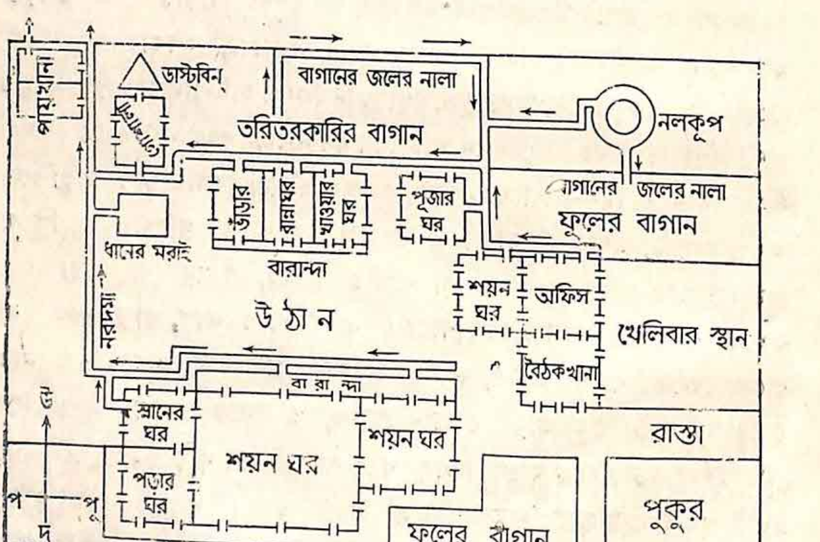
আদর্শ (বা স্বয়ংসম্পূর্ণ) **বাড়ী** বলতে আমরা কাঁচা কিংবা পাকা বাসগৃহই বুঝি না, একটা নির্দিষ্ট চৌহদ্দির মধ্যে পাকা বা কাঁচা ঘরে, সামনের খোলা জায়গা, পেছনের উঠান, ফুলের ও শাকসবজির বাগান, পূজোর ঘর, রান্নাঘর, খাবার ঘর, ভাঁড়ার ও স্নানের ঘর গোয়াল ঘর, আস্তাবল পায়খানা, এ সব কিছু নিয়ে অত্যন্ত পরিচিত ও প্রিয় যে স্থান তার কথাই বুঝি। আবার বাড়ীর বিভিন্ন অংশ—যেমন শোয়ার ঘর, বসবার ঘর, অতিথি-অভ্যাগতের বসবার ঘর, অতিথির শয়ন-ঘর, স্নানের ঘর, পড়ার ঘর ও ছেলে-মেয়েদের খেলার ঘর এবং প্রচুর আলো বা বাতাসযুক্ত এক বা একাধিক বারান্দাও তার অন্তর্গত। পানীয় ও স্নানের এবং অন্যান্য কাজ-কর্মের জন্য জলের ব্যবস্থা এবং ড্রেন বা নরদমার সাহায্যে উপযুক্ত জল-নিকাশের ব্যবস্থাও বাড়ীর অত্যাবশ্যক অঙ্গের সামিল।

গৃহের পরিকল্পনা

বাস্তু বা বসত বাড়ীর পরিকল্পনার প্রথম কর্তব্যই হ'ল উপযুক্ত **স্থান-নির্বাচন।** যেখানে-সেখানে বাড়ীঘর তৈরী করা যায় না। কী পাড়াগাঁয়ে, কী শহরে, বাড়ীর জন্য উপযুক্ত স্থান অনেক খোঁজখবর ক'রে তবে পাওয়া যায়। ভাল আবহাওয়া, যাতায়াতের স্থবিধে, হাট-বাজার, ইস্কুল-কলেজ, পোষ্ট অফিস ও টেলিগ্রাফ অফিসের স্থবিধে, প্রয়োজনমত জলের স্থব্যবস্থা প্রভৃতি যেখানে আছে, বাড়ী তৈরীর পক্ষে সে স্থানই প্রশস্ত। পাহাড় বা উঁচু টিলার উপর সাধারণতঃ জলের অস্থবিধে হয় এবং ওঠানামাও কষ্টসাধ্য। একইভাবে জলা জায়গা কিংবা নীচু স্থানে যদি বর্ষার জল জমে থাকে, তাহলে তা' স্যাঁৎসেঁতে হয় ও সেখানে মশার উপদ্রব খুবই হয় বলে, তা কখনই বাড়ীর পক্ষে উপযুক্ত স্থান নয়। একইভাবে পাহাড়ের গায়ে, নদীর কিনারায়, কলকারখানা, মিল-গুদোম, ভাগাড়, শ্মশান, আঁস্তাকুড়, গোরস্থান কিংবা হাট-বাজারের খুব কাছেও বাড়ী হওয়া ভাল নয়। যেখানে পাহাড়ের ধস নামে, কিংবা নদী ভাঙে অথবা কলকারখানা বা মিল-গুদোমের ধোঁয়া, কয়লার গুঁড়ো, তুলোর আঁশ প্রভৃতিতে অথবা ভাগাড়, শ্মশান, আঁস্তাকুড় বা গোরস্থানের দূষিত আবহাওয়ায় কিংবা হাট-বাজারের হট্টগোলে কখনো বা বাড়ীর স্থায়িত্ব, কখনো বা স্বাস্থ্য এবং কখনো বা শান্তি ব্যাহত হতে পারে। একই ভাবে ঝোপ, ঝাড়, জঙ্গল, বা ধানের ক্ষেতের পাশের জমিও, কখনই স্বাস্থ্যকর বলে ধরে নেওয়া যায় না। স্থতরাং কিছুটা উঁচু জমি, যেখানে শোষক স্তর জলকে তৎক্ষণাৎ নীচে টেনে নেয় কিংবা চারদিকে কতকটা ঢালু ব'লে সহজেই জল গড়িয়ে নীচে চলে যায়, এমনি স্থানই বাস্তুভিটের পক্ষে সকলের চেয়ে ভাল। পুকুর বা জলাভূমির ভরাট জমিও বাসস্থানের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। আবার ঘিঞ্জি বস্তী, খাটাল, নোংরা পাড়াপড়শী প্রভৃতি হ'তে বাড়ী যত দূরে হয় ততই ভাল। তার উপর সারাদিনই যেখানে প্রচুর রোদ ও মুক্ত হাওয়া পাওয়া সম্ভব গৃহ-নির্মাণের পক্ষে সে স্থানই সর্বাপেক্ষা উপযোগী।

পাড়াগাঁয়ে পূব-মুখো বাড়ীই সবচেয়ে ভাল, কারণ তাতে প্রচুর ভোরের রোদ এসে পড়াতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এরূপ বাড়ীতে ছেলেমেয়েরা বাইরের মাঠে বা বাগানে সকাল বেলা খেলা-ধূলো বা ছুটোছুটি করলে তাদের দেহের গড়ন যেমন স্থন্দর হয়, তেমনি স্বাস্থ্যও খুব ভাল থাকে। পূবের পরেই

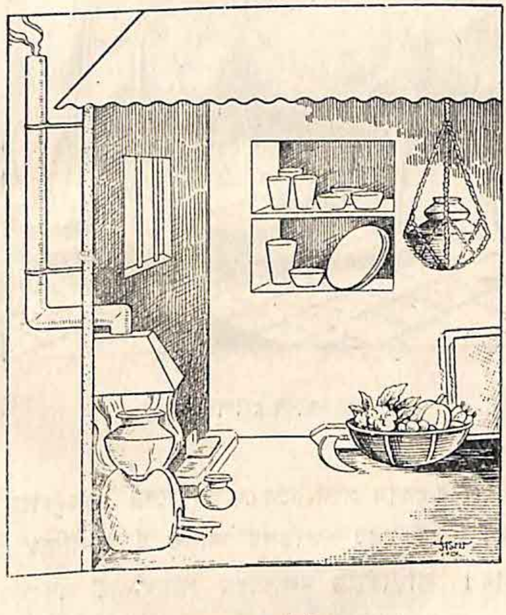
দক্ষিণমুখো বাড়ী ভাল। পশ্চিমের পড়ন্ত রোদ স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভাল নয়, তাই বাড়ীর চৌহদ্দির বাইরে পশ্চিমের দিকে বড় বড় গাছ থাকলে বাড়ী অনেকটা ঠাণ্ডা থাকে। উত্তরের হাওয়াও স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়, সেজন্য বাড়ীর সীমানার বাইরে উত্তরে বড় বড় গাছ কিংবা উঁচু পাঁচিল থাকলে ভাল হয়। বাড়ীর সামনে পূবে কিংবা দক্ষিণে ভাল পুকুর থাকলে সুবিধে হয়, কারণ ঐ অংশে পুকুর থাকলে তাতে প্রচুর রোদ এসে পড়াতে জল খুবই ভাল থাকে। পুকুর-পাড়ে কিন্তু বড় গাছ-পালা, বাঁশঝাড় বা ঝোপ-জঙ্গল কিছুই থাকবে না। পুকুরের বদলে ঐ স্থানে একটি গভীর নলকূপ বসালেও একই সঙ্গে পানীয়, স্নান ও ধোওয়া-মোছার জন্য জলের সুরাহা হতে পারে। দালান বা পাকাবাড়ী না হ'লে বেশ বড় বড় আলাদা-আলাদা শোয়ার, বসবার, পড়ার, খেলাধুলোর ও পূজোর ঘর এমন ভাবে দূরে দূরে করা



পাড়াগাঁয়ে আদর্শ গৃহের পরিকল্পনা

উচিত, যাতে প্রতি ঘরেই যথেষ্ট রোদ, আলো ও বাতাস লাগে। আবার রান্নাঘর, খাওয়ার ঘর, ভাঁড়ার ঘর প্রভৃতির অবস্থানও এমন হওয়া চাই যাতে রান্নাঘরের ধোঁয়া কিছুতেই ঐ সকল বসবাসের ঘরে এসে না ঢোকে এবং ঢুকলেও তৎক্ষণাৎ মুক্ত হাওয়াতে ধোঁয়া বাইরে চলে যায়। খাওয়ার ঘর এবং ভাঁড়ার ঘর রান্নাঘর হ'তে পৃথক হওয়াই বাঞ্ছনীয় কিন্তু রান্নাঘরের

কাছাকাছি থাকলেই ভাল হয়। খেতে বসে রান্নাঘরের ধোঁয়া নাকে ঢুকলে স্বাস্থ্য-হানির আশঙ্কা এবং ভাঁড়ার রান্নাঘরে থাকলে আরশোলা, ইঁদুর, পোকা-মাকড়, পিঁপড়ে প্রভৃতির উপদ্রবে রান্না করা খাবারও দূষিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আমাদের দেশে মেয়েরা প্রতিদিনের অনেকটা অংশই রান্নাঘরে কাটাতে বাধ্য হন। সেখানে প্রচুর আলো ও হাওয়ার অভাবে, ধোঁয়ায় ও গরমে অতি সহজেই মেয়েদের স্বাস্থ্য-হানি ঘটতে পারে। সেজন্য রান্নাঘর যাতে বেশ বড় হয় এবং তাতে বড় বড় দরজা-জানালা থাকে, তার ব্যবস্থা করা উচিত। রান্নাঘরের উত্তরে ও পশ্চিমে শাক-সবজির

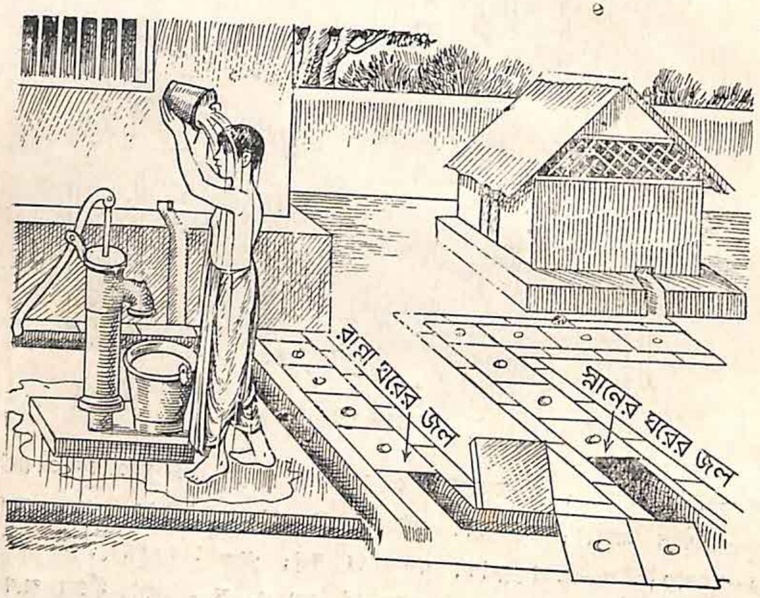


স্বাস্থ্যসম্মত রান্নাঘর

বাগান থাকলে আবশ্যক মত নিজের বাগানের লাউ, কুমড়ো, ঝিঙ্গে, মূলো, ফুলকপি, বেগুন এবং নানারকমের শাকপাতাও খাওয়া যেতে পারে। তাতে যে শুধু পয়সারই সাশ্রয় হয় এমন নয়, নিজেদের বাগানের কোন তরি-তরকারি উঠিয়ে এনে খেতে পারলে সত্যিই খুব আনন্দ হয়।

বাড়ীতে ধানের মরাই থাকলে তা এমন স্থানে থাকবে যেখানে প্রচুর রোদ লাগে। আর তা অনেকটা উঁচুতে কাঠের পাটাতনের উপর তৈরী করলেই ভাল

প্রভৃতি ফুল যখন ফুটবে, তখনই হবে তার সৌরভে সমস্ত বাড়ীখানাই আমোদিত; আর মনও তখন প্রফুল্ল হ'য়ে উঠবে। রান্নাঘর, বসবার ঘর ও শোয়ার ঘর প্রভৃতির মাঝখানে থাকবে পাকা উঠান এবং শয়ন-ঘরের নিকটে কোথাও থাকবে স্নানের ঘর। উঠানের কোন দিকে গাছপালা থাকবে না—কেবল পূব বা উত্তর দিকে থাকতে পারে একটা তুলসীর বেদী। উঠানের মাঝখানটি হবে খানিকটা উঁচু এবং তাই ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে নেমে গিয়ে শেষ হবে চারিদিকের পাকা নরদমায়। আর এভাবে খোলা থাকলে প্রচুর রোদ পড়াতে উঠান সর্বদাই থাকবে খটখটে ও শুকনা! পূব ও দক্ষিণ দিকের পাকা নরদমাগুলি ক্রমশঃ ঢালু

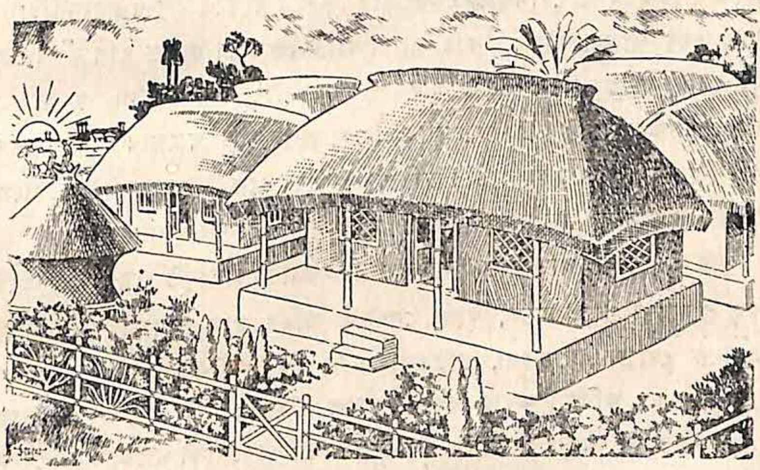


জল-নিকাশের ঢাকা দেওয়া নরদমা

হ'য়ে ঘুরে যাবে উত্তর ও পশ্চিম দিক পার হয়ে, বাড়ীর উত্তর-পশ্চিম কোণের বড় নরদমায়। উঠান-ধোওয়া জল, স্নানের ঘরের জল, রান্নাঘরের ও খাবার ঘরের ধোওয়া-মোছার জল এবং সকলের শেষে বাড়ীর বাইরে গিয়ে এই বড় নরদমার মধ্যেই পড়বে গোয়ালের এবং মলশোধক পায়খানার শোধিত জল। উঠানের পাশে নরদমাগুলি যদি গভীর না হয় এবং তার উপরে প্রচুর রোদ এসে পড়ে, তাহলে তাকে খোলা রাখাই ভাল, কিন্তু যদি তা গভীর হয় এবং যদি তাতে রোদ কম পড়ে কিংবা স্নানের ঘর, রান্নাঘর কিংবা গোয়াল ঘরের জল সেখান দিয়ে যায়, তাহলে তার উপরে আংটা দেওয়া টুকরো টুকরো ঢাকনির ব্যবস্থা

করা এবং আবশ্যক মত ঢাকনি তুলে, প্রচুর জল কিংবা সময়ে সময়ে সেগুলিকে ফিনাইল-জলে ভাল করে ধুয়ে দিয়ে আবার ঢাকনি চেপে দেওয়াই উচিত। উঠানের এক কোণে ঢাকনি দেওয়া একটা টিনে বা ড্রামে মাছের আঁশ, এঁটোকাঁটা, তরকারির খোসা প্রভৃতি কঠিন আবর্জনাকে ২৪ ঘণ্টার মত জড় ক'রে রাখার ব্যবস্থা থাকা চাই।

পাড়াগাঁয়ে গরীব যারা, সাধারণতঃ তারা মেটে বা কুঁড়ে ঘরে বাস করে। সাধারণতঃ এগুলির খুঁটি হয় বাঁশের, চাল হয় খড়, উলু বা গোল পাতার এবং দেওয়াল হয় দরমা, হোগলা বা নল-খাগড়া দিয়ে তৈরী। ঠাণ্ডা হাওয়া কিংবা বৃষ্টির জলের ছাট যাতে ঘরের ভিতরে না ঢোকে সেজন্য দেওয়ালের উপর গোবর আর মাটি মিশিয়ে প্রলেপ বা পলস্তারা করে নেওয়া উচিত। আবার মেঝে নীচু হ'লে অত্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে ও অস্বাস্থ্যকর হয় ব'লে,



আদর্শ কাঁচা বাড়ী

তা কম পক্ষে দু'হাতের কম উঁচু হওয়া উচিত নয়। স্যাঁৎসেঁতে স্থানে এক ফুট বালির উপর শক্ত এঁটেল মাটি পিটিয়ে তার উপর সম্ভব হ'লে খোয়া, ঝামা বা ইট বিছিয়ে, পিচ ঢেলে পিটিয়ে নিলে আর তা স্যাঁৎসেঁতে ও অস্বাস্থ্যকর হয় না! আর যাদের পক্ষে এ ব্যয়টুকুও করা সম্ভবপর নয়, তাদের পক্ষে তিন হতে চার হাত উঁচু মেঝেকে ভাল ক'রে গোবর-মাটির প্রলেপ দিয়ে যতদূর সম্ভব শক্ত করে নেওয়া উচিত! এভাবে কুঁড়ে ঘরের মেঝেকেও কতকটা বাসোপযোগী করে নেওয়া চলে। এরকম কুঁড়ে ঘর ঝড়ে বিপর্য্যস্ত হওয়ার

অত্যন্ত ভয় থাকে, স্থতরাং সর্বদা চাল, দেওয়াল ও খুঁটিগুলি মেরামত কিংবা প্রয়োজন মত বদলে নেওয়া উচিত। সহজে দাহ্য বস্তুতে তৈরী বলে, এ রকম ঘরে আগুন লাগার আশঙ্কাও বড় কম নয়।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাড়ীর জন্য সাধারণতঃ কিছুটা পাকা ব্যবস্থাই করা হয়, যেমন কয়েকখানি ঘরের মাঝখানে থাকে উঠান, ঘরগুলির চাল হয় টিনের, টালির কিংবা সময়ে সময়ে খোলার, খুঁটিগুলি হয় কাঠের কিংবা লোহা ও কাঠ দুয়েরই, দেওয়াল হয় সবটাই নল-খাগড়া বা বাঁশের উপর মাটির পলস্তারা করা আর না হয় নীচের অংশ পাকা এবং উপরের অংশ ঐ ভাবে কাঁচা অবস্থায় তৈরী। মেঝে হয় ঝামা, খোয়া বা ইঁট পিটিয়ে সিমেণ্ট করা না হয় পিচ বা আস্‌ফ্যাল্ট ঢেলে পাকা করা। কিন্তু এরকম বাড়ীগুলি বিশেষতঃ তাদের চাল টিনের হ'লে সহজেই তেতে উঠে, ফলে, স্বাস্থ্যের পক্ষে তারা খুব ভাল হয় না। সেজন্য চালের নীচে দরমা বা হোগলার একটা ছাদ ভিতরে থাকলে দুপুরে গরমের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায়। কাঠ বা বাখারি দিয়ে তা করতে পারলে আরো ভাল হয়। এরকম ঘরের মেঝে যদি উঁচু হয় এবং যদি আলো ও হাওয়া চলাচলের জন্য যথেষ্ট দরজা-জানালাও থাকে, তাহলে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ খারাপ হয় না। এ রকম বাড়ীর স্থবিধে এই যে এতে সহজে আগুন লাগে না এবং কুঁড়ে ঘরের মত ঘন ঘন এদের মেরামতও করতে হয় না।

এই ত গেল পাড়াগাঁয়ে বাড়ীর পরিকল্পনার মোটামুটি ব্যবস্থা। শহরে কিন্তু এ ব্যবস্থা প্রায়ই অচল, কারণ সেখানে জমির দাম অত্যন্ত বেশী ব'লে লোককে দোতলা, তেতলা, চারতলা এমন কি আট-দশ তলা বাড়ীতেও থাকতে হয়; কবির কথায় বলতে গেলে "ইটের পর ইট, তার মাঝে মানুষ কীট!" অর্থাৎ দেওয়ালের ফাটলে যেমন ছারপোকা থাকে, গর্তে যেমন পিঁপড়ে থাকে, কিংবা ঢিবির নীচে যেমন উই পোকা থাকে, অনেকটা তেমনি ইটের পাঁজার নীচেই যেন মানুষের বসতি। কোলকাতার মত শহরে অনেক বাড়ীতেই দিনের বেলাও কখনই রোদ ঢোকে না; হাওয়া যদি বা কখনো ঢোকে তাহলে তা আসে ঠিক চোরের মত অলি-গলি-পথে; আর অমাবস্যা ও পূর্ণিমার মধ্যেও কোন তফাৎই নেই। স্থতরাং এমন স্থানে ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করতে হ'লে, 'স্থশীল ও স্থবোধ' বালকের মত 'যা পায়, তাই খায়' গোছের যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। শুধু ভাগ্যবান আর প্রচুর বিত্তশালী যারা তাদের পক্ষেই দেখে শুনে স্থান-নির্বাচন ক'রে উপযুক্ত পরিকল্পনার পর বাড়ী তৈরী করা সম্ভব। কোলকাতার বাড়ীতে সাধারণতঃ থাকে একখানা উঁচু প্রাসাদ-তুল্য বাড়ী,

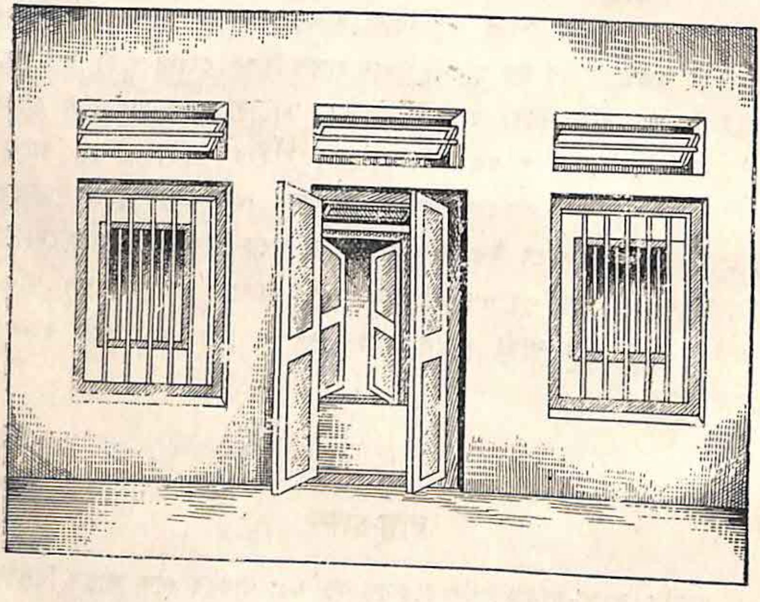
তারই মধ্যে রান্নাঘর, খাবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর, শোয়ার ঘর, বসবার ঘর, অতিথি-অভ্যাগতের জন্য ঘর, স্নানের ঘর, পায়খানা, মায় গ্যারেজ পর্য্যন্ত সবই। কেবল বড়লোকদের বাড়ীতেই বাইরে যে বহির্বাটি (out-house) থাকে তাতে হয় চাকর-দারোয়ানদের থাকার কিংবা মোটর গাড়ী রাখার ব্যবস্থা। সুতরাং খুব কম বাড়ীতেই সুবিধে হয় 'লন' কিংবা ফুলের বাগান রাখার ; তাই অনেক সময়ে খোলা ছাতের টবে ফুলের গাছ পুঁতে বাগানের সখ মেটাতে হয়। কিন্তু আজকাল কর্পোরেশন প্রতি বাড়ীর চারদিকে অন্ততঃ চার ফুট ক'রে এবং পেছনে অন্ততঃ দশফুট জমি খোলা রাখার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করাতে বর্তমানে তৈরী বাড়ীগুলোতে আলো ও হাওয়ার প্রবেশ কতকটা সহজ-সাধ্য হ'য়েছে। কোলকাতায় হাওয়া আসে সাধারণতঃ দক্ষিণ দিক হ'তে, কারণ ঐ দিকেই সমুদ্র। এজন্য বাড়ীর জন্য স্থান-নির্বাচনে দক্ষিণ দিক্‌টা খোলা থাকা সব চেয়ে ভাল, সেজন্য দক্ষিণ-মুখো বাড়ীই প্রশস্ত। তা না হলে পূব-মুখো হলেও ভোরবেলা যে রোদ পাওয়া যায়, তাতেও বাড়ীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে। পশ্চিম-মুখো বাড়ী বিকেল বেলা বড় তেতে উঠে এবং উত্তর-মুখো বাড়ীতে, বিশেষতঃ শীতকালে যে উত্তুরে হাওয়া বইতে থাকে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। এজন্য পূব ও দক্ষিণে অন্য বাড়ী থাকলে, যতদূর সম্ভব পশ্চিম ও উত্তর দিক্ ঘেঁসে বাড়ী তুললে দক্ষিণ ও পূব দিক স্বভাবতঃই কতকটা খোলা থাকে।

বায়ু-চলন

বাড়ীর দরজা-জানালাগুলি হবে বড় বড় এবং থাকবে একে অন্যের বিপরীত দিকে, যাতে একসঙ্গে খোলা থাকলে একদিকে হাওয়া ঢুকে আপনি অবাধে অন্যদিকে বেরিয়ে যেতে পারে। আবার ছাদের কিছু নীচেই দেওয়ালে থাকবে উপযুক্ত সংখ্যক ভেন্টিলেটার বা ঘুলঘুলি। এগুলিও বিপরীত দেওয়ালে একে অন্যের উল্টোদিকে ঠিক একই অবস্থানে থাকবে, যাতে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ থাকলেও বায়ু-প্রবাহ একদিকে ঢুকে ঘরের বায়ুকে ঠেলে অপরদিকে বের করে দিতে পারে। বায়ু কখনো কোন স্থানে স্থির হ'য়ে থাকতে পারে না, কোন বাধা না থাকলে সব সময়ে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়াই তার স্বাভাবিক ধর্ম। এভাবে যে কোন স্থানের দূষিত বায়ুকে সরিয়ে দিয়ে নতুন বিশুদ্ধ বায়ু অতি স্বাভাবিক ভাবেই তার স্থান অধিকার করে, এরই নাম **নৈসর্গিক** বা

প্রাকৃতিক বায়ু-চলন। আবার নানা কৃত্রিম উপায়েও কোন স্থানের বদ্ধ বা দূষিত হাওয়াকে দূরে ঠেলে দিয়ে তার স্থানে নতুন বিশুদ্ধ হাওয়ার প্রবেশের পথকে সুগম করার ব্যবস্থার নাম **কৃত্রিম বায়ু-চলন**।

. **প্রাকৃতিক বায়ু-চলন**—প্রকৃতিই নানা উপায়ে দূষিত বা বদ্ধ বায়ুকে ঠেলে দিয়ে তার স্থানে নতুন ও বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চালন ঘটায়। সূর্যকিরণ বায়ুর মধ্যে বিদ্যমান নানা জীবাণু ও দুর্গন্ধকে নষ্ট করে। আবার সূর্যকিরণই গাছ, লতা-পাতার ক্লোরোফিল নামক সবুজ উপাদানের সাহায্যে বায়ুর অত্যধিক কার্বন ডাই-অক্সাইডের শোষণ ও তা'হতে কার্বন-আত্তীকরণ অর্থাৎ তার



গৃহে বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা

কার্বনের দ্বারা পুষ্টিকর উপাদান শ্বেতসারের উৎপত্তি ঘটিয়ে এবং অক্সিজেনের বহিষ্কার ঘটিয়ে বায়ুকে অনেকটা নির্দোষ করে। তা ছাড়া, সূর্যের উত্তাপে মাটি বা বালি যখন তেতে উঠে, তখন তার উপরকার হাওয়াও গরম হ'য়ে ওজনে কতকটা হাল্কা হয় ব'লে ক্রমশঃ উপরে উঠতে থাকে, আর উপরকার স্তরের অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ও ভারী বাতাস আপনি নীচে নেমে এসে তার স্থান অধিকার ক'রে বসে। ঝড়ের সময়ে দমকা হাওয়াতেও কোন কোন স্থানবিশেষের দূষিত বায়ু সে সকল স্থান হ'তে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়।

আমরা জানি যে বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রণে যে প্রাকৃতিক মিশ্র গ্যাস (যেমন বাতাস) কিংবা কৃত্রিম মিশ্র গ্যাস উৎপন্ন হয়, তার সকল উপাদান সমভাবে ঐ মিশ্রণে না আসা পর্যন্ত প্রত্যেকটি গ্যাস চঞ্চল ভাবে ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করতে থাকে। পদার্থ বিজ্ঞানে, এর নাম **বায়বীয় ব্যাপন-নীতি** (Law of diffusion) ; এজন্যই কোন স্থানের বাতাস, আশপাশের বাতাস হ'তে কোন কারণে হঠাৎ ঠাণ্ডা বা গরম হ'য়ে গেলে, যতক্ষণ না তাদের তাপ একই হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ইতস্ততঃ সঞ্চালন ও তাপের আদান-প্রদান চলতে থাকে। পরে যখন যেকোন স্থানের এবং তার আশপাশের তাপ একই মাত্রায় এসে দাঁড়ায় তখনই বাতাসের ইতস্ততঃ আনাগোনাও আপনি বন্ধ হয়ে যায়।

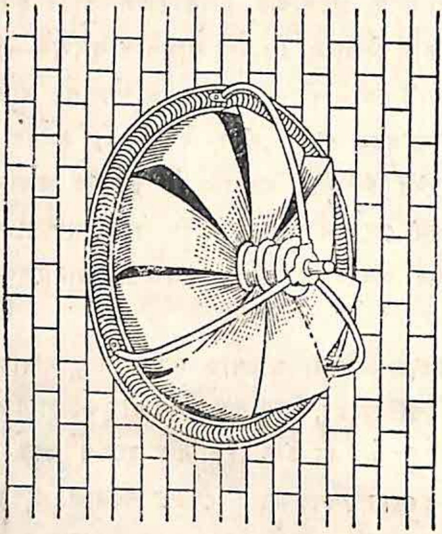
কৃত্রিম বায়ু-চলন—খোলা জায়গার দূষিত বায়ু সাধারণতঃ প্রাকৃতিক বায়ুচলনের ফলেই শোধিত হয়, কিন্তু বদ্ধ ঘরের বায়ু এইভাবে দরজা-জানালা বা ভেণ্টিলেটারের সাহায্যে কতকটা শোধিত হলেও তার সম্পূর্ণ বিশোধন প্রাকৃতিক উপায়ে হওয়া সম্ভবপর নয়। সেজন্য বহুস্থলে ঘরের দূষিত বায়ুকে কৃত্রিম উপায়ে বের করে দিয়ে নতুন ও বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবেশে সে স্থান-পূরণের ব্যবস্থা করার নামই **কৃত্রিম বায়ু-চলন**। সাধারণতঃ চারটি উপায়ে এরূপ কৃত্রিম বায়ুচলনের ব্যবস্থা সম্ভব ; যথা (১) **কৃত্রিম শূন্যীকরণ-পদ্ধতি** (Vacuum system) (২) **বায়ুবিতাড়ন-পদ্ধতি** (Plenum system) (৩) এদুয়ের একত্র প্রয়োগে **মিশ্র পদ্ধতি** (Mixed system), এবং (৪) **রাসায়নিক পদ্ধতি**।

শূন্যীকরণ (আংশিক বা সম্পূর্ণ)-পদ্ধতি—গরম এবং ঠাণ্ডা দেশে এর জন্য বিভিন্ন উপায় গ্রহণ করা হয়।

ঘরের মধ্যে বায়ু প্রবাহের আগমপথ ও নিগমপথ একই সঙ্গে খোলা কিংবা সোজাসুজি না থাকলে কিংবা তাদের অবস্থানও একই উচ্চতায় না হ'লে এভাবে বায়ু-চলন ঠিক মত হতে পারে না। এজন্যই উপযুক্ত বায়ু-চলনের জন্য যেমন ঘরে বড় বড় দরজা জানালার প্রবেশ পথ থাকা চাই, আবার তেমনি তাদের উল্টোদিকে দূষিত ও বদ্ধ বায়ুর বহিষ্কারের জন্যও সম-অবস্থানে, একই আকারের নিগম পথকেও সর্বদা খোলা রাখতে হবে।

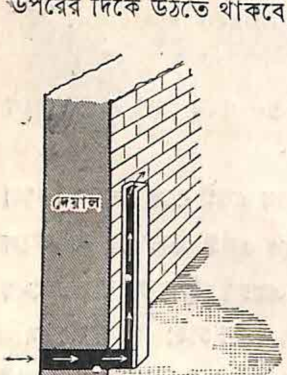
(১) বড় আকারের ঘুলঘুলিতে কিংবা গবাক্ষপথে **বায়ু-আকর্ষক** (extraction) **পাখা** বসালে যেমন তা বাইরের বিশুদ্ধ বায়ুকে ঘরে টেনে এনে উল্টো পথে ঘরের বায়ুকে বাইরে ঠেলে দেয়, তেমনি **বায়ুবিতাড়ক**

(propulsion) **বৈদ্যুতিক পাখার** সাহায্যে ঘরকে বায়ুশূন্য করলে তৎক্ষণাৎ অন্যদিক হ'তে বিশুদ্ধ বায়ু এসে সে শূন্যস্থান অধিকার করে।

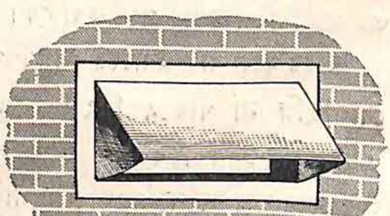


বায়ু আকর্ষক পাখা

(২) ঘরের দেওয়ালের নীচে জালতি-লাগানো কতকগুলি ছিদ্র এবং একই দেওয়ালের উপরের দিকে ভেন্টিলেটার রাখলে ঘরের বদ্ধ গরম হাওয়া যেমন উপরের দিকে উঠতে থাকবে, তেমন নীচের ফুটো দিয়ে বাইরের বিশুদ্ধ, ঠাণ্ডা



বায়ু-সঞ্চালক দেওয়াল (ventilator)



বায়ু-সঞ্চালক ঘুলঘুলি (ventilator)

ও ভারী হাওয়া ঢুকে সে আংশিক শূন্যস্থান পূর্ণ ক'রে নিতে চেষ্টা করবে। এজন্য দেওয়ালের নীচের দিকে উপযুক্ত আকারের ফুটো ও দেওয়ালের উপরেও

ভেণ্টিলেটার বা ঘুলঘুলির ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। ঐগুলি নানা আকারের ও নক্সার হয়, কোনটি হয় চৌকো, কোনটি হয় গোল, কোনটি খোলা, এবং আকারে বড় হ'লে কাচের ঢাকনি-যুক্তও হ'তে পারে, কিন্তু তাকে ইচ্ছেমত বন্ধ করা ও খোলার জন্য তার সঙ্গে এমন ভাবে দড়ি লাগিয়ে নিতে হয় যার একদিক ধরে টানলে তা খোলে এবং অপর দিক ধরে টানলে তা' বন্ধ হয়ে যায়।

(৩) ঘরের মেঝে, কার্পেট প্রভৃতি পরিষ্কারের জন্য **শূন্যীকরণের দ্বারা পরিষ্কারক** (Vacuum cleaner) নামে একপ্রকারের বৈদ্যুতিক যন্ত্র পাওয়া যায় যার দ্বারা, ঝাঁট দিয়ে সমস্ত ঘরকে ধূলিময় না করে, যন্ত্রের মধ্যে সকল ধূলো-বালিকে টেনে নিয়ে সেগুলিকে পরিষ্কার করা যায়। এ ভাবে ঘরকে আংশিক ভাবে বায়ুশূন্য করেও খোলা দরজা-জানালাপথে, তার মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ুর চলন বাড়ানো যায়।

(৪) শীতপ্রধান দেশে ঘরে আগুন-জালাবার ব্যবস্থা থাকে, সুতরাং আগুন জালানোর পর ঘরের গরম হাওয়া হাল্কা হয়ে যতই চিমনি দিয়ে উপরে



চিমনীর সাহায্যে বায়ু-চলনের ব্যবস্থা
ক—উনান; খ—গরম ও বদ্ধ বায়ু

উঠে যায়, ততই বাহির হ'তে বিশুদ্ধ ঠাণ্ডা হাওয়া এসে শূন্যস্থানকে পূর্ণ করে। আমাদের দেশে ঘরে ধূপ-ধূনো জালালেও একই ভাবে কতকটা বায়ুচলনের ব্যবস্থা হতে পারে।

(৫) ঘরের ছাদে নল বসিয়ে, তারই কাছে কোন বহুমুখী বাতিকে জ্বালিয়ে দিলে, গরম হাওয়া কিংবা ধোঁয়া যত উপরে উঠতে থাকে, ততই বাহির হ'তে বিশুদ্ধ বায়ু এসে সে স্থানকে অধিকার করে।

বায়ুবিতাড়ন-পদ্ধতি—(১) খুব শক্তিশালী এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন **বৈদ্যুতিক পাখা** যতক্ষণ সজোরে চলতে থাকে, ততক্ষণ ঘরের হাওয়ার মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং তা একদিকে যেমন বদ্ধ হাওয়াকে বাইরের দিকে ঠেলে দেয়, আবার তেমনি বাইরের হাওয়াকেও ঘরের মধ্যে টেনে আনে।

(২) **বায়ুবিতাড়ক** (propulsion) বৈদ্যুতিক পাখার কথা আগেই বলা হয়েছে। আবার হাওয়া বেরোবার পথে **বাষ্পীয় জেট** (jet) প্রভৃতির সাহায্যেও হাওয়াকে ঠেলে দেওয়া যেতে পারে কিংবা বাহির হ'তে পাম্পের সাহায্যেও ভিতরের দূষিত বায়ুকে টেনে নেওয়া যেতে পারে। ফলে ঘরের মধ্যে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তৎক্ষণাৎ খোলা আগম-পথে মুক্ত বায়ু এসে সে স্থান অধিকার করে ব'লে, বদ্ধ বায়ু বিশুদ্ধ বায়ুতে পরিবর্তিত হয়। কলকারখানা প্রভৃতিতে বায়ুচলনের জন্য এ উপায়ই অনুসৃত হয়।

মিশ্র পদ্ধতি—ইস্কুল, কলেজ, সভাগৃহ, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি গৃহে যেখানে একসঙ্গে বহুলোকের সমাগম বা সমাবেশ হয়, সে স্থানে একই সঙ্গে দুটি পদ্ধতির ব্যবস্থা থাকাই উচিত; কারণ দুয়ের একত্র ক্রিয়াতে যত সহজ ও অল্প সময়ের মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ুচলনের ব্যবস্থা হতে পারে, কখনই যে কোন একটির দ্বারা তা হয় না। আবার দুটি ব্যবস্থা একসঙ্গে চালু থাকলে, যদি কোন কারণে একটি অকেজো হয়ে পড়ে, তাহলেও অপরটির সাহায্যে সম্পূর্ণ না হলেও, অন্ততঃ আংশিক ভাবেও বায়ুচলনের উপায় থাকবে।

আবার বায়ুর উত্তাপ ও আর্দ্রতা-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা রুদ্ধদ্বার ঘরেও কতকটা বায়ুর বিশোধন সম্ভব। গবেষণাক্রমে দেখা গেছে যে কোন বন্ধ ঘরে যদি বায়ু তাপ ৬৫° ফারেনহিট এবং তার আর্দ্রতা যদি শতকরা মাত্র চল্লিশ ভাগ থাকে, তাহলে তা স্বাস্থ্য ও কাজকর্মের পক্ষে খুবই অনুকূল হয়। আজকাল বহু বাড়ী, অফিস-আদালত, ইস্কুল-কলেজ, সিনেমা-থিয়েটার হল, ও হাসপাতাল প্রভৃতিতে এবং এমনকি ট্রেনের কামরায় পর্যন্ত, উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে বায়ু- নিয়ন্ত্রণের (air-conditioning) ব্যবস্থা করা হয়। তার ফলে বাইরের বাতাসের সাহায্য ছাড়াও লোকজন একত্র থাকলে কিংবা কাজকর্ম করতে থাকলেও হাঁপিয়ে ত উঠেই না, বরং শীতপ্রধান দেশের আবহাওয়াতে যেমন সম্ভব, ঠিক তেমনি কুশলতার সঙ্গে কাজ করতে

পারে। কিন্তু ঋতু-উপযোগী গরম বা শীত-অনুসারে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা কর্তব্য, কারণ গ্রীষ্মকালে ঘরের হাওয়ায় যে উত্তাপ শরীরের পক্ষে আরামদায়ক শীতকালে আবার তাই কষ্টদায়ক হয়ে উঠতে পারে।

রাসায়নিক পদ্ধতি—ঘরের মধ্যে একটি বাক্সে খোলা অবস্থায় **ক্যাল-সিয়াম ক্লোরাইড, পাথুরে চুন** কিংবা কাঠ কয়লা রাখলেও বায়ুর আর্দ্রতা যেমন কমে আবার তেমনি দুর্গন্ধও দূর হয়। আবার চুন যখন হাওয়া হ'তে জলকে টেনে নিতে থাকে, তখন তার চারদিকে হাওয়া গরম হওয়াতে তা হাল্কা হয়ে উপরে উঠতে থাকে বলে তাতে বিশুদ্ধ বায়ুসঞ্চালনেরও কতকটা সুবিধে হয়।

জল ও তার প্রয়োজনীয়তা

জীবন-ধারণের জন্য জল অপরিহার্য উপাদান ব'লে, তার আর এক নাম জীবন। আমাদের শরীরেও আছে প্রায় তিন ভাগের দুভাগই জল। প্রতিদিন ঘাম, প্রস্রাব, মল ও নিঃশ্বাসের সঙ্গেও অনেকটা জল আমাদের শরীর হ'তে বেরিয়ে যায়, সুতরাং সে ক্ষতিটুকু পূরণ করতে আমরা জল, সরবৎ, ফলের রস, দুধ প্রভৃতি পান করি। তাছাড়া আমরা যা খাই, সে কঠিন বা তরল উপাদান যা'ই হোক, প্রতিটি খাদ্যের সঙ্গেও কিছু না কিছু জল আমাদের শরীরে প্রবেশ করে, এবং তাই আমাদের রক্তের ও দেহ-কোষগুলির জলীয় উপাদানকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখে। দেহের বহু অসার ও অনাবশ্যক উপাদানের দ্রবীভূত অবস্থায় ভালভাবে রেচনের জন্যই ঘাম ও মূত্রের সঙ্গে প্রচুর জল শরীর হ'তে বেরিয়ে যাওয়া আবশ্যক। কলেরা রোগীর মল ও বমিতে অনবরত জল বেরিয়ে যেতে থাকে ব'লে রক্তের জলীয় ভাগ অত্যন্ত কমে যায়, সেজন্যই তার রক্তে উপযুক্ত লবণ-দ্রব মিশিয়ে দিতে হয়। গ্রীষ্মকালে ঘামের সঙ্গে প্রচুর জল বেরিয়ে যায়, সেজন্য তেষ্টা পায় এবং তা দূর করতে জলপান করা আবশ্যক। কোন কারণে শরীরে জলের অভাব হ'লে, শরীর শুকিয়ে যায়, চোখ ব'সে যায়, হৃৎপিণ্ডের কাজ ভাল হয় না, এবং প্রস্রাব ও ঘামের সঙ্গে অসার ও ক্ষতিকর উপাদানগুলি শরীর হ'তে বেরিয়ে যেতে পারে না, কাজেই, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, বৃক্ক প্রভৃতি অকেজো হ'য়ে পড়ে ও পরিণামে মৃত্যু ঘটে। শুধু উপোস করলেও অত তাড়াতাড়ি শরীর ভেঙ্গে পড়ে না, নির্জলা উপোসে যতটুকু শীগগির

তা হয়। সুতরাং আমাদের পক্ষে জীবনধারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য জল একটি অত্যাবশ্যক উপাদান।

আবার ঘর-গেরস্থালির জন্যও জলের আবশ্যক বড় কম নয়। রান্না-বান্নারও জল একটি অপরিহার্য উপাদান। তারপর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য হাত-ধোওয়া, মুখ-ধোওয়া, স্নান করা, শৌচ করা প্রভৃতি কাজও জল ছাড়া চলতে পারে না। তার উপর কাপড় কাচা, বাড়ী-ঘরকে ধোয়া-মোছা, বাসন-কোসন মাজা প্রভৃতি প্রতিটি কাজের জন্যই জলের আবশ্যক। এক কথায় জল ছাড়া ঘর-সংসারের কোন কাজই হওয়া সম্ভবপর নয়। এ কারণে গৃহ-পরিকল্পনায় জলের বন্দোবস্ত একটি মুখ্য কর্তব্য।

জলের প্রাপ্তিস্থান

পৃথিবীর তিন ভাগই জল অর্থাৎ সমুদ্র, এবং এক ভাগ মাত্র স্থল! তার মধ্যে আবার হ্রদ, নদ-নদী, পুকুর-দীঘি, খাল-বিল, কূয়ো-ঝরণা প্রভৃতিতেও জল থাকে। সূর্যের তাপে সকল সময়েই এগুলি হ'তে প্রচুর জল বাষ্প হ'য়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে যায় এবং পরে মেঘের আকারে তা আকাশে ভাসতে থাকে। কতকটা আবার অত্যুচ্চ পাহাড়ের চুড়োয় বরফ হ'য়ে জমে থাকে। পরে যখন ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে থাকে তখন মেঘ আবার বৃষ্টি হ'য়ে পৃথিবীতে নেমে এসে কতক মেশে সাগরে, কতক নদী-নালা, পুকুর বা হ্রদে এবং কতক আবার মাটির শোষক স্তরকে ভেদ ক'রে ভূগর্ভে সঞ্চিত হয়। আবার কতকটা গাছ, লতাপাতাও নিজের প্রয়োজনে শুষে নেয়। গ্রীষ্মকালে পাহাড়ের চুড়োয় যখন বরফ গলতে থাকে, তখন সে জল তোড়ে নেমে আসে নদ-নদী দিয়ে, সেজন্যই গ্রীষ্মের শেষে বর্ষাকালে পাহাড়ে নদ-নদীর জল দুকূল ছাপিয়ে উঠে। সে জল সব শেষে গিয়ে হ্রদ কিংবা সাগরে মেশে।

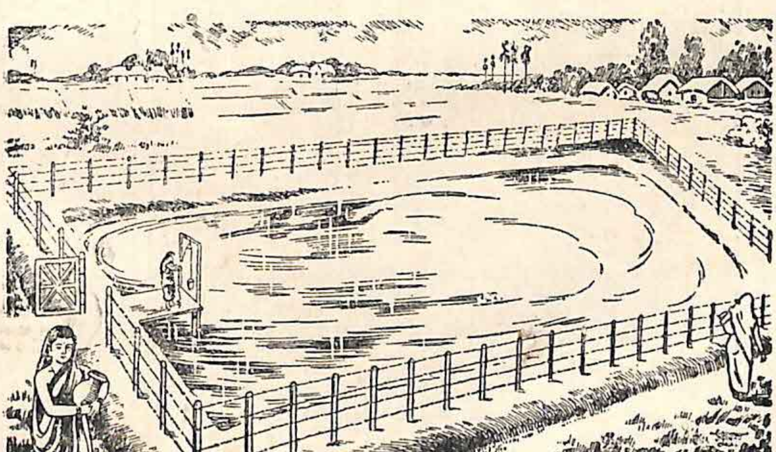
সাগরের জল—নোনা বলে সাগরের জল পান কিংবা ঘর-সংসারের কাজের উপযুক্ত নয়। সাগরের জল হ'তেই নূন তৈরী হয়।

নদীর জল—নদ-নদী সাধারণতঃ পর্বত কিংবা হ্রদ হ'তে উৎপন্ন হয়। উৎপত্তি-স্থানের নিকটে নদীর জল অনেকটা বিশুদ্ধ থাকে, কিন্তু নদী যত নীচে গ্রাম বা শহরের পাশে নেমে আসে, ততই কতকটা প্রাকৃতিক কারণে এবং কতকটা মানুষের দ্বারাও নদীর জল দূষিত হয়ে পড়ে। খাল-নালা ও বৃষ্টির জল প্রায়ই অনেক কিছু আবর্জনাদি ধুয়ে এনে নদীতে ফেলে। মানুষও নদীপথে চলতে ফিরতে অনেক কিছুই নদীতে ফেলে। নদীর পারেই থাকে

শ্মশান আর কলকারখানা! জীবজন্তু মরে গেলে লোকে সেগুলিকে দেয় জলে ভাসিয়ে। তার উপর, স্নান করা, কাপড় কাচা, ময়লা ফেলা, এ সব কারণেও মানুষই নদ-নদীর জলকে অনেকটা দূষিত করে। সুতরাং পানীয়-হিসেবে নদীর জলকে শোধন না করে কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়।

হ্রদের জল—লোকালয়ের কাছাকাছি হ্রদের জলও, নদীর জল যে সব কারণে দূষিত হয়, প্রায় সে কারণেই দূষিত হয়ে পড়ে। সুতরাং ব্যবহারের আগে একই ভাবে তাকেও শোধন করে নেওয়া উচিত। কাস্পিয়ান সাগর, নামে সাগর হলেও আসলে একটি খুব বড় হ্রদ ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার জল নোনা। একই ভাবে উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদের জলও নোনা সুতরাং সাগরের জলের মতই তা বিস্বাদ এবং ব্যবহারের অযোগ্য। কিন্তু সু-উচ্চ পাহাড়ের উপর মানস সরোবর প্রভৃতি হ্রদের জল সমতল ভূমিতে হ্রদের জলের মত দূষিত হয় না ব'লে, তা পান করা কিংবা অন্যান্য গৃহস্থালির কাজেও তার নিয়োগের পক্ষে কোন বাধা নেই।

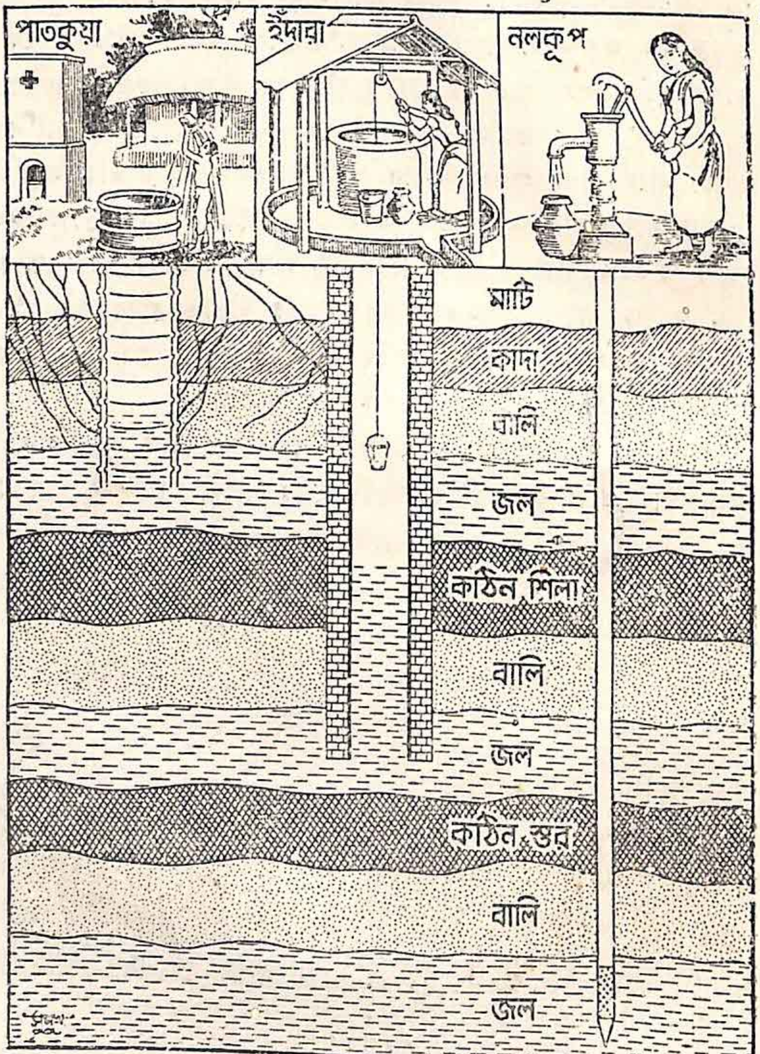
পুকুর বা দীঘির জল—পাড়াগাঁয়ে বড় বড় পুকুরকে দীঘি বলে, তা ছাড়া প্রায় প্রতি বাড়ীতেই ছোট-বড় পুকুর থাকে এবং পান করা থেকে



সংরক্ষিত পুকুর

স্নান করা, কাপড়-কাচা, বাসন-মাজা প্রভৃতি ঘর-সংসারের যাবতীয় কাজই ঐ জলে হয়। পুকুর বা দীঘি সাধারণতঃ খুব গভীর হয় না এবং তার সমস্ত জলই বৃষ্টির জল, তাই গ্রীষ্মকালে অনেক পুকুরের জল একেবারে শুকিয়ে যায়। সুতরাং বর্ষাকালে নালা-নরদমা, আঁস্তাকুড়, এমন কি পায়খানার গড়ানে

জলও তাতে এসে মিশতে পারে ব'লে কখনই তার জল পান করা উচিত নয়। তবে লোকালয় হতে দূরে কোন উচু জায়গায়, কাঁটা তারে ঘেরা, কেবল পানীয় জলের জন্য যদি গভীর কোন পুকুরকে সংরক্ষিত রাখা যায়, তবে তার জলকে



জলের বিভিন্ন উৎস

লক্ষ্য কর, অগভীর ও কাঁচা কুয়োর জল কিভাবে দূষিত হচ্ছে

ফুটিয়ে পান করা চলতে পারে। এ রকম পুকুরের কাছাকাছি কোন গাছপালা বা জঙ্গল থাকবে না এবং যাতে সারাদিনই প্রচুর রোদ এসে এর

জলের উপর পড়তে পারে এমন জায়গাতেই ঐরূপ পুকুর কাটানো উচিত এবং কোন অবস্থাতেই তার জলে কাউকে নামতে কিংবা তার নিকটে জল তুলে কাপড় কাচতে, স্নান করতে কিংবা বাসন মাজতেও দেওয়া উচিত নয়।

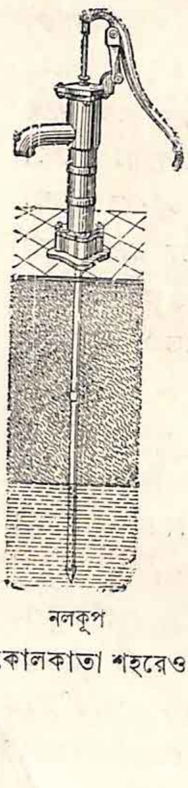
বৃষ্টির জল—বৃষ্টির জল সাধারণতঃ বিশুদ্ধ থাকে ব'লে তা পান করা চলে। কিন্তু বাতাসে যে ধুলোবালি উড়ে বেড়ায় তার দ্বারা সে জলও দূষিত হ'তে পারে। বৃষ্টির প্রথম অবস্থায় যখন ধুলোবালি জলে ভিজে মাটির সঙ্গে মিশে যায় এবং বাতাস কতকটা নির্মল হয়, তখনই পানের জন্য বৃষ্টির জল ধ'রে রাখা উচিত।

কূয়োর জল—পাড়াগাঁয়ে এবং অনেক ছোট ছোট শহরেও কুয়ো খুঁড়ে তার জল পানীয় হিসেবে ও অন্যান্য কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। কুয়ো এক শ হাতের কাছাকাছি গভীর হ'লে তাকে **গভীর কূপ,** এবং তার চেয়ে কম হলে **অগভীর কূপ** বলা হয়। অগভীরগুলি সাধারণতঃ কুড়ি বা পঁচিশ হাতের চেয়ে বেশী গভীর হয় না, এজন্য উপরের ময়লা জল, পায়খানা, আস্তাবল, নরদমা, আঁস্তাকুড় প্রভৃতি হ'তে চুইয়ে এসে, কুয়োর জলের সঙ্গে সর্বদাই মিশে ব'লে তার জল কখনও বিশুদ্ধ হয় না. সুতরাং পানীয় হিসেবে এ জল কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়। মাটির অশোষক স্তরের উপর জমা উপরের দূষিত জল মাটির ভিতর দিয়ে চুইয়ে অত নীচুতে যেতে পারে না ব'লে, গভীর কুয়োর জল স্নানের, বাসন-মাজার, কাপড় কাচার কিংবা আঁস্তাকুড়, নরদমা বা পায়খানার জলের দ্বারাও দূষিত হতে পারে না এবং গভীর কুয়োর জল সাধারণতঃ মাটির দ্বিতীয় স্তর বা অশোষক স্তরের নীচের সঞ্চিত জল বলেই, অন্য কারণে দূষিত না হ'লে প্রায়ই বিশুদ্ধ থাকে, এবং তা পান করলেও অসুখ হয় না। তা সত্ত্বেও বাইরের জল যাতে কিছুতেই চুইয়ে নীচে গড়িয়ে যেতে না পারে, সেজন্য নীচ থেকে উপর পর্যন্ত আগাগোড়া সিমেণ্ট ও ইট দিয়ে তার চারদিক বাঁধিয়ে নেওয়া উচিত। যাতে পাতা বা খড়কুটো জলে না পড়ে তার জন্য কূয়োর বাঁধানো উঁচু পাড়ের উপর জালতির ঢাকনির ব্যবস্থা থাকা উচিত। তা ছাড়া একটি দড়িশুদ্ধ বিশেষ বালতি ছাড়া অন্য কিছুর সাহায্যে কুয়ো হতে জল-তোলাও উচিত নয়। কুয়ো হতেও লম্বা নল ও পাম্পের সাহায্যে জল-তোলার ব্যবস্থাই সবচেয়ে ভাল।

ঝরণা বা প্রস্রবণের জল—সাধারণতঃ বৃষ্টির জল মাটির প্রথম বা শোষক স্তর দিয়ে চুইয়ে অশোষক স্তরের উপরে জমতে থাকে। এজন্যই

মাটি খুঁড়লে কয়েক হাত নীচেই জল পাওয়া যায়। এই অশোষক স্তর নানাস্থানে উঁচু-নীচু থাকে। আবার তরঙ্গায়িত অশোষক স্তরের নীচেও যে জল থাকে তা সাধারণতঃ বিশুদ্ধই হয়। সুতরাং কোন জায়গায় শোষক স্তরকে ভেদ ক'রে যদি নীচের বিশুদ্ধ জল কখনও মাটির উপরে ফোয়ারার মত উঠতে থাকে, তখনই তাকে বলে ঝরণা বা প্রস্রবণ। পাহাড়ের গা-বেয়ে অনেক ঝরণার জল এমনি নেমে আসে। কোথাও কোথাও ঝরণার জলকেও পাড় বেঁধে পানের জন্য জমা ক'রে রাখা হয়, কিন্তু ঝরণার জল সাধারণতঃ বিশুদ্ধ হলেও এ রকম ভাবে মাটির উপরে জমিয়ে রাখলে প্রায়ই পুকুর বা অগভীর কুয়োর জল যে সব কারণে দূষিত হয়. ঠিক সে ভাবেই দূষিত হয় বলে তা পানের অযোগ্য হ'য়ে পড়ে। ঝরণার জল সাধারণতঃ খুব ঠাণ্ডা হয়।

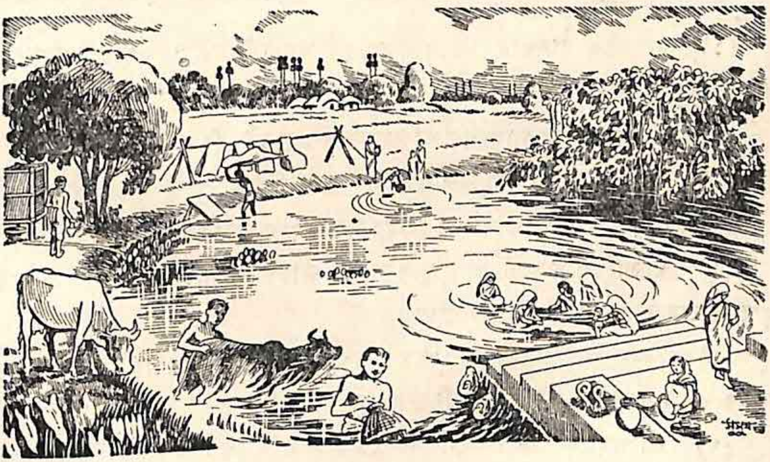
নলকূপের জল—যন্ত্র-সাহায্যে চাপ দিয়ে যখন পর পর অনেকগুলি নলকে জোড়া দিয়ে প্রায় আড়াই শ ফুট কিংবা তার চেয়েও বেশী গভীর মাটিতে চালিয়ে দিয়ে অশোষক স্তরের নীচের বিশুদ্ধ জলকে পাম্প ক'রে উপরে তোলা হয়, তখনই তাকে বলে নলকূপ। সবচেয়ে নীচের অংশটি থাকে ছুঁচলো ও বহু ছিদ্রবিশিষ্ট এবং তার উপরের নলগুলির গায়ে কোন ছেঁদা থাকে না। কাজেই পাম্পের সাহায্যে যখন নলগুলির ভেতরের বাতাসকে বের করে দেওয়া হয়, তখন সকলের নীচের নলের ফুটোগুলি দিয়ে, অশোষক স্তরের নীচের স্তরের বিশুদ্ধ জলের স্রোত আপনি মাটির উপরে নলের মুখ দিয়ে তোড়ে বেরিয়ে আসতে থাকে। উপরের ধূলো-বালি পড়ে বা ময়লা জল চুইয়ে নলের ভিতরের জলকে কিছুতেই দূষিত করতে পারে না। এজন্যই বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য আজকাল কী পাড়াগাঁ, কী শহর, এমন কি কোলকাতা শহরেও নলকূপের চাহিদা দিন দিনই বেড়ে চলেছে।


নলকূপ

জল দূষিত হওয়ার কারণ

জলের উৎস বা উৎপত্তিস্থান-হিসেবে নানা কারণে জল দূষিত হয়। বৃষ্টির জল সাধারণতঃ দূষিত হয় বাতাসে যে ধূলো-বালি, জীবাণু, কয়লার

ধোঁয়া, তুলো বা পশমের আঁশ প্রভৃতি উড়ে, তার দ্বারা। তার উপর নোংরা পাত্র ও হাতের দ্বারাও ধরে-রাখা বৃষ্টির জল দূষিত হতে পারে। নদী, হ্রদ, পুকুর, দীঘি প্রভৃতির জলে সাধারণতঃ নালা-নরদমার জল, পাড় বা তীর-ধোওয়া জল এবং আঁস্তাকুড়, পায়খানা, শ্মশান, গোরস্থান প্রভৃতি থেকে চুইয়ে আসা জল আপনি এসে পড়ে। তাছাড়া ঐ জলে স্নান করা, মুখ ধোওয়া, কাপড় কাচা, বাসনমাজা, শৌচ করা, গোরু-মোষকে স্নান করানো প্রভৃতির জন্যও মানুষের দ্বারাই দূষিত হয়। আবার মানুষ ও জীবজন্তুর মৃতদেহ কিংবা মৃতদেহের দগ্ধাবশিষ্টও নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। নদীতে অসংখ্য কলকারখানার নোংরা জল ও ময়লা প্রভৃতির নিকাশের ব্যবস্থা থাকে ব'লেও নদীর জল অতি সহজেই দূষিত হ'য়ে পড়ে। আবার পুকুর বা দীঘির জল খড়কুটো, পচা পাতা, ঘাস বা শেওলার দ্বারাও সময়ে সময়ে দূষিত হয়। যদি পাড় উঁচু ক'রে বাঁধানো না থাকে, তা'হলে পুকুর বা



এইভাবে ব্যবহারের ফলে নদী ও পুকুরের জল দূষিত হয়।

দীঘির জলের মতই অগভীর কূয়োর জলও দূষিত হয়, অন্যথা অশোষক স্তরের উপরকার জমা দূষিত জল চোয়ানোর ফলেই পান ও গৃহকর্মের অনুপযুক্ত হ'য়ে পড়ে। গভীর কূয়োর জল সাধারণতঃ উঁচু পাড় না থাকলে কিংবা তার চারদিক ইঁট ও সিমেণ্টে বাঁধানো না থাকলে গড়িয়ে পড়া ব্যবহৃত জলে

কিংবা কখনো চোয়ানো দূষিত জলেও দূষিত হ'য়ে থাকে। কূয়োর উপর জালের ঢাকনি না থাকলে খড়কুটো কিংবা পাতা প্রভৃতি জলে পচেও জলকে খারাপ করতে পারে। তাছাড়া ময়লা বা জীবাণুদুষ্ট দড়ি, বালতি বা পাত্রের সাহায্যে কূয়ো হ'তে জল তুললেও তা দূষিত হয়। আবার বহুদিন কূয়োর দেওয়ালকে পরিষ্কার না করলেও শেওলা প্রভৃতি জন্মানোর দরুণ কিংবা ইট, পাথর, ঘড়ার টুকরো, ভাঙ্গা বালতি বা পাত্র, কাদা প্রভৃতির দ্বারা জলের স্বাভাবিক উৎস বন্ধ হওয়ার ফলেও গভীর কূয়োর জল দূষিত হ'তে পারে। নলকূপের জল সাধারণতঃ দূষিত হয় একটি মাত্র কারণে, তা হচ্ছে দূষিত পাত্র বা জীবাণুদুষ্ট ময়লা কিছুর সংস্পর্শে। অনেক সময়ে আবার নীচের ফুটো বন্ধ হ'য়ে যাওয়ার দরুণও জল-উঠা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন

(১) স্বাস্থ্যকর বাসস্থান কাকে বলে? পাড়াগাঁয়ে ও সহরে স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের পরিকল্পনা কী ভাবে হওয়া উচিত?

(২) বাসগৃহ ও গৃহপ্রাঙ্গণের পরিচ্ছন্নতার জন্য কী কী ব্যবস্থা আবশ্যক?

(৩) বাসস্থানের উপযুক্ত রূপ জল-নিকাশের কিরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত?

(৪) পাড়াগাঁয়ের পক্ষে মল ও মূত্রের জন্য কোন ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা ভাল?

(৫) স্বাভাবিক ও কৃত্রিম বায়ু-সঞ্চালন কাকে বলে? কী কী উপায়ে গৃহে কৃত্রিম বায়ুচলনের ব্যবস্থা সম্ভবপর?

(৬) নির্মল জল আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক কেন? দীঘি, পুকুর ও নদীর জল সাধারণতঃ কী ভাবে দূষিত হয়?

(৭) পাড়াগাঁয়ে পানীয় জলের সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা কি?

দ্বিতীয় অধ্যায়

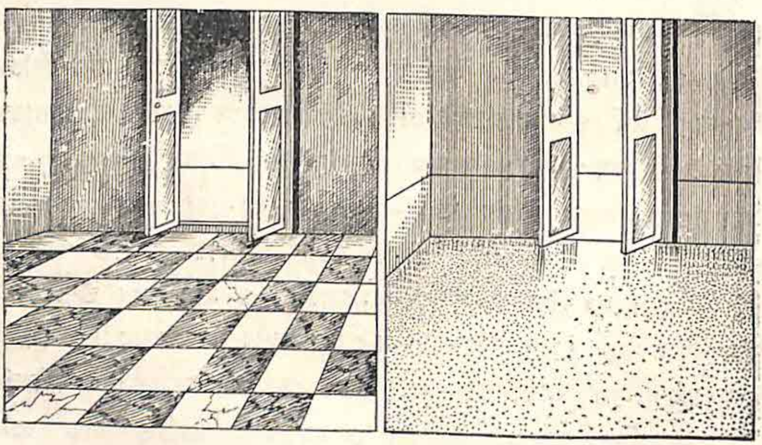
গৃহের সাজসজ্জা

আদিম মানুষের বাসস্থান ছিল পর্বতকন্দরে কিংবা গুহায়, যেখানে বন্য পশু, ঝড়-বৃষ্টি, শীতাতপ প্রভৃতির হাত হ'তে নিজেকে বাঁচানোই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। তারপর লোক যখন পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ছেড়ে সমতল ভূমিতে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করলে তখন প্রথম কাঁচা এবং পরে পাকাবাড়ীই হ'ল তার নিরাপদ ও আরামদায়ক বাসস্থান! মানুষ যেমন দৈহিক আরামের জন্য খাট-পালঙ, চেয়ার-টেবিল প্রভৃতি আসবাবপত্র এনে ঘর-বাড়ী সাজালে, আবার তেমনি চোখের ও মনের তৃপ্তির জন্য ঘরের দেওয়ালে ও ছাদে আঁকলে ছবি, কিংবা দেওয়ালে টাঙালে মনের মতন ঠাকুর-দেবতার, পূর্বপুরুষ কিংবা আপনার জনদের অথবা কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি! মেঝেয় বসালে পাথর-কাটা নক্সা, কিংবা পাথর বা টালির ছক, এবং উৎসবাদিতে দিলে নানা বিচিত্র আলপনা! অর্থ ও সামর্থ্য-অনুসারে কেউবা মেঝেতে পাতলে সুদূর পারস্য দেশের তৈরী নরম গালচে! বাগান হতে ডাঁটাশুদ্ধ নানা ফুল তুলে এনে বসিয়ে দিলে জলভরা ফুলের 'ভাস'-এ আর ঘরে বসেই উপভোগ করতে লাগলো বাগানের সৌন্দর্য ও ফুলের সৌরভ। অন্ধকার রাত্রিতে পছন্দমত বাতি জেলে নিজের রচিত গৃহসজ্জাকে নানারূপে ও নানাভাবে উপভোগের ব্যবস্থা করলে মানুষ! পৃথিবীতে যেদিন প্রথম মানুষের আবির্ভাব হয়, সেদিন সে জন্মেছিল মুক্ত আকাশতলে—প্রকৃতিরই কোলে! তারপর ক্রমবিবর্তন আর ক্রমপ্রগতির ফলে সে প্রকৃতির কোল ছেড়ে স্বরচিত নীড় রচনা করে, নিজের চারদিকে উঁচু দেওয়াল তুলে দিয়ে "ইটের পর ইট, তার মাঝে মানুষ কীট" রূপে বিরাজ করলেও, সে চিরদিনই মনেপ্রাণে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপাসক। তাই নিজের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সে প্রাসাদই হোক, আর কুঁড়ে ঘরই হোক, হাতেগড়া আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় নানা বস্তুর ফাঁকেও উপভোগ করতে চায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কিছু না কিছু! তাই সূর্যোদয়ের কিংবা সূর্যাস্তের, ঝরঝর ঝরে পড়া জলপ্রপাতের, কুলকুল ক'রে বয়ে যাওয়া নদীর, সু-উচ্চ পাহাড়ের, উত্তাল জলধির কিংবা প্রস্ফুটিত ফুলের ছবি দিয়ে সাজায় সে নিজের আবেষ্টনীকে; আর সদ্য-ফোটা ফুলের সঙ্গে শাঁখ, কড়ি,

প্রবাল প্রভৃতিকেও সে সুবিন্যস্ত ভাবে জড় করে নিজের ঘরে। মানুষের রচিত পিরামিড, তাজমহল, এফেল টাওয়ার আর ঠাকুর-দেবতা, শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতির প্রতিমূর্তিও স্থান পায় সে সজ্জিত পরিবেশের মধ্যে। এক কথায়, মানুষ নিজের গৃহকোণে বসেই পৃথিবীর যেখানেই যা কিছু ঈপ্সিত ও লোভনীয় আছে, তাই উপভোগ করতে চায় নিজের মানস-রাজ্যে!

মেঝের পরিকল্পনা ও সাজসজ্জা

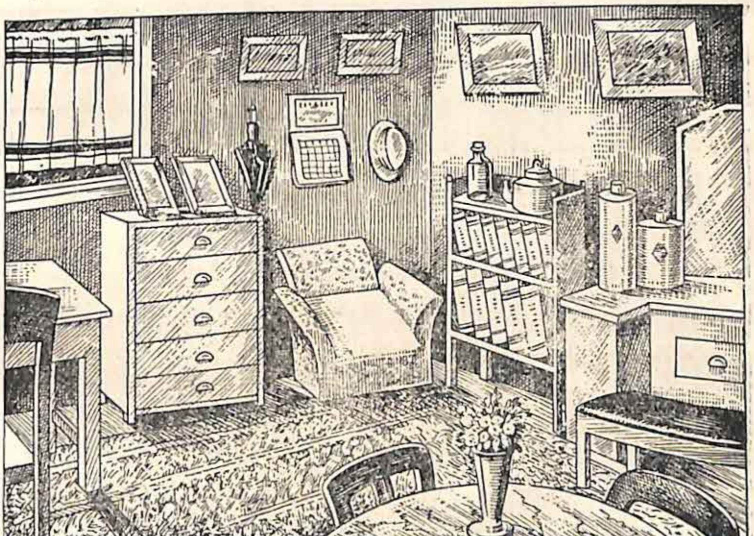
গৃহের উপযুক্ত সাজ-সজ্জার জন্য গৃহনির্মাণের আগেই উপযুক্ত পরিকল্পনা আবশ্যক। পাকা বাড়ীর মেঝেতে আজকাল চিরস্থায়ীভাবে নানারকম নক্সা করা যায়। সিমেণ্ট ও নানা রঙের সাহায্যে, রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে নানা রকম নক্সা করে যে মেঝে তৈরী হয় তাকে বলে **পেটেণ্ট ষ্টোনের**



মার্বেল ও মোজাইকের মেঝে

মেঝে। আবার সিমেণ্ট ও রঙের সঙ্গে সাদা কিংবা কালো মার্বেল পাথরের কুচি মিশিয়ে, নানা রকম নক্সা আঁকা মেঝেকে বলে **'মোজাইক'**। সাদা ও কালো মার্বেল পাথরকে চৌকো ক'রে কেটে পর পর নানাভাবে বসিয়ে **মার্বেল পাথরের ছককাটা মেঝে** তৈরী হয়। আবার নানারকম নক্সা-কাটা চৌকো টালি বসিয়েও একই ভাবে নক্সা করা বা ছককাটা **টাইলের মেঝে** হয়। বাড়ী-তৈরীর সময়েই নিজের পছন্দমত মেঝে করিয়ে নিতে হয়, তা না হলে

পরে তাকে মনোমত রূপ দিতে হলে ভাঙ-চুর করতে হয় বিস্তর এবং অসুবিধেও ভোগ করতে হয় খুবই। এ সকল পাকা মেঝের সুবিধে এই যে রোজ ঝাঁটা দিয়ে দুবার বা একবার মুছে নিলেই তা পরিষ্কার এবং চকচক্ করতে থাকে। তা ছাড়া দেশী এবং বিদেশী নানা রকমের কার্পেট বা গালচে পাওয়া যায়, তা দিয়েও মেঝের সৌন্দর্য বাড়ানো যায়। পারস্যদেশীয় ও কাশ্মীরী নরম গালচের দাম খুব বেশি ; সুতরাং কেবল প্রচুর বিত্তশালী যাঁরা তাঁরাই ঐগুলি কিনে মেঝের সৌন্দর্য বাড়াতে পারেন। দেশী গালচেগুলি তত পাতলা ও কারুকার্যখচিত নয়, সেজন্য তাদের দামও কতকটা কম। কিন্তু গালচে মেঝের সৌন্দর্য বাড়ালেও, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক্ হতে তা খুব



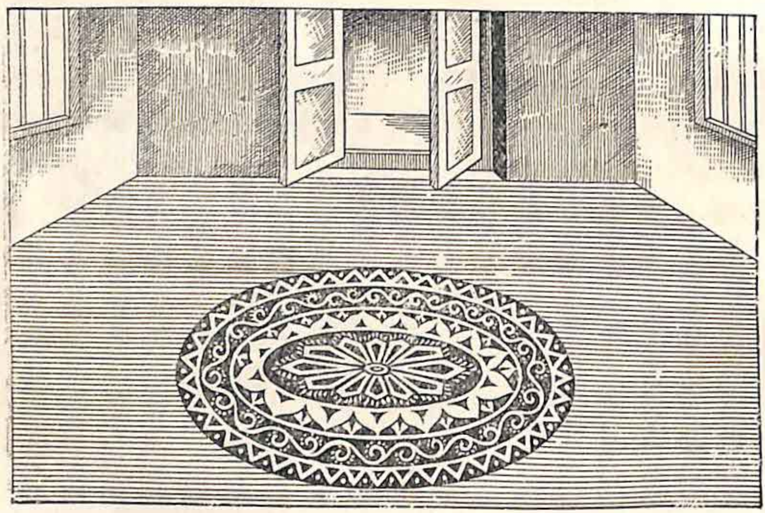
কার্পেট-বিছানো ঘরের মেঝে

সুবিধেজনক নয়, কারণ কিছুকালের মধ্যেই তাতে প্রচুর, ধূলো-বালি জমতে থাকে ; সুতরাং সেগুলি ঝেড়ে পরিষ্কার রাখা কষ্টসাধ্য। অন্যান্য দেশে 'ভ্যাকুয়াম ক্লিনার' বা শূন্যীকরণ পদ্ধতিতে পরিষ্কারক যন্ত্রের সাহায্যে অতি সহজেই এগুলিকে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশেও মেঝেতে কার্পেট বিছানো থাকলে, তাকে পরিষ্কার রাখার জন্য ঐরকম একটি যন্ত্র রাখা আবশ্যক। যন্ত্রটি চালিয়ে যে কেউ কার্পেটের উপর দিয়ে একদিক

হতে আর একদিক পর্যন্ত অনায়াসে তাকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে, তাতেই ধুলো-বালি আপনি যন্ত্রের মধ্যে চলে আসে। মেয়েরাও অতি সহজেই একে চালাতে পারে। পরিষ্কার করার আগে গালচের উপর হতে আসবাবপত্র, যেমন টেবিল, চেয়ার, সোফা প্রভৃতি সরিয়ে নিতে হয়।

গৃহসজ্জায় আলপনা ঃ উৎপত্তি ও বিকাশ

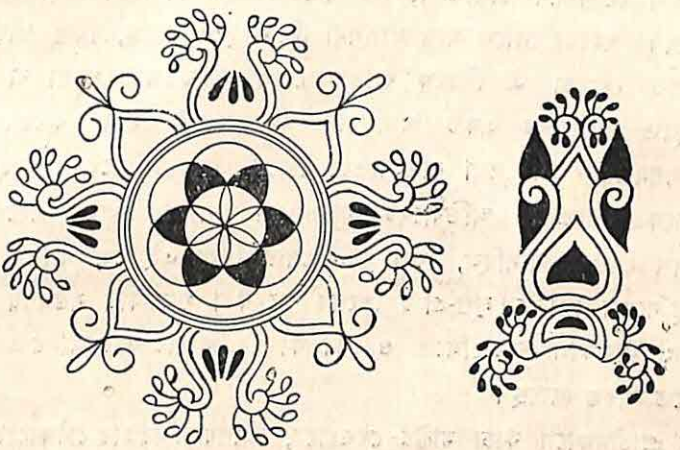
কোন বিশেষ দিনে বা বিশেষ ঘটনা-উপলক্ষে সাময়িকভাবে আলপনার সাহায্যেও মেঝের সৌন্দর্য বাড়ানো যায়। পাকা কিংবা কাঁচা মেঝেতেও আলপনা দেওয়া চলে। আলপনা প্রাচীন ভারতীয় গৃহসজ্জার একটা মনোরম আঙ্গিক উপাদান। সাধারণতঃ দক্ষিণ-ভারত ও পূর্ব-ভারতে অর্থাৎ মাদ্রাজ,



ঘরের মেঝেতে আলপনা

উড়িষ্যা, বাংলাদেশ ও আসামেই এর প্রচলন আজও দেখা যায়। পশ্চিম-ভারতে পার্শীদের মধ্যেও এক রকম আলপনার প্রচলন আছে ; তারা ছাঁকনীর মত টিনে নানা নক্সার আকারে ফুটো ক'রে তার উপর খড়িমাটির গুঁড়ো কিংবা ময়দা ছড়িয়ে দিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘরের মেঝেতে কিংবা সিঁড়িতে ছাপ বসিয়ে যে আলপনা আঁকে, তাও দেখতে বেশ ভালই লাগে। কিন্তু

বাংলাদেশে, মাদ্রাজে, উড়িষ্যাতে ও আসামে আলপনা দেওয়া হয় জলে চালের গুড়ি কিংবা খড়িমাটি গুলে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী ছাড়া অপর তিনটি আঙুলের সাহায্যে। ঝাঁট দেওয়া পরিষ্কার মেঝের কোন স্থানে অনুষ্ঠানের উপযোগী মনোমত একটি নক্সার পরিকল্পনা ক'রে নিয়ে, চালের গুঁড়ি বা খড়িমাটি-গোলা জলে ঐ তিনটি আঙুলের ডগা ডুবিয়ে পরিকল্পনা-অনুযায়ী এঁকে যেতে হয়। সাদা রঙ, যতক্ষণ কাঁচা থাকে ততক্ষণ আলপনা



আলপনার নমুনা

ফুটে উঠে না, কিন্তু রঙ শুকিয়ে গেলেই তা বিচিত্র ও মনোরমভাবে চোখে পড়ে। কিছুকাল চেষ্টা না করলে যেমন লোকে ভাল ছবি আঁকতে পারে না তেমনি অভ্যেস না করলে যে-সে আলপনা দিতে পারে না, কারণ সবল ও গতিশীল হাতে আলপনার রেখাগুলি টানতে হয়। সুতরাং আলপনাকে একটি প্রাচীন ভারতীয় শিল্প বললেও বেশি বলা হয় না, এবং ভাল আলপনা যাঁরা দিতে পারেন, কুশল শিল্পীর মত সম্মান নিশ্চয়ই তাঁদের প্রাপ্য।

মুসলমান-বিজয়ের আগেও অর্থাৎ খৃষ্টীয় একাদশ এবং দ্বাদশ শতকে বাংলাদেশে যে আলপনার প্রচলন ছিল, তৎকালীন কোন কোন লেখায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সে সময়ে দেশে মাটির কাঁচা ঘরই ছিল বেশী এবং মেয়েরা পূজা-পার্বণ, উৎসবাদিতে নানা বিচিত্র আলপনার সাহায্যে তাদের সেই গোবর-মাটিতে গড়া কাঁচা মেঝের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করতো। পূজোর সময় যেখানে ঠাকুরকে বসানো হ'ত, বিয়ের সময় যেখানে ছাঁদনাতলায়

বর দাঁড়াতো, কিংবা যেখানে সম্প্রদান-কালে বর-কনে বসতো, সে সকল স্থানে আলপনা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। বিশেষতঃ লক্ষ্মীপূজোর সময়ে উপযুক্ত আলপনার উপর লক্ষ্মীর আসনের ব্যবস্থার সঙ্গে বারান্দা হতে দরজা, এবং দরজা হতে ঐ আসন পর্যন্ত আলপনার-সাহায্যে ছোট ছোট পায়ের ছাপ এঁকে দেওয়া হতো। দেখে মনে হতো যেন মা লক্ষ্মীঠাকরুণ এইমাত্র তাঁর ছোট ছোট পায়ের ছাপ রেখে গিয়ে আসনে বসেছেন। মাঙ্গলিক পূর্ণ-কুম্ভ ও মঙ্গল-ঘট যেখানে বসানো হতো সে স্থানকে চিহ্নিত ক'রে তারও চারদিকে আলপনা দেওয়া হতো। শহরের লোকে আজ আলপনা দিতে ভুলে গেছে, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে আজও মেয়েরা ঐ শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন কতকটা পূজো বা উৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলেই মনে ক'রে। ভাল আলপনাকে অভ্যাগতেরা প্রশংসাভরা চোখে তাকিয়ে দেখেন। বহুসংখ্যক লোকের শহরমুখে অভিযানের ফলে আলপনা-শিল্প বাংলা দেশে প্রায় লোপ পেয়েই আসছিল, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, শান্তিনিকেতন-কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় সে লুপ্ত-প্রায় শিল্পের অনেকটা পুনরুদ্ধার সম্ভবপর হয়েছে এবং আজকাল শহরগুলিতে ও কোলকাতায় আবার তার আদর এবং কদর হ'তে আরম্ভ হয়েছে।

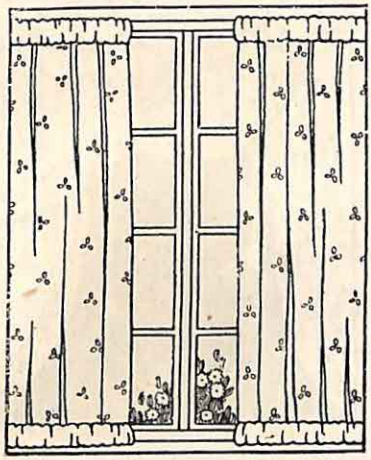
প্রাচীনকালে কাঁচা মাটির দেওয়ালে, বিশেষতঃ দরজার চৌকাঠের উপরে ও দুপাশেও সৌন্দর্য-বৃদ্ধির জন্য আলপনা দেওয়ার প্রথা ছিল; নানারকম ফুল, লতা-পাতা ও নক্সা আঁকা হতো আলপনার সাহায্যে। অত্যন্ত সাধারণ গৃহের পরিবেশে পাড়াগাঁয়ে কোন কোন মেটে বাড়ীতে আজও কোন কোন সৌন্দর্যপ্রিয় গৃহস্থবধূ আলপনার সাহায্যে এ রকম শিল্প-সৃষ্টির প্রয়াস করে।

দরজা-জানালার পর্দা

বর্তমান সভ্যসমাজে ঘরের দরজা-জানালায় পর্দা গৃহসজ্জার একটি প্রধান ও অত্যাবশ্যক উপকরণ। নিম্নলিখিত কারণে পর্দা ব্যবহৃত হয়, যথা—(১) আবরু-রক্ষা অর্থাৎ বাইরের অপরিচিত এবং বিশেষতঃ নিকটতম পাড়া-পড়শীর কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি হ'তে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা, (২) অতিরিক্ত রোদ বা আলোর প্রবেশে কিছুটা বাধা দেওয়া (৩) বাড়ীর বাইরের অপ্রীতিকর ও অবাঞ্ছনীয় দৃশ্য যাতে যখন-তখন মনোযোগ আকর্ষণ না করে তার জন্য (৪) কতকটা বাইরের ধুলো-বালিকে প্রতিহত করা এবং,

(৫) গৃহসজ্জার অংশরূপে চোখ ও মনের তৃপ্তির জন্য। কিন্তু তাই ব'লে পর্দা এমন হওয়া উচিত নয় যাতে ঘরে আলোর প্রবেশ একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায় কিংবা বাতাসও ঢুকতে না পারে। পর্দা খুব পুরু ও কড়া-রঙের হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। তা ছাড়া কাট-ছাটের বাহুল্যে এবং অসংখ্য ভাঁজের সমাবেশে, কেবল অভিনবত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে তাকে জবড়জং যত কম করা হয় ততই ভাল।

পর্দার জন্য কাপড়-নির্বাচনে কিংবা উপযুক্ত ভাবে তা তৈরী করা কিংবা লাগানোর জন্যও কতকটা রুচিজ্ঞান আবশ্যক। ঘরের দেওয়ালের রঙ, আসবাবপত্র এবং মেঝের সঙ্গেও পর্দার রঙ ও বিন্যাসের যথেষ্ট সামঞ্জস্য থাকা চাই। প্রায়ই দেখা যায়, নেড়া দরজা-জানালায় পর্দা-খাটানো

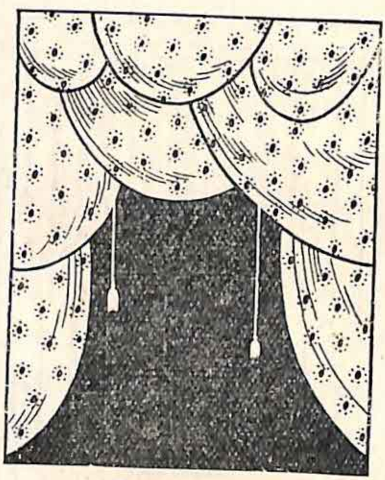


সাধারণ অথচ সুদৃশ্য জানালার পর্দা

মাত্র ঘরের চেহারা বদলে যায় এবং ভিন্ন ভিন্ন পর্দায় একই ঘরে নানারকম রূপ ফুটে উঠে। শয়ন-ঘরের পক্ষে দেওয়ালের রঙ ফিকে সবুজ, অর্থাৎ কচি কলাপাতার রঙ কিংবা ফিকে নীল হলে যেমন দৃষ্টির পক্ষে স্নিগ্ধকর হয়, তেমনি পর্দাগুলিও ঐ রঙের কিংবা তার চেয়ে গাঢ় একই রঙের হলেই ভাল হয়। ড্রয়িংরুম ও খাবার ঘরের পক্ষে উজ্জ্বল রঙ কিছুটা শোভন হলেও খুব উজ্জ্বল কোন কোন রঙ অত্যন্ত দৃষ্টিকটু হ'য়ে পড়ে, সুতরাং সে অনুসারে ঘরের রঙের সঙ্গে মিল রেখে পর্দার রঙ বাছাই করা উচিত। ছেলেমেয়েদের খেলাধূলোর কিংবা পড়ার ঘরের দেওয়ালের ও পর্দার রং এমন

হওয়া চাই যাতে সে রঙের প্রভাবে তাদের মন প্রফুল্ল থাকে, কিন্তু তাই বলে অতি গাঢ় লাল, কিম্বা কমলা রঙের পর্দা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়।

দরজা ও জানালার পর্দার কাট-ছাট যেমন ভিন্ন হয়, তেমনি আবার সেগুলি নানা উপায়ে খাটানও যেতে পারে। দরজার উপরকার প্রায় ছ' ইঞ্চি ছেড়ে, চৌকাঠ হতে ছ'ইঞ্চি উপরে এক টুকরো কাপড়ে সমস্ত দরজাকে ঢাকার উপযুক্ত মাপেই শয়ন-ঘর, খাবার ঘর, কাপড় ছাড়ার ঘর প্রভৃতির দরজার পর্দা করা ভাল। কিন্তু ড্রয়িংরুম বা বৈঠকখানার পর্দা দুদিকে দু'টুকরো কাপড়ের হলেই দেখতে ভাল হয়। কিন্তু সেগুলিতে কতকগুলি ভাঁজ থাকলেই ভাল দেখায়; সেগুলি সোজাসুজি নীচে ঝুলতেও

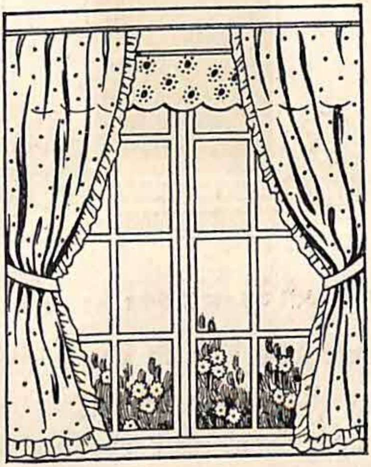


জবড়জং পর্দা দামী হলেও দেখতে ভাল নয়

পারে আবার মাঝখানে সরু দড়ি বা ফিতে দিয়ে চৌকাঠের সঙ্গে বেঁধে দিলেও মন্দ দেখায় না। দরজার মাথায় এক পাশ হ'তে আর এক পাশ পর্যন্ত ভাঁজ করা অবস্থায় আর এক টুক্রো পর্দার অংশও ঐ দুটির উপরে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে।

জানালাগুলির পর্দা খুব মিহি কিম্বা জালতি-কাপড়ের হলেই দেখতে ভাল হয়; জানালার জন্য খুব পুরু কাপড়ের পর্দা কখনই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। শুধু আবরু-রাখার জন্য জানালার নীচের দিকে ছ'ইঞ্চি এবং উপরের দিকে এক ফুট ছেড়ে, একটুকরো কাপড়ে পর্দার কাজ চললেও তা দেখতে ভাল

হয় না। তার জন্য ইচ্ছেমত দুদিকে সরিয়ে দেওয়া যায়, এমনি দু-টুকরোর পর্দাই সুবিধেজনক ও দেখতেও অনেকটা ভাল। দরজার মতই উপরে আর একটুকরো পর্দা থাকলে আরো ভাল হয়। নীচেও এরকম দুপাটে দুটুকরো পর্দাকে উপরেরই মত আটকে দেওয়া যায়, কিংবা খোলাও রাখা যায়। নীচে খোলা অবস্থায় ঝোলানো পর্দাকে ফিতে দিয়ে দুপাশে বেঁধে রাখা যায়, এবং ইচ্ছেমত তা খুলে দিলেই আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ঝুলতে থাকে। পর্দাগুলি সোজা বা বাঁকা যেভাবেই কাটা কিংবা খাটানো হোক না কেন, জানালার আকার ও আয়তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তা করলেই যেমন দেখতে ভাল হয়, আবার তেমনি অভিনব, বাঁকা কিংবা তেরছা

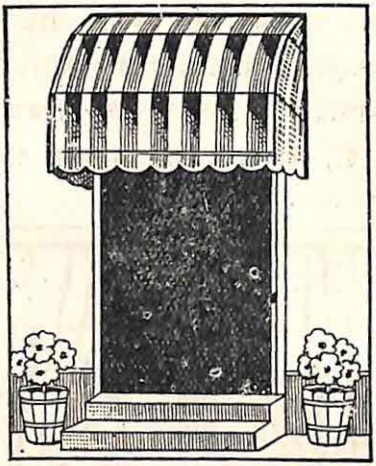


সাধারণ পর্দা শুধু বিন্যাসের ফলেই
অনেকটা দেখতে ভাল হয়

এবং জানালার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন পর্দা বেমানান ও বেখাপ্পা দেখায়। এক কথায় যে কোন বাড়ীর দরজা জানালায় পর্দার রঙ, আকার ও সংযোজনা দেখামাত্র গৃহকর্ত্রীর রুচিজ্ঞানের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

পর্দাগুলিকে প্রতিদিন যত্নসহকারে ঝেড়ে রাখা উচিত, কারণ তার প্রতিটি ভাঁজে অসংখ্য ধুলো-বালিকণা হাওয়ার সঙ্গে এসে জমে থাকতে পারে। আমাদের দেশের আবহাওয়া অর্থাৎ প্রখর সূর্যকিরণ, ঝড়ো হাওয়া এবং অপর্যাপ্ত বৃষ্টি পর্দার পক্ষে অতীব অনিষ্টকারক। সেজন্য শীতপ্রধান দেশের তুলনায় আমাদের দেশের পর্দার স্থায়িত্ব অনেক কম। খুব বেশী রোদ

লাগলে পর্দার রঙ অতি সহজেই নষ্ট হয়, ঝড়ো হাওয়াতে পর্দা ছিঁড়ে যাওয়ার আশঙ্কা এবং অতিবৃষ্টির ছাট লেগে পর্দাগুলি অতি সহজেই পচে যায় কিংবা তাদের রঙ হারিয়ে ফেলে। সুতরাং যতদূর সম্ভব পর্দাগুলিকে দরজা-জানালার ভিতরের দিকেই রাখা ভাল, যাতে রোদ, হাওয়া কিংবা



বৃষ্টির ছাট আটকা'বার জন্য দরজার উপরে শেড ও দুপাশে ফুলের টব

বৃষ্টির ছাট এসে তাদের বেশী ক্ষতি না ঘটাতে পারে। প্রত্যেক দরজা-জানালার একই সঙ্গে দুপ্রস্থ করে পর্দা করানো উচিত। কারণ তাতে এক প্রস্থ ময়লা হয়ে গেলে আর এক প্রস্থকে খাটিয়ে দরজা-জানালার সৌন্দর্য অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

ঘরে ফুলের সজ্জা ও তার বিন্যাস

ঘরে বসেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-উপভোগ করার একটি প্রধান উপায় ঘরের মধ্যে ডাঁটাশুদ্ধ ফুল সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা। ধনীদরিদ্র-নির্বিশেষে ফুল কে না ভালবাসে? আমাদের দেশের মেয়েরা ফুল বা ফুলের মালা দিয়ে খোঁপার সৌন্দর্য বাড়াতে চেষ্টা করেন, কেউ বা আবার বেল, জুঁই প্রভৃতি ফুলের মালা গলায় ও হাতে পরতে ভালবাসেন! বিয়ের পর ফুলশয্যা আমাদের বিয়ের উৎসবের একটি অঙ্গ, তাতে ঘরে খাট-পালঙ প্রভৃতিতে ফুল লাগিয়ে, কনেকে আপাদমস্তক ফুলের সাজে সাজানো

হয়। সকল সভ্য দেশেই বৈঠকখানা বা ড্রয়িংরুম, খাবার ঘর ও শয়ন ঘর, সর্বত্রই মনকে প্রফুল্ল রাখার জন্য নানারকম বাহারের ফুলে সাজানোর ব্যবস্থা আছে। আবার পুরুষেরা উৎসবাদিতে কোটের বোতামের ফুটোয় ফুল লাগান এবং পাশ্চাত্য দেশে বিয়ের সময় কনের হাতে ফুলের তোড়া একটা অত্যাবশ্যক উপাদান বললেও চলে। একাধারে 'সূর্যোদয়' ও 'চেরী' ফুলের দেশ জাপান; সে দেশে থরে থরে ফুলের শোভায় হাসতে থাকে প্রতি বাড়ীর প্রতিটি গৃহ! কী ধনী, কী দরিদ্র সকলেরই বাড়ীতে ফুলের ছড়াছড়ি—আর জীবন্ত ফুলেরই মত হাসিমুখে ঘুরে বেড়ায় সে দেশের ছেলেমেয়েরা। সুইজারল্যাণ্ডে ও ডেনমার্কেও দেখা যায় যে প্রতি ব্যালকনি বা প্রতি জানালার নীচের স্থানটুকুতে টবের মধ্যে বহু ফুলের গাছ, যেন এক একটি ছোট বাগান-বিশেষ। প্রস্ফুটিত ফুলই যেন তাদের আনন্দময় জীবনের প্রতীক!

আমাদের দেশে সৌখীন ও বিলাসী যাঁরা, কেবল তাঁরাই ফুলকে গৃহ-সজ্জার কাজে লাগাতে অভ্যস্ত! মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত গৃহস্থ-ঘরে এর প্রচলন খুবই কম। ঘরে মূল্যবান আসবাব-পত্র হয়ত না থাকতে পারে, কিন্তু গরীবেরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরে যদি কোন স্থানে উপযুক্ত জলপূর্ণ পাত্রে নানারঙের ফুলের তোড়া বসিয়ে রাখা হয়, তাহলে ঘরের বিমর্ষ বা অতি একঘেয়ে আবহাওয়াও দূর হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ, কয়েকটি ফোটা ফুলের হাসিতে ও সৌরভে। পাড়াগাঁয়ে অতি সহজেই ফুলের বাগান তৈরী করা যায় এবং তা হতে প্রতিদিন ডাঁটাশুদ্ধ কয়েকটি ফুল তুলে এনে পিতল কিংবা মাটির বাসনে জলের মধ্যে সাজিয়ে গুছিয়ে, যদি শোয়ার, বসবার কিংবা ছেলেমেয়েদের পড়বার ঘরে কোন উপযুক্ত স্থানে রাখা হয়, তাহলে ঘরের চেহারাই একেবারে বদলে যাবে। নাই বা থাকলো রূপোর বা পেতলের 'ভাস', মাটির সস্তা পাত্রেরও গায়ে নক্সা এঁকে বা রঙ করে নিয়ে তার মধ্যে ফুল রাখলে ক্ষতি কি? এর জন্য পয়সার চেয়ে রুচিজ্ঞানই বেশি থাকা আবশ্যক। শহরে যদিও খুব কম বাড়ীতেই ফুলের বাগান আছে, তবু ইচ্ছে করলেই, ছাদ, বারান্দা বা যেটুকু সামান্য স্থান পাওয়া যায়, সেখানে মাটির টবে কয়েকটি ফুলের গাছ লাগানো এমন কিছু শক্ত নয়; তার জন্য চাই যথেষ্ট ইচ্ছে আর খানিকটা পরিশ্রম। এমনি টবে যখন ফুল ফুটতে থাকে, তখন বৈঠকখানা বা সিঁড়িতে আর একটি পিতলের বড় পাত্রে তা বসিয়ে রাখলে ঘরে বসেই বাগানের শোভা উপভোগ করা

যেতে পারে। কিংবা ডাঁটাশুদ্ধ কতকগুলি ফুল তুলে কিংবা কিনে এনে, উপযুক্ত রূপো, পিতল, চীনেমাটি কিংবা কাচের জলপূর্ণ 'ভাস'-এর মধ্যে তাদের বসিয়ে দিলে অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাদের সৌন্দর্য ভোগ করা যায়। শোয়ার ঘরে 'টিপয়' কিংবা ড্রেসিং টেবিলের উপর, খাবার ঘরে খাবার-টেবিলের কিংবা অন্য কোন আসবাবের উপর, পড়বার কিংবা অফিস ঘরে টেবিলের উপর এবং ড্রয়িংরুম বা বৈঠকখানায় কোন উপযুক্ত স্থানে যদি প্রত্যহ এরকম কয়েকটি ফুলের 'ভাস' সুবিন্যস্ত অবস্থায় রাখা হয়, তা হলে নানা রঙবেরঙের ফুলের সৌন্দর্যে চোখ আর তাদের সুবাসে নাকই শুধু তৃপ্তিলাভ করে না, সমস্ত দেহ ও মনও তাতে প্রফুল্ল ও সজীব হয়ে উঠে। তখন ঘরে বসেও ফুলের মাধ্যমেই মানুষ যে-প্রকৃতির সন্তান, সে-প্রকৃতিরই সঙ্গে যেন আবার তার যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং সে আনন্দময় পরিবেশ, দিবসের শ্রমে শ্রান্তদেহ ও ক্লান্ত মনকে আবার কতকটা তাজা ও চাঙ্গা করে তোলে।

গৃহ-সজ্জার জন্য ফুল ও তার জন্য উপযুক্ত আধার-নির্বাচন

গৃহ-সজ্জার জন্য কেউ কেউ গোলাপ, গন্ধরাজ, বেল, জুঁই, চামেলি, রজনীগন্ধা প্রভৃতি ফুলকে ভালবাসেন, কেননা ঐ সকল ফুলের সৌরভে অতি সহজেই মন প্রফুল্ল হয় এবং মনে একটা স্নিগ্ধ শান্তির ভাব আপনি আসে। আবার কেউ কেউ চোখের তৃপ্তির জন্য নানা রঙবেরঙের ফুল ঘরে রাখতে ভালবাসেন; আর নানারকম মৌসুমী ফুলই এ হিসেবে প্রকৃষ্ট। কিন্তু ফুল-নির্বাচনে কতকগুলি কথা মনে রাখলে ভাল হয়। কোন কোন রঙ অপর কোন রঙের পাশে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠে, যেমন সবুজ পাতার উপর লাল কিংবা গাঢ় কমলা রঙের ফুল; আবার হলদে ও নীল রঙ পাশাপাশি থাকলে একটির বৈসাদৃশ্যে অপরটির উজ্জ্বলতা বেশী হয়। সুতরাং ঘরে সাজিয়ে রাখবার জন্য ফুল কিনে কিংবা বাগান হতে তুলে আনতে হলে লাল কিংবা কমলা রঙের ফুলের সঙ্গে ডাঁটাতে সবুজ পাতা-শুদ্ধ আনাই ভাল। নীল বা বেগুনী ফুলের ডাঁটায় পাতা না থাকলেও চলে, কিন্তু তার সঙ্গে মানানসই যাতে হয় তার জন্য পাতা-শুদ্ধ কিছু হলদে বা ফিকে কমলা বা গোলাপী অন্য ফুল থাকলে ভাল হয়। অবশ্য তোড়া-সাজাবার সময়ে সব ফুলেরই সঙ্গে কিছু পাতা থাকা ভাল। ভাসের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে জল ঢেলে, ফুলের ডাঁটাগুলিকে এমন ভাবে কেটে

(শুখনো বা মরা পাতা বাদ দিয়ে) বসাতে হবে যাতে ফুলগুলি বেশ সুন্দরভাবে মাথা উঁচু করে থাকে। এক রঙের ফুলগুলি একত্র না রেখে নানান রঙের ফুলগুলিকে পরপর সাজিয়ে রাখলে অনেকটা ভাল দেখায়। তারপর ডাঁটাগুলিকে খুব গাদাগাদি না করে, জলের মধ্যে বেশ সহজভাবে ডুবিয়ে দিয়ে, ফুল ও পাতার উপর জল ছিটিয়ে দিলে তা অনেকক্ষণ ধরে তাজা থাকে। তারপর সেগুলিকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে, খাবার ঘরে, অফিসরুমে কিংবা শোয়ার ঘরে ঠিক মানানসই স্থানে রেখে দিলে ঘরের সৌন্দর্য আপনি অনেকটা বেড়ে যায়। সুতরাং আরাম করতে, খেতে, পড়াশুনা বা কাজকর্ম করতে কিংবা শুতে-বসতেও ফুলের সান্নিধ্য শুধু ঘরের আবহাওয়াকেই বদলে দেয় না, ক্লান্ত দেহ এবং বিমর্ষ মনকে পর্যন্ত তাজা ও প্রফুল্ল করে তোলে! আবার রোগশয্যায় যখন কেউ কাতরাচ্ছে এবং ডাক্তার-বদ্যি-নার্স প্রভৃতির উপস্থিতিতে রোগীর ঘরে একটি গুরুগম্ভীর ও বিমর্ষ আবহাওয়া বিরাজ কচ্ছে তখন রোগীর শিয়রে টেবিলের উপর কিংবা রোগীর কাছে একটি টিপয়ের উপর একগোছা তাজা ফুলের রঙ, রূপ ও সৌরভ, একমুহূর্তে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় এবং মনে হয় যে রোগ বুঝি বা অর্ধেকই আরাম হয়ে গেছে এবং রোগী নিশ্চয়ই এগিয়ে চলেছে দ্রুত নিরাময়ের পথে। এমনি যাদুদণ্ডের প্রভাব থাকে লুকিয়ে, ঘরের মধ্যে যেখানে থাকে সুবিন্যস্তফুলের একটি তোড়া বা গুচ্ছ।

ভাসে বা অন্যপাত্রে ফুল-সাজানো শিল্পকলার মতই একটি কাজ। ছবি আঁকে যে চিত্রকর, তার যেমন একই সঙ্গে উপযুক্ত মাত্রাজ্ঞান ও দৃষ্টি-ভঙ্গি থাকা আবশ্যক, ঠিক তেমনি বাড়ীর দক্ষ শিল্পী হন সে নারী, যিনি বাগানের ফুল তুলে বা বাজারের ফুল কিনে এনে তার সাহায্যে ঘরের মধ্যে রূপ, রস ও গন্ধ একই সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। কথায় বলে, 'ফুলের মত হৃদয়', 'ফুলের মত পবিত্র', ফুলের মত কোমল', 'ফুলের মত মধুময়', অর্থাৎ সুন্দর যা, কোমল যা, পবিত্র যা, মধুময় যা, ফুল সে সকলেরই প্রতীক! বাগানে রঙ-বেরঙের ফুলের বৈচিত্র্য ও সৌরভ ফুটায় দক্ষ মালী, আর ঘরের মধ্যেও ফুলের সাহায্যে দক্ষশিল্পীর কুশল হস্তের রচনা, সে শ্রী ও সুবাস ফুটিয়ে তুলে ঘরকেও করে তোলে সুন্দর, পবিত্র ও অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত। এজন্যই পূজোর বেদী সাজানো হতে পূজোর অর্ঘ, বিয়ে হতে ফুলশয্যা, দৈনন্দিন জীবনের প্রসাধনে ও প্রতি মাঙ্গলিক কাজে, এমন কি শ্মশানযাত্রায় পর্যন্ত ফুলের প্রয়োজন। আর গৃহ-সজ্জায়, সুইজারল্যাণ্ডে বাতায়নের পাশে, জাপানে প্রতিঘরে, ইংলণ্ডে খাবার ঘরে, ভারতবর্ষে পূজোর মন্দিরে, যেদেশে যেখানেই হোক না

কেন, ফুলের মত এত সুন্দর, এত স্নিগ্ধ, এত পবিত্র ও এত মনোমুগ্ধকর আর কিছুই হতে পারে না।

যে ভাস বা পাত্রে ফুল রাখা হয় তার আকার গড়ন ও কারুকার্যসম্বন্ধেও নজর রাখা উচিৎ, কেন না ফুলের সমাবেশ যত সুন্দরই হোক না কেন, তার আধার যদি তার উপযুক্ত না হয়, তাহলে সৌন্দর্যসৃষ্টির সকল প্রয়াসই বিফল হতে পারে। রূপো বা পিতলের ভাসগুলি সহজে ময়লা হয়ে পড়ে বলে প্রায়ই সিলভো কিংবা ব্রাসো দিয়ে ঘসে সেগুলোকে পরিষ্কার করে, যাতে সেগুলি চকচকে থাকে, তার চেষ্টা করা উচিত। পিতলের মিনে করা কারুকার্যখচিত 'ভাস' নতুন অবস্থায় দেখতে খুবই সুন্দর থাকে, কিন্তু পরে মিনে উঠে গেলে সেগুলি দেখতে আর আগের মত সুন্দর থাকে না। নানারকম ছবি-আঁকা চিনেমাটির 'ভাস'গুলি সব সময়েই নতুনের মতন দেখায়, সেজন্য অনেকেই এগুলিকে পছন্দ করেন। দেশী মাটিতে গড়া, চকচকে ভাসও চটা উঠে না গেলে দেখতে মন্দ দেখায় না। আবার মাটির দেশী ভাসগুলিকে সাদা রঙ করে তার উপর তুলি দিয়ে নানা সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকে, সেগুলিকেও গৃহে ফুলের আধাররূপে ব্যবহার করা যায়। 'ভাস'গুলি দামী অর্থাৎ রূপোর বা পিতলের হলেই যে সাজানোর পক্ষে সবচেয়ে ভাল হবে এমন নয়। অতি সস্তা দামের মাটির 'ভাস'ও সুরুচিসঙ্গত চিত্রণে ও উপযুক্ত ফুলের বিন্যাসে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে। এই সমস্তই নির্ভর করে কুশল শিল্পীর রুচিজ্ঞান, সুনির্বাচন, এবং সকল রকমে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্তবক-রচনার উপর।

প্রশ্ন

(১) গৃহের মেঝের সুরুচি ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিকল্পনা বলতে কী বোঝ?

(২) আলপনা কাকে বলে? তার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে যা' জান বল।

(৩) ঘরের দরজা জানালায় পর্দা লাগান হয় কেন? পর্দা-নির্বাচনের সময়ে কোন কোন বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত।

(৪) ফুলের দ্বারা কীভাবে গৃহের সাজসজ্জা বাড়ানো সম্ভবপর?

(৫) গৃহের সাজ-সজ্জার প্রধান উপাদান কি কি?

তৃতীয় অধ্যায়

গৃহস্থালি-পরিচালনা ও তার উদ্দেশ্য

গৃহস্থালি-পরিচালনা ছোটখাটো রাজ্য-পরিচালনার মতই একটি কঠিন ও আয়াসসাধ্য ব্যাপার। রাজার হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনা করেন মন্ত্রিগণ, কিন্তু প্রতি গৃহরূপ ক্ষুদ্ররাজ্যে পরিচালনার সকল দায়িত্ব বহন করতে হয় এক এবং অদ্বিতীয় গৃহকর্ত্রীকে। গৃহ-পরিচালনা মানে গৃহ বা সংসারকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-বসা প্রভৃতি সকলের দৈনন্দিন প্রয়োজন-মেটানো, হাট-বাজার করানো, টাকা-পয়সার হিসেব, গয়লার দুধের হিসেব, মুদীর দোকানের হিসেব, বাজারের হিসেব, ধোপার হিসেব প্রভৃতি রাখা, ময়লা কাপড়-কাচা, ধোয়া ও ইস্তিরি করা, রান্নাবান্না, শয্যারচনা, রোগীর পরিচর্যা, অতিথি-অভ্যাগতের আপ্যায়ন, চাকর-বাকর প্রভৃতিকে চালানো, এমনি অসংখ্য ছোট বড় কাজ কর্ম, কর্তব্য ও দায়িত্ব যাতে সুসম্পন্ন হয়, তার জন্য যখন যা আবশ্যক তাই করে যাওয়া। এ সকল অসংখ্য খুঁটিনাটি কাজের একত্র সমাবেশের নামই গৃহস্থালি বা গৃহকর্ম; আর তার সুপরিচালনার উদ্দেশ্য, পিতা-মাতা, ভাই-বোন কিংবা স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ী, দেওর-ননদ, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, আশ্রিত, অতিথি-অভ্যাগত ও দাস-দাসী নিয়ে যে সংসার বা পরিবার, তার সকলের এবং প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যরক্ষা, আরাম ও সুখশান্তির জন্য যা কিছু দরকার, তাই যতদূর সম্ভব সুষ্ঠুভাবে বিধান করা। সুতরাং আমাদের গৃহের গৃহিণীর কর্তব্য অতি কঠোর এবং দায়িত্বও অত্যন্ত বেশী। সেজন্যই সংস্কৃতে একটি কথা আছে 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' অর্থাৎ গৃহিণীই গৃহের সর্বেসর্বা।

গৃহস্থালি-পরিচালনায় কতকগুলি কাজ ঘড়ির কাঁটার মত দিনের পর দিন করে যেতে হয় যেমন, ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া ও মোছা, কাপড়-চোপড় ও বিছানাপত্র পরিষ্কার করা, রান্নাবান্না করা, বাজার করানো, ইত্যাদি; আবার কোন কোনটি নিয়ম করে প্রতি সপ্তাহে করতে হয় যেমন, ধোপার কাপড়ের হিসেব রাখা, মুদীর দোকানের হিসেব রাখা, দেওয়াল ঘড়িতে চাবি দেওয়া, ধোওয়া-কাপড় ইস্তিরি করা প্রভৃতি; আবার কোন কোন কাজ মাসেও একবার করতে হয় যেমন, চাকর-ঝি প্রভৃতির মাইনের হিসেব, গয়লার দুধের হিসেব, মুদী বা ধোপার পাওনার হিসেব, গত মাসের আয়-ব্যয়ের হিসেব, বর্তমান মাসের

মোটামুটি আনুমানিক আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ প্রভৃতি ; আবার কোন কোনটা হঠাৎ এসে পড়া কাজ যেমন, অতিথি-অভ্যাগতের আপ্যায়ন, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম, রোগীর পরিচর্যা, ইত্যাদি। সুতরাং গৃহকর্ম-পরিচালনায় বহুস্থলেই যদিও গতানুগতিক একটি পারম্পর্য থাকে, তাহলেও তাদের মধ্যে বৈচিত্র্যও বড় কম থাকে না ; আর হঠাৎ যদি অসুখ-বিসুখ, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ বা অতিথি-অভ্যাগতের আবির্ভাব ঘটে, তাহলে একটানা শান্ত ও স্থিরভাবে চলছে যে সংসারের অভ্যস্ত কাজের স্রোত, সেখানে ঐ সকল আকস্মিক ঘটনা দেখা দেয় বিপর্যয়ের মত। এরকম সংকটক্ষণে দৃঢ়হস্তে সংসার-তরণীর হাল ধরতে সক্ষম যে গৃহকর্ত্রী, কেবল তিনিই পারেন তাকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিতে। এ সকল ক্ষেত্রে, শুধু অর্থ এবং পরিচালনার অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে চাই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দূরদর্শিতা ও প্রচুর মনের বল।

গৃহস্থালির দৈনন্দিন কাজকর্ম

একটি মধ্যবিত্ত সংসারের দৈনন্দিন গৃহকর্মগুলি পর পর কি ভাবে সাধিত হয়, তা যদি আমরা ভেবে দেখি, তাহলে বিস্মিত হতে হয়, যে, কতকিছু খুঁটিনাটি কাজ চলছে প্রতিগৃহে, ভোর হতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর! যাঁর হাতে পরিচালনার ভার, প্রায়ই তাঁকে উঠতে হয় অতি ভোরে ; ঝি-চাকরকে ডেকে তুলতে হবে, উনানে আঁচ দিতে হবে, গয়লার দুধ রাখতে হবে, একদিকে হাঁড়িতে ডালভাত চড়াতে হবে, অন্যদিকে চাকর বা অন্য কাউকে বাজারে পাঠাতে হবে—তারপর 'আগুনে পড়ি কি জলে পড়ি' করে ন'টায় অফিসের ভাত আর সাড়ে ন'টা হতে দশটায় ইস্কুল কলেজের ভাত যোগাতে হবে—তাই মাছ কুটতে হবে, তরকারী কুটতে হবে, দুধ জ্বাল দিতে হবে, ঠাঁই করতে হবে, পরিবেশন করতে হবে এবং বাবুর অফিসের কাপড়-চোপড় আর ছেলেমেয়েদের ইস্কুল-কলেজের কাপড়-চোপড় বের করে দিয়ে আসতে হবে। এই অফিস আর ইস্কুল কলেজের কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে, অন্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে, কোলের ছেলে থাকলে তাকে খাওয়াতে হবে, বিছানা তোলা ও রোদে দেওয়ার, আর ঘর-দোর ঝাড়ামোছার ব্যবস্থাও করা চাই, তা নাহলে ঐ সকল সকাল বেলার কাজ দুপুর বেলা পর্যন্ত আপনি গড়িয়ে যাবে।

বাবুকে অফিসে আর ছেলেমেয়েদের ইস্কুল কলেজে পাঠিয়ে দিয়েই বা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার মত অবসর কোথায়? কচি-কাচা থাকলে তাদের

স্নান করিয়ে খাইয়ে ঘুম পাড়াতে হবে। তারপর বাকী ঝাড়পোছ, বিছানা করা, কাচাকুচি, নিজের স্নান, খাওয়া, হেঁসেল-তোলা, চাকর-বাকরের খাওয়া প্রভৃতি চুকতে চুকতে দেড়টা-দুটো বাজবেই বাজবে! বিছানায় একটু বিশ্রামের জন্য মুহূর্তের জন্য গা এলিয়ে দেওয়াই সার, কারণ ততক্ষণে কচি-কাচারা বিশ্রাম সেরে উঠে বসেছে, আবার তাদের খাওয়াতে হবে, এবং যারা সারাদিন খেটে বাড়ী ফিরছে, তাদের জন্য যাই হোক কিছু খাবার করে রাখতে হবে। আবার ঝি-চাকরকে ডাকতে হবে, কেননা ততক্ষণে গয়লা বিকেলের দুধ নিয়ে এসে ডাকাডাকি করছে, কিন্তু ঝি-চাকরও ত মানুষ, তারাও একটু বিশ্রাম না করে, উঠবেই বা কি করে? অগত্যা হয়ত নিজেকে উঠেই দুধ রাখতে হবে, "বাবারে"; "বাছারে", "মারে" ডেকে ডেকে দাস-দাসীকে তুলে আনতে হবে, ময়দা থাসতে হবে, উনান চড়াতে হবে, লুচি বেলতে হবে ও ভাজতে হবে, আলু-পটোল কাটতে হবে, ভাজা করতে হবে এমনি কত কিছু! ততক্ষণে "মা খিদে পেয়েছে", "খাবার কোথায়", "শীগ্‌গির দাও", "আজ ম্যাচ আছে", এমনি নানাজনের নানা আব্দার পোযাতে হবে। তার মধ্যে আবার কেউ বলবে "মিষ্টি কিছু নেই কেন"? কেউ বলবে "রোজ রোজই কেবল লুচি আর লুচি", আবার কেউবা ছোট বোনটির সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বলবে মা কেন তাকে একখানি বেশী পটল ভাজা দিয়েছে। সেগুলি মিটমাট করে, চুল বাঁধতে, মুখ ধুতে, আর তাড়াতাড়ি করে কাপড় ছাড়তে হয়। ওদিকে পশ্চিমের আকাশে সূর্য ঢলে পড়ে, তুলসী-তলায় প্রদীপ জেলে শাঁখ বাজিয়ে, সন্ধ্যে দিতে হয়। এতক্ষণে বাইরে হয়ত গৃহস্বামীর পরিচিত পায়ের শব্দ শোনা যায়। তাঁর কাপড় ছাড়া, হাত-পা-মুখ ধোওয়া হয়ে গেলে তাকে খাবার দিতে হয়। ওদিকে আবার রাত্তিরের আহারের জন্য হাঁড়ি চড়াতে হয়। ছেলেরা খেলাধূলো সেরে ফিরে আসে কাদামাটি মেখে, কচি-কাচাকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়াতে হয়। বিছানা করতে হয়, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার তদারক করতে হয়, ভাতের ফেন গালতে হয়, তরকারি-সাঁতলাতে হয়, রুটি সেঁকতে হয়, ডালে ফোড়ন দিতে হয়, এমনি করে রান্নাবান্না সারতে রাত দশটাই হয়ত বেজে যায়। ঠাঁই করা, সকলকে খাওয়ানো, হেঁসেল চুকানো, নিজের খাওয়া, চাকর-বাকরকে খাওয়ানো—তারপর এগারোটার সময়, হয়ত বা কয়েক ঘণ্টার জন্য ছুটি! নিত্যনৈমিত্তিক এ কাজগুলিও ঘড়ির কাঁটার মতই করতে হয়, তারপর সাপ্তাহিক, মাসিক এবং সময়ে সময়ে আকস্মিক কর্তব্য ত আছেই।

সুগৃহিণীর কর্তব্য

বিত্তশালী যাঁরা তাদের বাড়ীর গৃহিণীর নিজের হাতে কাজ করবার প্রয়োজন না হলেও, গণ্ডায় গণ্ডায় ঝি-চাকর, রাঁধুনী, সরকার-গোমস্তা, মোটরের ড্রাইভার ও দারোয়ানদের উপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে চালানোও সহজ ব্যাপার নয়। নিজের হাতে কিছু করলে, যতদূর সম্ভব নিখুঁত ও সুচারুরূপে তা করা যায়, কিন্তু অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিতে হলে সব সময়েই তাদের কাজের খুঁটিনাটির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়, তা না হলে তারা ফাঁকি দেবেই দেবে, কিংবা দায়সারা গোছের দায়িত্ব পালন করবে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রাখলে যেখানে-সেখানে ধুলো বা ময়লা জড় হয়ে থাকবে, ঘরে হয়ত নাক-অবধি ঝুল ঝুলতে থাকবে, দেওয়ালে ছবির আড়ালে হয়ত ধুলো জমে থাকবে, বাথরুমে হয়ত দুর্গন্ধ থাকবে কিংবা সাবান-গোলা জলে তা পিচ্ছিল হয়ে থাকবে, সাবান-সোডা খরচ করেও হয়ত কাপড় পরিষ্কার হবে না, ইস্তিরি করতে গিয়ে হয়ত কোন চাকর ভাল কাপড়কে পুড়িয়েই ফেলবে, গয়লা হয়ত চাকরের সঙ্গে বখরা করে দুধে জল মেশাবে, মাজা বাসনে হয়ত এঁটো-কাঁটা লেগে থাকবে, ছেলে মেয়ের আয়া বা ঝি হয়ত নোংরা হাতে তাদের খাওয়াবে, চাকর হয়ত বাজারের পয়সা চুরি করবে, উড়ে বামুন হয়ত হাতে ঘাম মুছে, নাক ঝেড়ে কিংবা দাদ চুলকে সে হাতেই রান্না করবে ও পরিবেশন করবে, রান্না করা খাবার ঢাকা না দেওয়াতে হয়ত বেরালে তা খেয়ে যাবে, না হয়ত তাতে মাছি বসবে, এমনি কত কিছু আর্থিক ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ব্যাপার অনবরত ঘটতে থাকবে। যাঁরা ঝি-চাকর, বয়-বাবুর্চি, সরকার-গোমস্তার হাতে নিশ্চিন্ত হয়ে সংসারের ও নিজেদের স্বাস্থ্য ও শরীর-রক্ষার ভার সঁপে দিয়ে ঘরকে তুচ্ছ করে সমাজকেই আশ্রয় করেন, অর্থাৎ সারাদিন সভা-সমিতি ও কমিটির কাজ নিয়ে মেতে থাকেন এবং বাড়ীতে যে দু এক ঘণ্টা থাকেন, তাও নাটক-নভেল পড়ে কিংবা আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দেন, তাদের উল্লেখ না করাই ভাল! কিন্তু খুব বড় লোকের বাড়ীতেও সুগৃহিণীকে বিরাট গৃহস্থালি-সুপরিচালনার জন্য প্রত্যেকটি কাজের তদারক করতে করতে ঠিক চরকির মতন ঘুরে বেড়াতে হয়। বাড়ী, সে যতই ছোট বা বড় হোক, আর লোকের সংখ্যা, সে যতই কম বা বেশী হোক, নিজের অবস্থা ও সঙ্গতি-অনুসারে সংসারের অসংখ্য খুঁটিনাটির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে, প্রশান্তমনে ও হাসিমুখে যিনি গৃহস্থালির সকল কাজকর্ম অতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারেন, তাঁকেই সুগৃহিণী বলা যায়।

কালিদাসের অমর কাব্য রঘুবংশে দেখা যায় যে রাণী ইন্দুমতীর মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হয়ে রাজা অজ তার সম্বন্ধে বলছেন "তুমি আমার গৃহিণী, আমার সখী এবং ললিতকলায় প্রিয় শিষ্যা ছিলে"। এ হতে আমরা সুগৃহিণীর সংজ্ঞার কতকটা আভাষ পাই। অর্থাৎ গৃহিণী যেমন স্বামীর সখা হবে, তেমনি ললিত কলায়ও তার ব্যুৎপত্তি থাকবে; অর্থাৎ কি করে বাড়ীঘর সাজিয়ে গুছিয়ে তাকে পরিপাটি করে রাখতে হবে, আলপনা দিয়ে কিংবা ফুলের স্তবকে সাজিয়ে, দরজা-জানালায় সুরুচিসঙ্গত পর্দা খাটিয়ে এবং ঘরের মধ্যে সব কিছু সুবিন্যস্ত রাখলেই তার কাজ শেষ হয়ে যাবে না, গান-বাজনায়ও সে হবে পারদর্শিনী এবং কী বাড়ীর লোকজনদের আরামের জন্য, কী অতিথি-অভ্যাগতের আপ্যায়নের জন্য বাড়ীর আবহাওয়াকে যতরকমে সম্ভব উপভোগ্য করে তুলবে। পরিবারের সকলের আরাম ও স্বাস্থ্যের প্রতি যেমন তার সতর্ক দৃষ্টি থাকবে, তেমনি তার নিজের স্বাস্থ্য ও প্রয়োজনমত আরামের প্রতি অমনোযোগী হলেও চলবে না। স্নেহ-দয়া-মায়ায় সে হবে, ফুলের মত কোমল' আবার কর্তব্যে সে হবে 'বজ্রের মত কঠোর'। সে হবে প্রিয়দর্শিনী—অর্থাৎ সর্বদাই দামী সাজসজ্জায় না হলেও পরিষ্কার ও ফিটফাট থাকবে, ধীরে ধীরে এবং অল্প কথা বলবে, উত্তেজনার কারণ থাকলেও কখনো বদমেজাজী হবে না, এবং সর্বদাই তার মুখে লেগে থাকবে মিষ্টি মধুর হাসি। সে যা করবে ভেবে-চিন্তেই করবে, এবং মনে মনে যা চিন্তা করবে, কখনই তা বাক্যচ্ছটায় প্রকাশ না করে, যতদূর সম্ভব তাকে কার্যে পরিণত করবার চেষ্টা করবে। বিপদের মুখেও সে হবে ধরিত্রীর মত সহিষ্ণু, রন্ধনে দ্রৌপদী, অন্নদানে অন্নপূর্ণা, রোগশয্যায় জননী এবং সকলের উপরে অপূর্ব মহিমায় স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিতা গৃহলক্ষ্মী। নারীহৃদয়ের যা কিছু সদ্‌গুণ, দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালবাসা, সেবা, বুদ্ধি, দূরদর্শিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সৌন্দর্যজ্ঞান, একাধারে যার মধ্যে আছে, কেবল সেই আদর্শ বা সুগৃহিণী নামের যোগ্যা।

চাকর-বাকরের প্রতি কর্তব্য

বাড়ীর চাকর-বাকর-ঝিদের চালানো অতি দুরূহ ব্যাপার। গৃহকর্ত্রীকেই এ সকল ঝামেলা পোয়াতে হয়। এ সকল মাইনে-করা লোক বেশী দিন এক বাড়ীতে থাকতে চায় না, কেননা মাইনে দেয় যে মনিব তার সঙ্গে তাদের দুদিনের সম্বন্ধ-মাত্র। মনিব যেমন মাইনে দিয়ে লোক রাখে, তেমনি তার

বদলে চায় কাজ, আর চাকর-ঝি যখন মাইনে নিয়ে কাজ করে, তখন সে চায় যতটুকু সম্ভব কম কাজ করবে, খাওয়া-দাওয়া পাবে ভাল, পূজা-পার্বণে বকশিস পাবে প্রচুর, আবার মাইনেটাও হবে বড় রকমের। চাকর-ঝিরা কাজে বহাল হয়েই কয়েক দিন কাটায় বাড়ীর আবহাওয়া ও চাল-চলন দেখতে। বাড়ীর কর্তার চেয়ে গিন্নী-মার দিকেই তাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকে বেশী! গিন্নী-মা যদি কড়া হন, চারদিকে যদি তাঁর কড়া নজর থাকে, তাহলে প্রথম হতেই তারা অস্বস্তি ভোগ করতে থাকে. কেননা কাজে ফাঁকি দেওয়া কিংবা উপরি-পাওনার আশা কম! তার পর যদি চাকর-বাকরদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক মত না থাকে, তাহলে সে কয়েকদিনের মধ্যেই সরে পড়ে নতুন চাকরির সন্ধান করে। আবার প্রথমে কয়েকদিন বা কয়েক মাস টিকে গেলেও যখন কাজ-কর্ম শিখে যায়, তখন বেশী মাইনের লোভে পুরানো মনিবকে ছেড়ে যেতে তার কোন আপত্তিই থাকে না। আবার সময়ে সময়ে কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্য, বকুনি খেয়ে কিংবা অকারণে অন্যান্য ঝি-চাকরের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি করেও কোন কোন চাকর-বাকরকে বিদেয় নিতে দেখা যায়। তারপর নতুন চাকরকে নিয়ে বাড়ীর গিন্নীর সে কি বিড়ম্বনা! একেত সর্বদা সন্ত্রস্ত ভাব, চোর, ছ্যাচড়, ডাকাত কিনা, কে জানে? হয়ত দেখা গেল, কাজকর্ম কিছুই জানে না, ন্যাতা ধরতে ঝাঁটা ধরে, ঝাঁটা ধরতে ন্যাতা ধরে; রাঁধুনী হলে হাতা ধরতে খুন্তি ধরে, কিংবা খুন্তি ধরতে বললে হাতা ধরে; এরকম অনেক শেখানো-পড়ানোর ঝামেলা গৃহকর্ত্রীকে সহ্য করতে হয়। তারপর যখন একটু শিখে নিয়ে আপনার হাতে কাজকর্ম করার উপযুক্ত হয়, তখন হয়ত পাশের বাড়ীর ঝি বা চাকর তাকে বেশী মাইনের লোভ দেখিয়ে ভাংচি দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়, আগের সংসারকে অকুল সমুদ্রে ফেলে। সুতরাং পুরানো ঝি-চাকর যাতে টিকে থাকে, যাতে তারা ফাঁকি না দিয়ে খুসী হয়ে কাজ করে এবং বহুদিন ধরে সে সংসারে থাকে তার প্রতি কতকটা দরদী হয়, তার জন্য বাড়ীর গৃহিণীর মনোযোগী না হলে চলে না।

বাড়ীর ঝি-চাকরের প্রতি গৃহিণীর কর্তব্যও সুষ্ঠু গৃহকর্ম-পরিচালনার একটি প্রধান অঙ্গ। আমাদের শরীরে মস্তিষ্ক যেমন নির্দেশ দেয়, হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক সেভাবেই তার আদেশ পালন করে যায়। এই ভাবেই গৃহকর্ত্রী যা ভাবেন বা পরিকল্পনা করেন, তাঁর আদেশে তাকে কাজে পরিণত করে ঝি-চাকর। সুতরাং শুধু চিন্তা করে পরিকল্পনা ঠিক করলেই চলবে না, যাতে চাকর-বাকর যথাযথ নির্দেশ পালন ক'রে কাজটি সুসম্পন্ন করে

তাই দেখতে হবে। সুতরাং সে আদেশ বা নির্দেশ-পালনে যাতে তাদের আগ্রহ থাকে, সেজন্য সব সময়েই চেষ্টা করতে হবে। এজন্য পুরোপুরি কাজ পেতে হলে বাড়ীর গিন্নীকে কতকটা কৌশলের আশ্রয় নিলেই ভাল হয়। সব সময়েই কড়া হুকুম না করে, "বাবারে, বাছারে" বলে মিষ্টি মুখে আদেশ করলে অনেক সময়ে তারা খুসীমনেই তা পালন করে। তারা যে বাড়ীর মাইনে-করা চাকর-মাত্র নয়, পরিবারের আর সকলের মতই, এ ধারণা যদি তাদের মনে জন্মানো যায়, তাহলে তাদের মনের হীনমন্যতাও অনেকটা লোপ পায়। এজন্য বাড়ীতে চাকর-ঝির জন্য খাওয়ার আলাদা ব্যবস্থা না করে আর পাঁচজনের মত একই ব্যবস্থা রাখা উচিত। কথায় আছে, পেটে খেলে পিঠে সয়! পেটের জন্যই যে অপরের ঘরে খাটতে এসেছে, সে যদি ভাল খাবার-দাবার পায় তাহলে কায়িক পরিশ্রম ও অন্যান্য অসুবিধে-সত্ত্বেও সহজে সে সেবাড়া ছেড়ে যেতে চায় না। পূজা-পার্বণ, উৎসবাদিতে যদি তাদের পুরস্কৃত করা হয়, তাহলেও খুসী মনে তারা কাজকর্ম করে যায়। রাঁধুনীকে যদি সারাদিন 'রাবণের চিতে' আগলে বসে থাকতে হয়, কিংবা ঝি-চাকরকে যদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টা অনবরত ফাইফরমাস খাটতে হয়, তাহলে চলবে না। প্রত্যেক গৃহিণীকেই মনে রাখতে হবে যে চাকর-বাকরও রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ, কলের যন্ত্র নয় যে চালালেই অনবরত চলতে থাকবে। সুতরাং নিয়ম করে কাজকর্ম চুকিয়ে দেওয়ার পর দিনে যাতে অন্তত দুঘণ্টা, এবং রাত্রিতে অন্তত ছ'ঘণ্টা তারা বিশ্রাম করতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। চাকর-বাকরের জন্য বাড়ীতে আলাদা একখানি ঘর থাকলেই ভাল হয়, যেখানে তারা ইচ্ছেমত গল্পগুজব করতে পারে কিংবা বিশ্রাম করতে পারে। প্রত্যেক চাকর-বাকরের জন্য কাজ নির্দিষ্ট থাকলে ভাল হয়, তা না হলে ঘর মুছতে মুছতে বাজার যেতে কিংবা মসলা বাটতে হলে, কিংবা কাপড় কাচতে কাচতে খাবার ঠাঁই করতে হলে, কিংবা কয়লা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বাজারে মিষ্টি আনতে ছুটতে হলে, কেউ খুসী মনে তা করতে পারে না। তাছাড়া তাদের নিদিষ্ট বিশ্রামের সময়েও অকারণে তাদের ডাকাডাকি করা উচিত নয়। আবার একজন চাকরকে যদি বাড়ীর পাঁচ জনের পাঁচ রকমের হুকুম একই সময়ে তামিল করতে হয়, তা হলেও তার মন খিঁচড়ে যায়। চাকর-বাকরের অসুখ-বিসুখ হলে তাদের বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে তাদের জন্য ওষুধ ও উপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা করা দরকার। ঐ সময়ে গৃহকর্ত্রী যদি নিজে তাদের খোঁজ-খবর

করেন ও তাদের প্রতি উপযুক্ত দরদ দেখান, তাহলে তারা চিরদিন সে কথা মনে রাখে এবং মায়ের মতই তাঁকে ভক্তি করতে অভ্যস্ত হয়। ঝি-চাকরকে বছরে অন্তত দশদিন পুরো মাইনেয় বাড়ী যাবার জন্য ছুটি দেওয়া উচিত। ঐ সময়ে তাদের ছেলেপুলের জন্য কিছু খাবার বা অন্যান্য জিনিসপত্র দিলে ভাল হয়, কারণ তাতে তাদের মন কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয় এবং তারা আগ্রহ-ভরে আবার পুরানো মনিবের আশ্রয়ে ফিরে আসে।

পরিবারের অন্যান্য লোকজনের প্রতি কর্তব্য

স্বামী, ছেলে-মেয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ী, দেওর-ননদ, এদের সকলকে নিয়েই সংসার। এরকম একান্নবর্তী পরিবারের সংখ্যা আজকাল ক্রমশই কমে আসছে, কেননা পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলে আজকাল ছেলেরা যেমন উপার্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করে না, মেয়েরাও তেমনি লেখাপড়া শিখে বেশী বয়সে বিয়ে করে স্বামীর ঘর করতে আসে। এজন্যই তারা দুজনেই চায় স্বতন্ত্র সংসার পাততে, কেননা সেখানে পাঁচজনের ঝামেলা পোয়াতে হবে না। কিন্তু আগে যখন বাপ-মাই ছিলেন ছেলেমেয়ের বিয়ের কর্তা, তখনকার কথা ছিল স্বতন্ত্র। ছেলে হয়ত কলেজে পড়ছে, সখ করে বাপ-মা একটি টুকটুকে রাঙা বউ দেখে-শুনে নিয়ে এলেন! ছেলের ক্ষমতা নেই, সুতরাং সকল বিষয়েই বাপ-মায়ের মুখাপেক্ষী। আর কনে হয়ে এসেছে যে কচি মেয়েটি, কাঁচা নরম মাটির মতই তার মন, কয়েক দিনের মধ্যেই অবলীলাক্রমে তার মনে ছাপ পড়লো শ্বশুর-বাড়ীর সব কিছুর, মুছে গেল মন হতে বাপের বাড়ীর কয়েক বছরের স্মৃতি! শ্বশুর-বাড়ীতে শ্বশুর-শাশুড়ীই অধিকার করলেন তার বাপ-মায়ের স্থান, দেওর-ননদ এসে বসল ভাই-বোনের জায়গায়—আর নতুন বাড়ীটিই হল তার একান্ত নিজস্ব ঘর। তারপর ধীরে ধীরে যখন তার কোলে এসে দেখা দিল ছোট্ট দু-একটি স্বর্গীয় সুষমামাখা কচি শিশু, তখন সে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরেছে সে-পরিবারকে, লতা যেমন বড় গাছকে জড়িয়ে ধরে ফল-ফুলে পূর্ণ-বিকশিতা হয়, ঠিক তেমনি! এরই নাম একান্নবর্তী পরিবার বা প্রাচীন ভারতীয় পরিবারের আদর্শ। সুতরাং এ রকম পরিবারে গৃহিণী যে হয়, তার কর্তব্যের ক্ষেত্রও হয় প্রশস্ত। শৈশবে ও কৈশোরে বাপ-মায়ের প্রতি যে কর্তব্য, অর্থাৎ তাঁদের সেবাযত্ন, তাঁদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা; আর তারই সঙ্গে খানিকটা নিজের সন্তানের প্রতি কর্তব্যকে মিশিয়েই বৃদ্ধ শ্বশুর ও বৃদ্ধা

শাশুড়ীকে সেবা-শুশ্রূষা করতে হয়। বৃদ্ধ বয়স অনেকটা ফিরে-আসা শৈশবেরই মত, সুতরাং শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে তাঁদের আদর-আব্দার, এমনকি খামখেয়ালিকেও সাধ্যমত কতকটা মেনে নিতে হবে বৈকি?

তারপর বাড়ীর কর্তা যিনি, অর্থাৎ স্বামীর প্রতি কর্তব্য তো আছেই! তাঁকে শুধু সেবা-যত্ন করলেই কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না, সকল কাজে তাঁর সহায় হতে হবে, দরকারমত তাঁকে সুপরামর্শ দিতে হবে, শ্রান্ত ও ক্লান্ত হলে পরিচর্যার দ্বারা সে শ্রান্তি ক্লান্তি দূর করতে হবে, বিমর্ষ হলে তাঁর মনে আনন্দ যোগাতে হবে, আর বিপদে বা দুঃখ-কষ্টে মুষড়ে পড়লে যাতে তাঁর বুকে বল ও মনে সাহস আসে তারই চেষ্টা করতে হবে। স্বামীর ধর্মপত্নী হওয়ার অর্থ এই নয় যে, একসঙ্গে বসে হরিনামের মালা জপতে হবে কিংবা গঙ্গা-স্নান করতে হবে; তার প্রকৃত অর্থ এই যে কী মানব-ধর্মে, কী কর্তব্যকর্মে, কী জ্ঞানার্জনে, সকল সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করতে হবে, কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের পথে এগিয়ে যেতে! স্বামী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যেটুকু রোজগার করবে, তা দিয়েই তাকে পরিচালনা করতে হবে সংসার, যাতে বোঝার উপর শাকের আঁটির মত রুজি-রোজগারের ও বাইরের নানা ঝামেলার উপর সংসারের খুঁটিনাটির দৌরাত্ম্যেও তাকে বিব্রত হতে না হয়। একমাসের আয়, এক সপ্তাহে উড়িয়ে দিয়ে, আরো টাকার জন্য তাঁকে তাগাদা করলে লাভ তো কিছুই হবে না, বরং তাতে তাঁর মন ও স্বাস্থ্য দুইই ভেঙে পড়তে পারে। এক কথায় সুগৃহিণীকে যতদূর সম্ভব, বাড়ীর কর্তাকে রেহাই দিতে হবে সংসারের অসংখ্য দৈনন্দিন খুঁটিনাটির অত্যাচার হতে।

ভাসুর-দেওর, ননদ প্রভৃতিরও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই! শ্বশুর-শাশুড়ীর পরেই ভাসুর ও বড়জার স্থান। সুতরাং সেভাবেই তাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে তাদেরও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ছোট ছোট দেওর, জা বা ননদের প্রতি ঠিক নিজের ভাই-বোনের মতই ব্যবহার করতে হবে, কারণ তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি হবে না। নিজের ভাল ব্যবহারে এদের আপনার করে নিতে পারলে বাপের বাড়ীতে ছেড়ে আসা ছোট ছোট ভাই-বোনদের অভাব এদের দ্বারাই মিটে যাবে। বিপদে-সম্পদে, অসুখে-বিসুখে এবং উৎসবে-ব্যসনে এ সকল আপনার জনই কাছে এসে দাঁড়াবে সহায় ও অবলম্বনরূপে। পতিগৃহে যাত্রার পূর্ব-মুহূর্তে মহর্ষি কণ্বও শকুন্তলাকে এমনি সদুপদেশ দিয়েছিলেন, যাতে সে পতিগৃহের পরিবেশের

মধ্যেই শ্বশুর-শাশুড়ীর মধ্যে তার বাপ-মার এবং দেওর-ননদের মধ্যে নিজের ভাই-বোনদের স্নেহ ও ভালবাসা পেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে যে বাপের বাড়ীতে, তার প্রতি দরদ এবং টান সব সময়েই মনে থাকা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু তা' বলে সব সময়েই তা মনে করে ক্ষোভ করা কিংবা কথায় কথায় "আমার বাপের বাড়ী এরকম, আমার বাপের বাড়ীতে ওরকম" ইত্যাদি ব'লেও স্বামী বা পরিবারের অন্য কারো মনে খোঁচা দেওয়া উচিত নয়, তাতে সংসারের সুখ-শান্তি নষ্ট হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। বাপের বাড়ী বা স্বচ্ছল আত্মীয় স্বজন কিংবা প্রতিবেশীর বাড়ীর সঙ্গে তুলনায় নিজের সংসারের অভাব অনটনকে, তিলকে তাল করে দেখলে শুধু-শুধু নিজের মনেই ক্ষোভ ও অশান্তি জমাট হতে থাকে, তার চেয়ে বরং নীচের দিকে তাকিয়ে ভগবান যা দিয়েছেন, অনেকের চেয়েও ত তাই ভাল, এর চেয়েও খারাপ হতে পারতো এবং ভগবানের দয়াতেই তা হয় নি বলে তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা জানালে, মনে অখণ্ড শান্তি আসবে এবং দুঃখ কষ্টেরও অনেকটা লাঘব হয়ে যাবে।

পুত্র-কন্যার প্রতি কর্তব্য গৃহিণীর একটি মুখ্য দায়িত্ব। ছেলে-পুলেকে মানুষ করা, রোগে তাদের সেবা-শুশ্রূষা করা এবং ছোটবেলায় তাদের পড়াশুনার ভারও নিতে হবে জননীকে। প্রায় বছর দশ বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়ের শৈশব কাটে জননীর নিকট-সান্নিধ্যে, সেজন্য জননীর চরিত্রের প্রভাব পড়ে সকলের চেয়ে বেশী ছেলেমেয়ের চরিত্রের উপর। সেজন্য ঐ সময়ে তাদের লেখাপড়া ও চরিত্র-গঠনের ভারও নিতে হবে গৃহকর্ত্রীকে। পৃথিবীখ্যাত জ্ঞানী ও গুণী যাঁরা, তাঁদের জীবনী-আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, তাঁদের অনেকেরই চরিত্র, মহত্ত্ব ও মনীষার ভিত্তিস্থাপন হয়েছিল শৈশবে, নিজ নিজ জননীর প্রভাবে। সেজন্য ছেলেমেয়েদের মানুষ করার ভার কখনই চাকর-ঝি বা আয়ার উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। জন্মের পর হতে প্রায় দশ মাস পর্যন্ত মায়ের দুধের মত শিশুর উপযুক্ত খাদ্য যেমন আর নেই, ঠিক তেমনি, বাল্যকালে মা নিজের হাতে ছেলেকে মানুষ করার ভার নিলে যেমনটি হয়, ঠিক তেমনটি আর কিছুতেই হতে পারে না।

অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি কর্তব্য

তার পরে আসে আত্মীয়-কুটুম্ব, অতিথি-অভ্যাগত ও আশ্রিতদের প্রতি কর্তব্য। আমাদের দেশে যে কোন সংসারে 'এস জন, বস জন' ত প্রায়ই

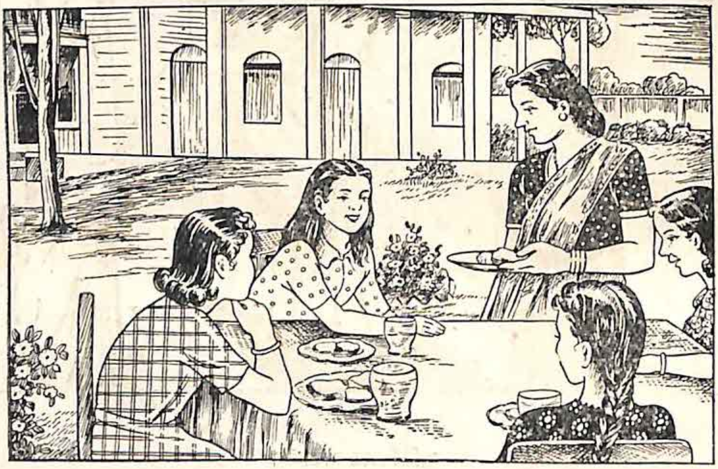
লেগে থাকে। বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজন দেখা করতে এলে, হাসিমুখে তাদের অভ্যর্থনা করে, খানিকক্ষণ তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে মিষ্টিমুখ করিয়ে বা চা-টা খাইয়ে বিদেয় করলেই সাময়িক কর্তব্য শেষ হয়ে যায়। কিন্তু অনেক সময়েই আত্মীয়-কুটুম্ব বাড়ীতে এসে কয়েকদিনের জন্য আতিথ্যগ্রহণ করেন। এ যেন ঠিক "গোদের উপর বিষফোঁড়া"! কারণ তখন সংসারের অসংখ্য কাজের উপর তাদের দেখাশোনা, খাওয়ানো এবং-আদর আপ্যায়নের বোঝাও গৃহিণীর ঘাড়ে



অতিথিদের অভ্যর্থনা

এসে পড়ে। দুদিনের জন্য যাঁরা বাড়ীতে এসেছেন, সাধ্যমত যা'তে তাদের সেবা, যত্ন ও আরাম-বিধানের কোন ত্রুটি না হয়, তাই খুসীমনে করে যেতে হবে। কিন্তু অতিথি-অভ্যাগতেরও দাবী খুব বেশী থাকা উচিত নয় এবং এরকম আগমনে যে কোন সংসারের, বিশেষতঃ গৃহিণীর উপর যে কতকটা অতিরিক্ত চাপ পড়ে, সে সম্বন্ধে অবহিত থাকা উচিত। সুতরাং কোন অবস্থাতেই অযথা কিংবা অকারণে পরগৃহে বাস বিলম্বিত বা দীর্ঘস্থায়ী করে তোলা উচিত নয়। তাছাড়া প্রত্যেক পরিবারেই নিরাশ্রয় বিধবা বা অনাথ বালক-বালিকা দু'একটি আশ্রিতরূপে বাস করে। যেহেতু তারা একান্তই নিরাশ্রয়, এ কারণেই তাদের প্রতিও গৃহিণীর কতকটা সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

পরিবারের অন্য লোকের চেয়ে তাদের জন্য যদি হীনতর কোন ব্যবস্থা হয়, তাহলে তাদের মনে আঘাত লাগে। অনেক সময়ে ঝি-চাকর পর্যন্ত, পরিবারের গলগ্রহ বলে মনে ক'রে এদের প্রতি অসৌজন্য দেখায় বা রূঢ়তা প্রকাশ করে। এ সকল বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করার একমাত্র উপায় গৃহিণীর সতর্ক দৃষ্টি ও মমত্ববোধ। নিজের বাচ্চা-কাচ্চাকে কুকুর-বেরালও ভালবাসে এবং যত্ন-আত্তি করে; সুতরাং গৃহকর্ত্রী যখন নিজের ছেলেমেয়ে বা দেওর-ননদকে ভালবাসেন বা যত্ন করেন, তখন তিনি তাঁর স্বাভাবিক পারিবারিক কর্তব্য মাত্রই করেন। কিন্তু তিনি যদি পরিবারের আশ্রিত যারা তাদের প্রতিও মমতা দেখান, তাহলে তা হবে মানবিক কর্তব্য এবং তাতেই তাঁর মহত্ত্বের প্রকাশ হবে।

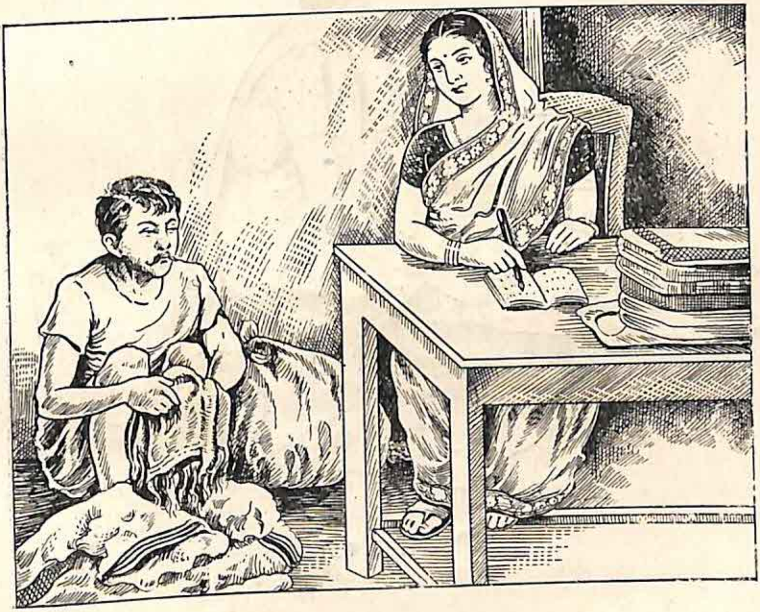


খাবার দিয়ে আপ্যায়ন

অনেকে বাড়ীতে আবার দুধের জন্য গরু পোষেন। বেশী দুধ পেতে হলে গরুরও সেবাযত্ন ও তার খাওয়া দাওয়ার তদারক আবশ্যক। আবার অনেকে সখ করে কুকুর-বেরাল, খরগোশ, গিনিপিগ, এবং টিয়া, তোতা, ময়না প্রভৃতি পাখীও পোষেন। মনে রাখা উচিত যে জীবমাত্রেরই সুখ-দুঃখ বোধ আছে, সেজন্য অন্য কারণে নাহলে অন্ততঃ মানবতার জন্যও, যাতে তাদের প্রতি পরিবারের আশ্রিতের মতই ব্যবহার করা হয়, গৃহকর্ত্রীর সেদিকেও নজর রাখা কর্তব্য। গৃহিণী যখন অন্নপূর্ণা, তখন মানুষ ও পশুপাখীর মধ্যেও তাঁর বৈষম্য-জ্ঞান থাকবে না,—আর যিনি তা পারেন, তাঁরই হবে সুখের সংসার।

কাপড়-কাচা ইস্ত্রি করা প্রভৃতি

আগেই বলা হয়েছে গৃহ এবং কাপড়-চোপড়কে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাও গৃহকার্য-পরিচালনার একটি প্রধান অংশ। প্রত্যেক বাড়ীর জন্যই সাধারণতঃ একজন ধোবা নিযুক্ত থাকে। হয়ত সে সপ্তাহে একটি দিনে কাচা কাপড় নিয়ে আসে। তখন গৃহিণীকে খাতা দেখে সব ক'খানি কাপড় ধোবা ফিরিয়ে এনেছে কি না হিসেব করে নিতে হয়। কিছু বাকী থাকলে খাতায় তা লিখে রেখে ধোবাকে বলতে হয় ক'খানি এবং কী কী কাপড় আসে নি,



ধোবাকে কাপড় দেওয়া হচ্ছে

যাতে সে সেগুলি খুঁজে বের করে পরে ফেরত দিয়ে যেতে পারে। তারপর পরিবারের সকলের ময়লা কাপড়কে জড় করে, ধোবার হিসেবের খাতায় প্রত্যেকের ক'খানি এবং কী কী কাপড় ধোবার বাড়ীতে গেল, তা লিখে, মোট ক'খানি গেল তা ধোবাকে বুঝিয়ে দিতে হয়। ধোবা ভাল করে কাপড় কেচেছে কি না, ভাল ইস্তিরি করেছে কিনা, পাটে আছড়ে কিংবা খোঁচা লাগিয়ে কোন কাপড় ছিঁড়েছে কি না, কতগুলি বোতাম ভেঙ্গেছে ইত্যাদিও দেখে নেওয়া

উচিত এবং ধোবার দোষে বা অসতর্কতার জন্য যদি কোন ক্ষতি হয়ে থাকে, তাহলে তখনই তাকে তা দেখিয়ে দেওয়া উচিত, তা না হলে পরে যদি তা নজরে পড়ে, তাহলে ধোবা কিছুতেই স্বীকার করতে চাইবে না যে তার দোষেই তা হয়েছে। সুতরাং এদিকেও গৃহিণীকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

ধোবার ব্যবস্থা-সত্ত্বেও এমন কতকগুলি কাপড়-চোপড় আছে যা অতি সহজে দু-একদিনেই ময়লা হয়ে যায়,—যেমন গেঞ্জি, পা-জামা, বালিশের ওয়াড়,



বাড়ীতে কাপড় কাচা

তোয়ালে, গামছা, রুমাল, সেমিজ, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জামা-কাপড় প্রভৃতি। ধোবার বাড়ীতে পাঠাতে হলে ওগুলিকে ময়লা অবস্থায় বহুদিন জড় করে রাখতে হয়; আর তা ছাড়া নিত্য বদলাতে হলে এত অধিক সংখ্যায় সেগুলি রাখতে হবে যে, অনেকের পক্ষেই তা সম্ভব হয় না। সুতরাং ধোবার ব্যবস্থা থাকুক আর নাই থাকুক, প্রত্যেক বাড়ীতেই কাচা-কাচির কিছু না কিছু ব্যবস্থা রাখতেই হয়। আর স্বল্পবিত্ত, এমন কি নিম্ন-মধ্যবিত্ত যারা, তাদের পক্ষে ধোবার খরচ-যোগান একরকম অসম্ভব বললেও হয়। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এবং ভদ্রতা-রক্ষার জন্যও বাড়ীতেই কাপড় কেচে ইস্ত্রি করে নেওয়া

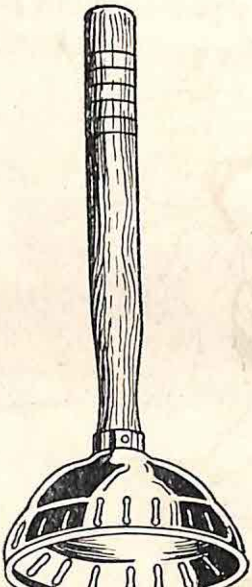
উচিত। তাতে শুধু খরচই যে কম হয় তা নয়, কাপড়-চোপড় টিকেও বেশী, আর কম কাপড়-চোপড়েও ভদ্রতা বজায় রাখা চলে। সুতরাং তার জন্য অবস্থা-অনুযায়ী বাড়ীতে কিছু সাজ-সরঞ্জাম এবং সম্ভবপর হলে যন্ত্রপাতিও রাখা আবশ্যক। কাপড় কাচার জন্য সাবান ও সোডা অত্যাবশ্যক; যদিও ঐগুলি যখন-তখন প্রয়োজন মত বাজার থেকে কিনে আনা যায়, তাহলেও সর্বদাই কিছু না কিছু কাপড়-কাচা সাবান ও সোডা বাড়ীতে রাখলে ভাল হয়। সাবানে কাচা কাপড়ের লালচে ভাব দূর করবার জন্য কিছু নীলও রাখা আবশ্যক। তা ছাড়া কয়েকটি বড় বড় মাটির কিংবা কম দামী ধাতুর গামলা আবশ্যক। একটি বেশী ময়লা কাপড়কে সোডা ও সাবানের জলে সিদ্ধ করার জন্য, দ্বিতীয়টি কাচার



ইস্ত্রি করা

পরে জলে ডুবিয়ে নিংড়ানোর জন্য এবং তৃতীয়টি ফিকে নীল জলে ডুবিয়ে কাচা কাপড়ের লালচে ভাব দূর করার জন্য। কাপড়কে থুপিয়ে থুপিয়ে কিংবা অল্প আছড়ে কাচার জন্য এক টুকরো ২ × ২ বর্গফুট আকারের পাথর কিংবা পালিশ করা বা ঢেউ খেলানো শক্ত কাঠ দরকার এবং পালিশ করা মুগুরের মত মোটা একটা লাঠি বা দাঁড়া থাকলে আরো ভাল হয়। কাপড়কে হাতে থুপিয়ে কিংবা আছড়ে কাচা যেমন আয়াস-সাধ্য, আবার তেমনি বেশী আছড়ালে বা দাঁড়া দিয়ে পিটতে থাকলেও কাপড় নষ্ট হয়ে যায় শীগ্‌গির। এজন্য বিলাতে ও

অন্যান্য দেশে কাপড় কাচার জন্য এক রকম বায়ু-শূন্য যন্ত্র (vacuum cone) ব্যবহৃত হয়। এ যন্ত্রটি দেখতে অনেকটা উপুড় করা গামলার মত, এবং তার মধ্যে এমন কতকগুলি গোঁজ থাকে, যা একেবারে বায়ু-শূন্য অবস্থায় কাপড়কে কুঁচকে টেনে ধরে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাবানের জলও কাপড়ের প্রতিটি ছিদ্রে প্রবেশ করে; পরে কাপড় আবার আপনি যখন যন্ত্রের আঁকড়ে ধরা অবস্থা হতে খসে পড়ে, তখন সঙ্গে সঙ্গে সাবানের জলও বেরিয়ে আসে। গামলার মত উপুড় করা অংশটির উপরে যে ফাঁপা হাতলটি থাকে, তারই মধ্যে ঝরণা কলমে কালি ভরে নেওয়ার মত বায়ুশূন্যীকরণ প্রক্রিয়া-সম্পন্ন একটা ব্যবস্থা থাকে। আবার ঐ হাতলের দ্বারাই অনায়াসে, অতি সামান্য থুপিয়েই কাচা সম্ভব হয়। সম্ভব হলে, এরকম একটা কাপড়-কাচা-যন্ত্র বাড়ীতে থাকলে, আবশ্যকমত অল্প সময়ে ও স্বল্পায়াসে কাপড় কাচা চলতে পারে। এভাবে কলের সাহায্যে কাপড় কাচার জন্য আরও নানা-প্রকারের যন্ত্রও কিনতে পাওয়া যায়; কোন কোনটির সঙ্গে আবার নিংড়োবার যন্ত্রও থাকে।



কাপড়-কাচার বায়ু-শূন্য যন্ত্র

তারপর কাচা কাপড়কে শুকোবার জন্য দড়ি কিংবা খাটানো তার এমন হওয়া চাই যাতে কাপড় ছিঁড়ে না যায় কিংবা তাতে মরচের দাগও লাগতে না পারে। তারপর কাপড়কে তার সঙ্গে আটকে দেওয়ার জন্য কতকগুলি স্প্রীংলাগানো ক্লিপও আবশ্যক। ধোবারা যখন খোলা মাঠে ঘাসের উপর সাবান ও সোডার জলে অল্প-কাচা কাপড়কে রোদে শুকোতে দিয়ে তার উপর সাবান ও সোডার জল বার বার ছিটিয়ে দিতে থাকে, তখন ঘাসের সবুজ রঙ 'ক্লোরোফিল' নামক উপাদানের সাহায্যে ও রোদের প্রভাবে কাপড়ের ময়লা অতি সহজেই কেটে যায়; কিন্তু বাড়ীতে এ উপায়ে ময়লা দূর করা প্রায়ই সম্ভবপর নয়। সুতরাং যতদূর পারা যায় হাতে থুপিয়ে, আস্তে আস্তে আছড়ে কিংবা মুগুরের

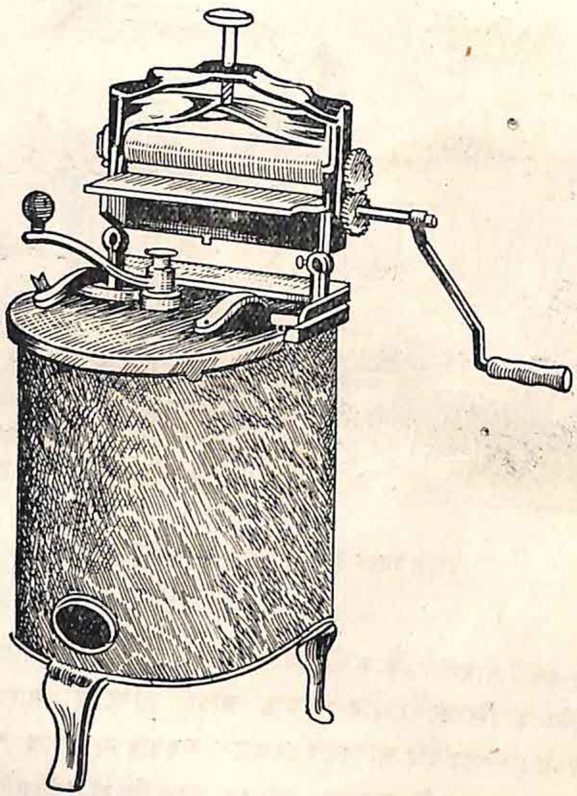
সাহায্যে সোডা ও সাবান জলে সিদ্ধ করা কিংবা গরম জলে ভিজানো কাপড়কে পিটতে পিটতে, কিংবা বাড়ীতে যদি কাচার কল থাকে তার সাহায্যে, যতদূর পরিষ্কার করা সম্ভব তাই করা উচিত। তারপর বড় গামলায় প্রচুর জলে বারবার ধুয়ে সাবান ও সোডার সবটুকু যখন একেবারে আর থাকবে না,



ধোবা ঘাসের উপর কাপড় শুকোতে দিয়েছে

তখন আর একটি গামলায় ফিকে নীলগোলা জলে একটি একটি করে কাপড়কে ভিজিয়ে নিংড়ে নিলেই, সাবান-সোডায় কাচা কাপড়ের লালচে রঙটুকু আর থাকে না। পরে যদি কাপড়কে নেতানো অবস্থায় না রেখে শক্ত করতে হয়, তাহলে আর একটি গামলায় ভাতের ফেন কিংবা খানিকটা ময়দা-সিদ্ধ করা জলে তাকে ভিজিয়ে নিংড়ে শুকোতে দিলেই তা হতে পারে। কাপড়কে ভাল করে নিংড়োবার জন্যও রোলার-লাগানো একপ্রকার যন্ত্র পাওয়া যায়। রোলারটি রবারে নির্মিত এবং তাতে ভিজে কাপড়টি যখন জড়িয়ে যায় তখন চাপ দিলেই সমস্ত জল বেরিয়ে আসে। কাপড়-কাচার যন্ত্রের সঙ্গে এই যন্ত্র ব্যবহারেও কাপড় কাচার পরিশ্রম অনেক কম হয়। সুতরাং সম্ভবপর হলে ঐরূপ একটি যন্ত্রও বাড়ীতে থাকলে ভাল হয়। তারপর নিংড়ানো কাপড় গুলোকে খাটানো দড়ির বা তারের উপর শুকোতে দিতে হয়। সার্ট,

পাঞ্জাবী, ব্লাউজ, পেটিকোট, গেঞ্জি, রুমাল, পাজামা, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতিকে ক্লিপ এঁটে তার বা দড়ির সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়াই ভাল। কিন্তু এরকম ভাবে কাপড় শুকোতে হলে রোদ থাকা চাই, কিন্তু তাই বলে খুব কড়া রোদে রঙীন বা সিল্কের কাপড়কে কখনই শুকোতে দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাতে রঙের এবং মিহি সুতোরও অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

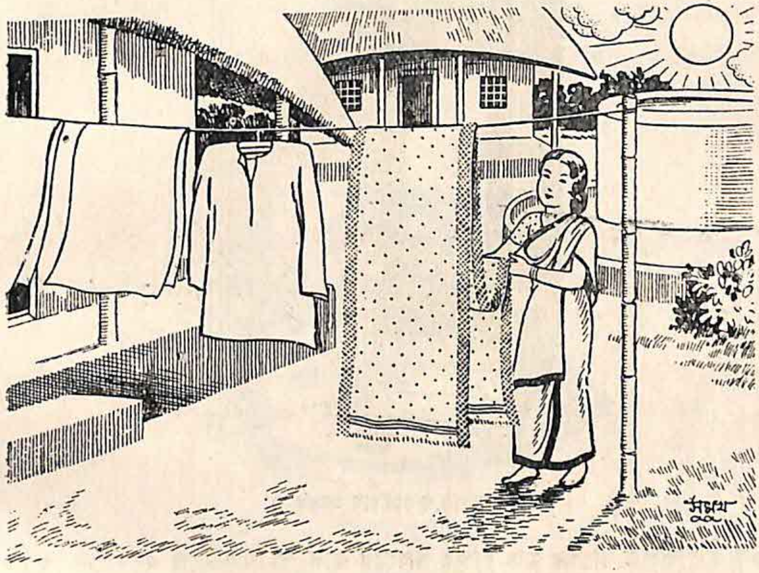


কাপড় ধুইবার ও নিংড়োবার যন্ত্র

সকাল বেলার উঠতি রোদে কিছুক্ষণের জন্য মিহি কাপড়কে শুকোতে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু দুপুর বেলা যেখানে প্রচুর হাওয়া ও সামান্য রোদের আঁচ আছে, কাপড়কে শুকোতে দেওয়ার পক্ষে সে স্থানই প্রশস্ত।

বর্ষা-বাদলের দিনে, কিংবা যে কোন দিনই কাপড়ের রঙ বা তার বুনোনির কোন ক্ষতি না করে কাচা কাপড়কে ভাল করে শুকোবার জন্য

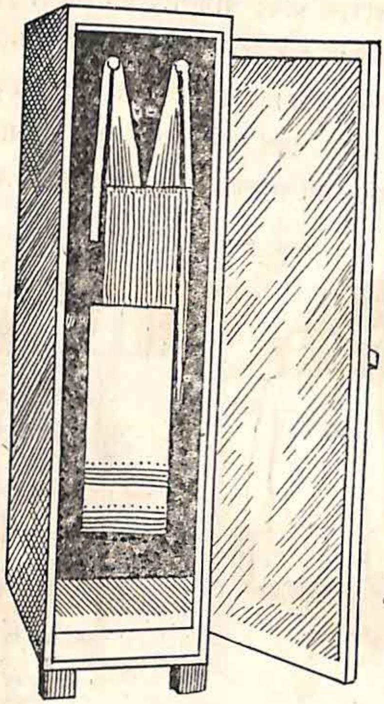
এক রকম আলমারি পাওয়া যায় যাকে বিদ্যুতের সাহায্যে গরম করা হয়। তার মধ্যে কাচা কাপড়গুলিকে ভাল ভাবে পাট করে কিংবা খুলে রেখে, আলমারির সংলগ্ন তারকে ঘরের প্লাগ-পয়েণ্টের সঙ্গে যোগ করে দিলেই, ভিতরটি উপযুক্তভাবে গরম হয়ে উঠে এবং এই ভাবেই যখন-তখন আবশ্যক মত কাপড়কে শুকিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু সকলের পক্ষে এরকম যন্ত্র ব্যবহার করা সম্ভবপর নয়, কারণ তার বেশ দাম আছে, এবং যে বাড়ীতে ইলেকট্রিকের বন্দোবস্ত নেই, সেখানে এরূপ আলমারিকে ব্যবহার করাও যায় না।



কাপড় শুকোতে দেওয়া

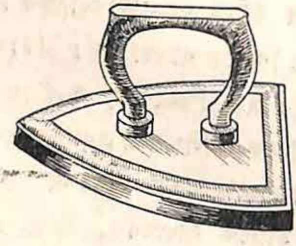
শুকনো কাপড়কে ভাল করে পাট করা ও তার কোঁচকানো অবস্থা দূর করার জন্য প্রত্যেক বাড়ীতেই একটি করে ইস্ত্রির যন্ত্র থাকা আবশ্যক। সস্তা ও দামী নানারকমের ইস্ত্রির যন্ত্র বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। (১) অতি সাধারণ ও সস্তা ইস্ত্রি-যন্ত্র অনেকটা নৌকোর মত তিনকোণ, ভারী ও মোটা লোহার দ্বারা নির্মিত। তার নীচের দিকে পালিশ করা এবং উপরের দিকে হাতল থাকে। হাতলটি কাঠের কিংবা সহজে তেতে উঠে না এমন কোন উপাদানের হলেই ভাল হয়। এরকম ইস্ত্রিকে সাধারণতঃ উনানের আঁচে কিংবা গরম তাওয়ার উপর বসিয়ে গরম ক'রে ভাল করে মুছে কাজ করা চলে। তবে অসুবিধে এই যে, বারবার একে গরম করে নিতে হয়, ফলে অনেকগুলি কাপড় এক সঙ্গে ইস্ত্রি করতে হলে অনেক সময় লাগে।

(২) আবার এক রকম পিতলের ইস্ত্রি আছে যা দেখতে অনেকটা বাক্সের মত, এবং নীচের দিক অনেকটা পালিশ করা ও চক্‌চকে। কাঠের বা ঐরকম কিছুতে

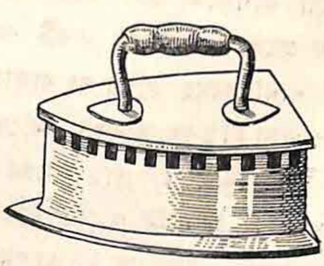


কাপড় শুকাইবার আলমারি

প্রস্তুত হাতলটি বাক্সের মত ইস্ত্রির উপরের ডালা বা ঢাকনিতে লাগানো থাকে, যাতে তা ইচ্ছেমত খোলা কিংবা বন্ধ করা যায়। চারদিকে হাওয়া যাতে



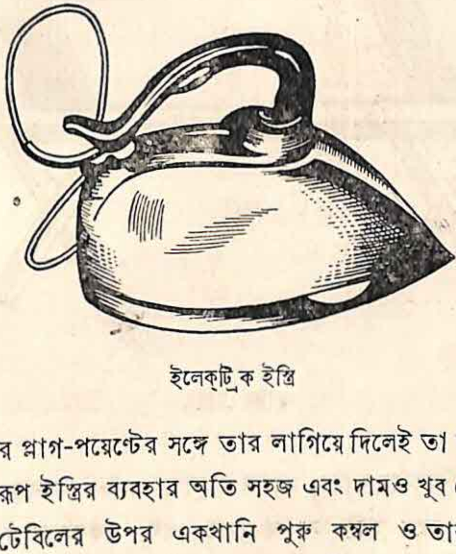
সাধারণ ইস্ত্রি



বাক্স-ইস্ত্রি

ঢুকতে পারে সেজন্য ফুটো থাকে, আর তার মধ্যে কাঠ-কয়লা জ্বালিয়ে কিছুক্ষণ হাওয়া করে ডালা বন্ধ করে দিলেই কাঠ-কয়লা আপনি জলতে থাকে

এবং ইস্ত্রিটি যখন উপযুক্তভাবে গরম হয়ে উঠে, তখন তা দিয়ে ইস্ত্রি করে নিতে হয়। এরূপ ইস্ত্রিকে বারবার গরম করার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু খুব বেশী গরম হয়ে গেলে কাপড় পুড়ে যেতে পারে, কিংবা হঠাৎ ফুটো দিয়ে আগুনের ফুলকি বেরিয়ে এসেও কাপড়কে পুড়িয়ে দিতে পারে, কিংবা এই ভাবে ছাই এসে পড়ে কাচা-কাপড়কেও নোংরা করে ফেলতে পারে। (৩) ইলেকট্রিক ইস্ত্রি দেখতে অনেকটা প্রথম শ্রেণীর ইস্ত্রিরই মত, এবং চকচকে ভারী ইস্পাতে তৈরী। তার পিছনের দিকে, হাতলের কাছেই একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিজলীর তার বসিয়ে ঘরের প্লাগ-পয়েন্টের সঙ্গে যোগ করে দিলে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই যখন ইস্ত্রিটি উপযুক্তভাবে গরম হয়ে উঠে, তখন প্লাগটি খুলে নিয়ে তা দিয়ে অতি সহজেই ইস্ত্রি করে নেওয়া যায়। ইস্ত্রি ঠাণ্ডা



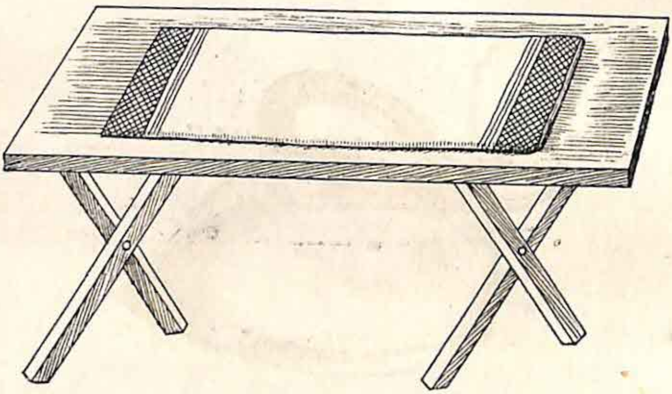
ইলেক্‌ট্রিক ইস্ত্রি

হয়ে গেলে আবার প্লাগ-পয়েন্টের সঙ্গে তার লাগিয়ে দিলেই তা অনায়াসে পুনরায় তেতে উঠে। এরূপ ইস্ত্রির ব্যবহার অতি সহজ এবং দামও খুব বেশী নয়।

যে কোন টেবিলের উপর একখানি পুরু কম্বল ও তার উপর একখানি চাদর বিছিয়ে যে কোন কাপড়কে ইস্ত্রি করা চলে। কিন্তু কেবল ইস্ত্রি করার জন্যই, কাজের শেষে ভাঁজ করে রাখা যায় এরকম প্রায় পাঁচফুট লম্বা ও দু'ফুট চওড়া ফেল্‌ট্-কাপড়ে ঢাকা একরকম টেবিল পাওয়া যায়। এরকম টেবিল বাড়ীতে থাকলে প্লাগ-পয়েন্টের কাছে কোথাও টেবিলটি পেতে, তার উপরে ইচ্ছেমত ডাইনে বা বাঁয়ে দাঁড়িয়ে যে কোন কাপড়কে ইস্ত্রি করা চলে, এবং পরে কাজ শেষ হয়ে গেলে তাকে ভাঁজ করে কোন অল্প পরিসর স্থানে তুলে রাখা যায়।

ভাল ইস্ত্রিকরা শিখতে হয়। তার কতকগুলি নিয়ম-কানুন আছে, যা কোন বিশেষজ্ঞ লোকের কাছে জেনে কিংবা তার কাজ দেখে শিখে নিতে

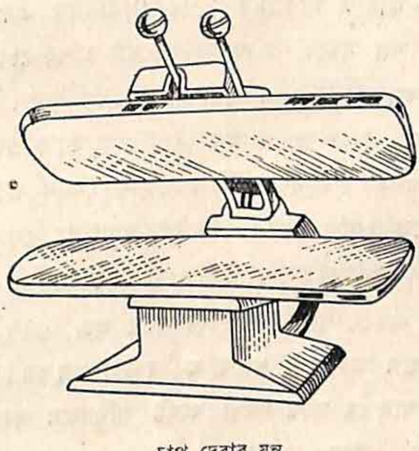
হয়। একটু ভিজে অবস্থায় ইস্ত্রি ভাল হয় বলে, মাঝে মাঝে জল কাপড়ের উপর ছিটিয়ে নিতে হয়। সিল্ক, পশম এবং সূতী কাপড়কে ইস্ত্রি করার আবার পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম আছে। শার্ট, ব্লাউজ প্রভৃতির গলা বা কলার প্রথমে ইস্ত্রি করতে হয়। ওগুলিকে শক্ত করে ইস্ত্রি করতে হলে এরোরুট, বা ইস্ত্রির জন্য যে বিশেষ শ্বেতসার (starch) কিনতে পাওয়া যায়, তাই জলে গুলে, কলার বা হাতাকে তাতে ভিজিয়ে নিয়ে ইস্ত্রি করে নিলে, তা যেমন শক্ত হয় আবার তেমনি কতকটা চক্‌চকও করতে থাকে। তারপর আগে সম্মুখের দিক ও হাত প্রভৃতি সেরে নিয়ে পাট করে করে, প্রতিটি পাটের উপর নিয়ম মত ইস্ত্রি চালিয়ে নিতে হয়।



ইস্ত্রির টেবিল

টেবিল ক্লথ, বিছানার চাদর, ঝাড়ন প্রভৃতি এমন অনেক কাপড় আছে, যাদের পরিপাটি করে ইস্ত্রি না করলেও চলে, কেবল ভাল করে ভাঁজ করে খানিকক্ষণ চেপে রাখলেই সেগুলিকে ব্যবহার করা যায়। এই কাজের জন্য একরূপ ভারী ধাতু-নির্মিত চাপ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এ যন্ত্রটির নীচের অংশ দেখতে অনেকটা নীচু ইস্ত্রি করার টেবিলের মত, এবং তার উপরে বেশ পুরু প্যাড-আঁটা। তারও উপরে একটি ভারী ডালা আছে এবং এ দুটি একটি বড় ও শক্ত কব্‌জির দ্বারা একটি অন্যের সঙ্গে যুক্ত, যাতে ইচ্ছেমত ডালাকে নীচের অংশ হতে তুলে নেওয়া যায়। বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ প্রভৃতি ভাল করে ভাঁজ করে নিয়ে, নীচের অংশের উপরে রেখে, তার উপর ভারী ডালাটি নামিয়ে তাকে শক্ত করে চেপে দিতে হয়, সে জন্য যে বিশেষ

ব্যবস্থা আছে তার সাহায্যে। এরকম অবস্থায় প্রায় আধঘণ্টা রেখে দিলেই নিত্য-ব্যবহার্য কাপড়-চোপড় অনেকটা ইস্ত্রির মতই পরিপাটিরূপে ভাঁজ করা হয়, এবং সে অবস্থায় তাদের ব্যবহার করা চলে। এরকম কোন কোন যন্ত্র তড়িতের সাহায্যে গরম করারও ব্যবস্থা আছে। উপরের ডালাটি কাপড়ের উপ:র চেপে দেওয়ার আগে, তাকে উপযুক্ত গরম করে নিলে, একই সঙ্গে চাপ দেওয়া ও ইস্ত্রি করার কাজও চলতে পারে। যদি নীচের টেবিলের মত অংশটিকে ইচ্ছেমত উঁচু-নীচু করার বন্দোবস্ত থাকে তাহলে ডালাখোলা অবস্থায় ঐ টেবিলকে ইস্ত্রি করার কাজেও লাগানো যেতে পারে। কিন্তু এরকম একটি চাপযন্ত্রের দাম বড় কম নয়, সেজন্য সাধারণের পক্ষে তা কিনে ব্যবহার করা প্রায়ই সম্ভব হয় না। তবে সকল সময়ে ব্যবহারের জন্য সস্তায়



চাপ দেবার যন্ত্র

নানা রকমের কাঠের চাপযন্ত্রও (mangler) পাওয়া যায়, কিংবা প্রয়োজন মত সেগুলি তৈরী করিয়েও নেওয়া যেতে পারে।

কাপড়-কাচা ও ইস্ত্রি করার যন্ত্রপাতি যাতে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। কাপড় সিদ্ধ করা বা ভিজানো বা নিংড়ানোর গামলাগুলি এমন কোন ধাতুর হওয়া উচিত নয় যাতে কাপড়ে দাগ পড়ে। ইস্ত্রি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি প্রায়ই লোহা বা ইস্পাতে নির্মিত হওয়ায় অতি সহজে সেগুলোর উপর মরচে পড়ে যেতে পারে। সেজন্য ব্যবহারের আগে ভাল করে দেখে নিয়ে তবে সেগুলো কাজে ব্যবহার করা

উচিত এবং ব্যবহারের পরও যাতে সেগুলো পরিষ্কার থাকে, এবং কোন অবস্থাতেই সেগুলোর গায়ে জল লেগে না থাকে, তা দেখা উচিত। আবার ব্যবহারের সময়ে উপযুক্ত ভাবে গরম হয়েছে কিনা, তা না দেখে ব্যবহার করলে, কম গরমের জন্য হয়ত ইস্ত্রি হবেই না, না হয়ত বেশী গরম হয়ে গেলে কাপড় পুড়েও যেতে পারে। আবার বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি বা ম্যাঙ্গ্‌লার, কাপড় কাচার কল, প্রভৃতি প্লাগ-পয়েণ্টে তারের সাহায্যে যুক্ত করার সময়ও যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, কেননা, এ. সি. (A. C.) অত্যন্ত বিপজ্জনক তড়িৎ, যথেষ্ট সতর্ক ভাবে কাজ না করলে তার সংস্পর্শে মারাত্মক বিপদের আশঙ্কা আছে। একই ভাবে ডি. সি. (D. C.) তড়িৎও অসতর্কতার জন্য অনেক সময়ে সজোরে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিতে পারে।

মৃদু ও খর জলঃ—যে জলে খনিজ ও ধাতুর ক্ষারজাতীয় পদার্থ কম থাকে, তাতে কাপড় কাচলে সাবানের যথেষ্ট ফেনা হয় এবং অতি সামান্য সাবানের ব্যবহারে অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমেই কাপড়-চোপড় খুব পরিষ্কার করে কাচা যায়, এরকম জলের নাম মৃদু বা কোমল জল। রান্নার পক্ষেও এরকম জলই প্রশস্ত, কারণ তাতে অল্প সময়ে ডাল, ভাত প্রভৃতি সুসিদ্ধ হয়। পানের পক্ষেও মৃদু জলই উপযুক্ত। কিন্তু কোন কোন জলে স্নান করতে কিংবা কাপড়-কাচতে গেলে যেমন মোটেই সাবানের ফেনা হতে চায় না, আবার তেমনি কোন বস্তুই তার দ্বারা সুসিদ্ধ হতে চায়না, এবং স্বাদও তার অস্বাভাবিক হয়। এজন্য পান ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এরূপ জল মোটেই উপযোগী নয়। এরূপ জলকেই খর বা কঠিন জল বলা হয়। এরকম জলকে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে তার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যাল্‌সিয়াম কিংবা ম্যাগ্‌নেশিয়াম-ঘটিত কোন না কোন লবণ আছে এবং বিভিন্ন লবণের উপস্থিতিতে এর খরত্ব অস্থায়ী কিংবা স্থায়ীও হতে পারে। সাধারণতঃ জলে যদি অধিক পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে তাহলে ক্যাল্‌সিয়াম কার্বোনেট বা চুনজাতীয় পদার্থের উপস্থিতিতে জলের যে খরত্ব ঘটে, তা অতি সহজেই কেবল কিছুক্ষণের জন্য জলকে ফুটিয়ে নিলেই দূর করা যায়। অনেক সময়ে যে কেটলি বা হাঁড়িতে সর্বদা জলকে গরম করা হয়, তার মধ্যে ধীরে ধীরে যে একটি সাদা আস্তর পড়তে দেখা যায়, তা ঐরূপ চুনজাতীয় পদার্থের থিতানোর ফলেই ঘটে। এরূপে যখন অস্থায়ী খরত্ব দূর হয়, তখন ঐ জলকে সকল গৃহকার্যে যেমন, রান্নাবান্না, পান করা, স্নান করা এবং কাচাকাচির জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। সেজন্যই কাপড়-কাচার সময়ে জলকে আগে ফুটিয়ে

নিলে যেমন তাতে সাবান খরচ হয় কম, আবার তেমনি সহজে অর্থাৎ অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমেও কাপড় ভাল ভাবেই পরিষ্কার হয়। কিন্তু স্থায়ী খরজলে ক্যাল্সিয়াম ও ম্যাগ্নেশিয়াম ধাতুর সাল্ফেট লবণ থাকাতে, সহজে অর্থাৎ তাকে ফুটিয়ে নিলেই সে খরত্ব দূর করা যায় না ব'লে, এবং তাকে দূর করতে হলে নানা আয়াস-সাধ্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয় ব'লে তার নাম স্থায়ী খরত্ব। সুতরাং এরকম জলে কাপড়কে কেচে পরিষ্কার করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র।

সিল্ক্ বা রেশম-জাতীয় কাপড়-চোপড় কাচা ও ইস্ত্রি করা :— একপ্রকারের বিশেষ গুটিপোকা নিজের থাকার জন্য যে বাসগৃহ বা গুটি রচনা করে, তারই বাইরের আবরণের নীচে থাকে, তারই শরীর হতে নিঃসৃত ক্ষরণ হতে প্রস্তুত অতি সূক্ষ্ম তন্তু। ঐ গুটিগুলিকে গরম জলে ফুটিয়ে নিলেই বেরিয়ে পড়ে যে উজ্জ্বল ও মসৃণ সূক্ষ্ম তন্তু, তা দিয়েই প্রস্তুত হয় আমাদের বিলাসিতার উপাদান, সিল্কের পোষাক-পরিচ্ছদ। এই তন্তুগুলি অতিরিক্ত উত্তাপে, ক্ষার-সহযোগে এবং আছড়ানো কিংবা জোরে নিংড়ানোর ফলেও অতি সহজেই নষ্ট হয়ে যায় বলে সূতী কাপড়ের মত সিল্কের কাপড় জামা কাচা চলে না, তার জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা আবশ্যক। একে তো সেগুলোর দাম বেশী, তার উপর তন্তুগুলির রঙ, উজ্জ্বলতা কিংবা মসৃণতা নষ্ট হয়ে গেলে সেগুলি একেবারে পরিধানের অযোগ্য হয়ে পড়ে। সিল্কের কাপড়-চোপড়ে ময়লা সাধারণতঃ কাপড়ের উপরে কতকটা আলগাভাবেই থাকে ব'লে, কুসুম-কুসুম গরম জলেই সেগুলো পরিষ্কার করা চলে, এবং সেগুলোকে সিদ্ধ করা বা বেশীক্ষণ সাবান জলে ভিজিয়ে রাখার প্রয়োজন হয় না।

সিল্কের কাপড়-কাচার জন্য খুব ভাল সাবান আবশ্যক অর্থাৎ যাতে ক্ষারের মাত্রা অত্যন্ত কম এবং অতি সহজেই যাকে জলে গুলা যায়। এ হিসেবে সানলাইট কিংবা লাক্স-ফ্লেক্স্ সাবানই প্রশস্ত। সাবান ঘসে লাগাবারও প্রয়োজন নেই। কুসুম-কুসুম জলে পরিমাণ-মত ফ্লেক্স্ কিংবা সাবান ভিজিয়ে নিয়ে, খানিকক্ষণ ধরে নাড়তে থাকলে যখন সবটুকু সাবান ফেনায়িত হয়ে উঠবে, তখন তাতে সিল্কের কাপড়কে ভাল ক'রে ডুবিয়ে মিনিট-দশ রেখে দিয়ে, তার পর উল্টে পাল্টে দিলেই দেখা যাবে যে সবটুকু ফেনা একেবারে নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে। তারপর ভাল জলে তাকে ভাল করে ধুয়ে লেগে-থাকা সাবানটুকুকে ছাড়িয়ে দিয়ে, হাতের উপর নিয়ে একটু চাপ দিলেই আপনি অনেকটা জল ঝরে পড়ে যাবে, কিংবা নিংড়োবার (ringer) যন্ত্র থাকলে

তার রবারের রোলারের সাহায্যেও জল নিংড়ে নেওয়া যেতে পারে। তাই ব'লে কখনই দুহাতে পাক দিয়ে জোরে নিংড়ানো উচিত নয়, কারণ তাতে সূক্ষ্ম তন্তুগুলি পেঁজে কিংবা ছিঁড়ে যাবার খুবই আশঙ্কা। তার পর শুকোবার বৈদ্যুতিক আলমারি থাকলে তার মধ্যে ভরে শুকিয়ে নেওয়াই সব চেয়ে ভাল। তা না হলে প্রথমে একটা বড় টার্কিশ তোয়ালের ভাঁজের মধ্যে সিল্ককে পাট করে কিছু দিয়ে চাপ দিলে যখন খানিকটা জলকে তোয়ালে শুষে নেবে, তখন কোন হাঙ্গারে করে তাকে এমন স্থানে শুকোতে দিতে হবে, যেখানে ছায়াতে প্রচুর হাওয়া আছে, অথচ রোদ নেই। কোন অবস্থাতেই সিল্কের কাপড়-জামাকে, সে সাদাই হোক, আর রঙীনই হোক, রোদে শুকোতে দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাতে তার ঔজ্জ্বল্য কিংবা রঙ অথবা দুইই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সিল্ক্ বা রেশমের বস্ত্রকে ইস্ত্রি করাও সহজ নয়, তার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা ও বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ইস্ত্রিকে ঠিক কতটা গরম করতে হবে, তা জানা না থাকলে অত দামী কাপড় একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তারপর রেশমের কাপড় বা পোষাককে একখানি পরিষ্কার পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে এমন ভাবে ইস্ত্রি করতে হবে, যাতে সিল্কের উপর সোজা ইস্ত্রির উত্তাপ না লাগে। সূতীর কাপড়ের মত ইস্ত্রি করার আগে জল ছিটিয়ে দেওয়াও উচিত নয়, কারণ তাতে সিল্কের উপর অনেক সময় দাগ পড়ে যায়। সিল্কের কাপড়কে ইস্ত্রি করার সময় উপযুক্ত উত্তাপে, যথেষ্ট চাপ দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি তা করতে হয়। রঙীন সিল্ক্ ইস্ত্রি করার সময়ে আরো বেশী সতর্কতা আবশ্যক, কারণ খুব গভীর ও ঘন রঙের সিল্কের উল্টো পিঠেই ইস্ত্রি করা বাঞ্ছনীয়, তা না হলে একস্থানে বেশী চাপের এবং অন্যস্থানে অপেক্ষাকৃত কম চাপের ফলে মসৃণতার বৈষম্য ও পার্থক্য দেখা দিতে পারে, কিন্তু রঙ হালকা হলে উপরের দিকে ইস্ত্রি করলেও চলতে পারে।

সাধারণতঃ ভাল সিল্কের পোষাক-পরিচ্ছদকে ইস্ত্রির দ্বারা শক্ত করার কোন প্রয়োজন হয় না। কেবল টাই, রিবন প্রভৃতির জন্যই কলপের আবশ্যক। এরকম প্রয়োজন হলে সামান্য সদ্য গঁদ-ভিজানো জলে, তাদের চুবিয়ে নিয়ে ইস্ত্রি করাই উচিত কারণ এরোরুট, বার্লি প্রভৃতি শ্বেতসারের কলপ দিলে সিল্কের রঙ ও ঔজ্জ্বল্য দুইই নষ্ট হয়।

যদিও কৃত্রিম সিল্ককে একই ভাবে ধুতে, শুকোতে ও ইস্ত্রি করতে হয়, তাহলেও তার জন্য আরো বেশী সতর্কতা ও তৎপরতা আবশ্যক, কেননা কৃত্রিম সিল্কের তন্তুগুলি রেশমের তন্তুর চেয়েও আরো সহজে নষ্ট হয় এবং অকেজো হয়ে পড়ে।

রন্ধন

শরীর-বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যরক্ষা ও দেহরক্ষার জন্য রোজই আমাদের প্রয়োজন-মত খাদ্য খেতে হয়। তার মধ্যে কোন কোন খাদ্য যেমন—ফল, দুধ, ডিম প্রভৃতি আমরা রান্না না করেই খেতে পারি, কিন্তু বাকী অসংখ্য খাদ্যোপাদানকে রান্না-বান্নার সাহায্যে আমাদের খাওয়ার উপযোগী করে নিতে হয়। মানুষ ছাড়া আর সকল প্রাণীই খাদ্যের নাগাল পাওয়ামাত্রই তা মুখে পুরে এবং পরে তাকে হজম করে শরীরবৃদ্ধি, দেহের ক্ষয়-ক্ষতির পূরণ ও স্বাস্থ্য-রক্ষার কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু অভিব্যক্তির সর্বোচ্চ স্তরে আছে যে মানুষ, তার পাকযন্ত্র অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা কতকটা অক্ষম ব'লে, এবং "চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়"র দ্বারা সে তার চোখ, নাক এবং জিভেরও পরিতৃপ্তি চায় ব'লে, খাওয়ার আগে খাদ্যবস্তুকে তার গ্রহণযোগ্য করে নিতে হয়। মানুষ পৃথিবীতে অনেক কিছু আবিষ্কার করে তার প্রাধান্য স্থাপন করেছে জীব-জন্তু সকলের উপর, স্থলে, জলে ও আকাশে; আবার এমনি অনেক কিছুকে তার নিত্য প্রয়োজনের, বিলাসের কিংবা আরামের জন্যও কাজে লাগিয়েছে; কিন্তু তার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় আবিষ্কার "আগুন" ও তার ব্যবহার। সুদূর অতীতের কোন এক শুভ মুহূর্তে, হয়ত বা শিকার কিংবা আত্মরক্ষার জন্য পাথরের ধারালো কোন অস্ত্র তৈরী করতে গিয়ে, একটি পাথর দিয়ে আর একটি পাথরের গায়ে ঠুকতে গিয়েই সে প্রথমে আগুনের ফুলকিকে লক্ষ্য করে। তারপর কোন দাহ্য বস্তুকে ঐরূপে নিঃসৃত ফুলকি দিয়ে জ্বালিয়ে যেদিন সে আগুনকে ধরে রাখতে এবং তাকে কাজে লাগাতে শিখলো, সেদিন হতেই মানুষের সভ্যতার জয়যাত্রা আরম্ভ হয়েছে বললে ভুল হয় না। তারপর ক্রমে চকমকি পাথর হতে দেশলাইয়ের স্তর পার হয়ে আজ এমন এক যুগে আমরা পৌচেছি যে আগুন কিম্বা আলো জ্বালবার জন্য একটি "সুইচ" টিপলেই হ'ল।

আগুনের আবিষ্কারের আগে মানুষকেও অন্যান্য জীবজন্তুর মতই "কাঁচা" খাবার খেয়ে জীবনধারণ করতে হ'ত। পশু-পাখী কিংবা মাছকে শিকার করেও কাঁচা অবস্থায় খেতে হ'ত বলে দাঁতের ও মুখের পেশীর কসরত যেমন আয়াস-সাধ্য ছিল, আবার তেমনি হজম করাও ছিল শক্ত। তাই আগুন-জ্বালাবার উপায় আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই আদিম মানুষ শিখলো নানা বস্তুকে আগুনে পুড়িয়ে কিংবা ঝলসে নিয়ে কতকটা সুপাচ্য করে নিয়ে খেতে;

তারপর শিখলো জলে তাদের সিদ্ধ করে নিতে এবং তারপর শিকার করা পশুর চর্বির সাহায্যে ভেজে নিতে। শুধু আগুনের আবিষ্কারেই পোড়ানো ও ঝলসানো ছাড়া রান্না-বান্নার অন্যান্য উপায় হয়ত লোকে জানতে পারতো না, যদি না একই সময়ে মাটির হাঁড়ি-কুড়ি কিংবা তামা বা এমনি কোন ধাতুর দ্বারা বাসন-কোসনও তৈরী করতে পারতো! তার পর ধীরে ধীরে মানুষ শিখতে লাগলো খাদ্যের সঙ্গে লবণ ও নানা মসলাপাতির ব্যবহারে তাকে সুসিদ্ধ অবস্থায় সুস্বাদু করে তোলা। আগে শুধু খাদ্যকে মুখে পুরলেই হ'ত তার মুখে লালার এবং পাকস্থলীতে পাচকাম্লরসের নিঃসরণ। কিন্তু যখন হতে মানুষ নানা উপাদান-সহযোগে রান্না করে খাদ্যকে শুধু সুপাচ্য নয়, সুদৃশ্য ও সুবাসিত করে তুললে, সেদিন হতেই রান্নাকরা খাদ্যের ঘ্রাণে এবং তা দেখেও তার মুখে লালা ঝরতে এবং পাকস্থলীর মধ্যেও খিদের রস (appetite juice) ক্ষরিত হতে লাগলো এবং সময়ে সময়ে সত্যি সত্যি খিদে না পেলেও চোখের ও নাকের খিদে তাকে পীড়ন করতে আরম্ভ করলো।

আদিম মানুষের যখন বাসস্থান ছিল পাহাড়-পর্বতের গুহা এবং খাদ্য ছিল পশু-পাখীর মাংস কিংবা ফলমূল, তখন সে ছিল যাযাবর অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়ে নিয়ে একসঙ্গে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াতো এক দেশ হতে অন্য দেশে। কিন্তু যেদিন অকস্মাৎ নারীর হাতে দেখা দিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে শস্যপূর্ণ অজ্ঞাত চারাগাছের শীষ, সেদিনই মানুষের জীবনে এল বিরাট পরিবর্তন। স্বভাবচঞ্চল ভ্রাম্যমাণ মানুষ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে তাকালো প্রচুর সম্ভাবনাময় বিপুলা ধরিত্রীর দিকে। যে যেখানে ছিল সেখানেই বাঁধলো নীড়, চাষবাসের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠলো বাড়ী-ঘর, এবং তারই সমষ্টিতে পাড়াগাঁ! প্রথমে পুরুষেরা বেরিয়ে যেতো শিকার করতে, কাঠ কাটতে, জঙ্গল পরিষ্কার করতে, এমনি কত কিছু দৈহিক পরিশ্রমের কাজে, আর নারীর প্রতিষ্ঠা হ'ল গৃহের কাজে এবং কাছাকাছি চাষবাসের কাজে। পুরুষ যখন দিনান্তে পরিশ্রান্ত দেহে ঘরে ফিরতো সঙ্গে নিয়ে শিকার করা পশু, পাখী বা মাছ এবং গৃহস্থালির জন্য কাঠ, বাঁশ-খড়, নারী তখন চাষবাস ও সন্তান পালনের কর্তব্যের সংগে সংগে গৃহলক্ষ্মীরূপে হাতে তুলে নিয়েছিল, রান্না-বান্না, ঘরদোর ঠিক রাখা, শয্যা-রচনা প্রভৃতির কাজ। বর্তমান সভ্যযুগে যখন কোন বিষয়েই আর মেয়ে-পুরুষে ভেদ নেই অর্থাৎ প্রত্যেক দেশের শাসন-তন্ত্র মতে কোন কিছুই কারো জন্য একচেটে নয়, তখনও ব্যবহারিক প্রয়োগ হিসেবে দেখতে পাওয়া যায় যে দায়ে পড়ে চাকরী করতে হলেও মেয়েরা অন্তরে এবং

কার্যত গৃহলক্ষ্মী ছাড়া আর কিছুই নন। গৃহের অভ্যন্তরেই তাঁদের রাজত্ব এবং সেখানে গৃহস্থালির প্রতিটি কাজকর্ম, বিশেষত রান্না-বান্না একান্ত তাদেরই কর্মক্ষেত্রের অন্তর্গত। এককালে আমাদের দেশে পূজা-পার্বণে, উৎসব প্রভৃতিতে বহু সুপাচিকা মেয়ে নিজেই এগিয়ে যেতেন পাঁচ-শ হাজার লোককে রান্না করে খাইয়ে পরিতৃপ্ত করতে! তখনকার দিনে পাড়াগাঁয়ে বামুন-ঠাকুর বা রাঁধুনী নিয়োগ করে লোকখাওয়ানোকে লোকে প্রশংসার চোখে দেখতো না। অমুক পিসী কি অমুক মাসীই কোমরে কাপড় জড়িয়ে একাই এক শ হয়ে অন্নপূর্ণার মত লোককে খাইয়ে প্রশংসা অর্জন করতেন। আজ সমাজের বাঁধন অনেকটা আলগা, আর লোকের খাটবার ক্ষমতাও গেছে কমে; তা সত্ত্বেও দুচার জন অতি আধুনিকা ও প্রগতিশীলা ছাড়া এমন গৃহিণী কমই আছেন যিনি নিজের হাতে ভালমন্দ, কিছু না কিছু রান্না করে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-কুটুম্ব ও বন্ধু-বান্ধবকে খাইয়ে মনে মনে তৃপ্ত হন না, কিংবা তাদের মুখে নিজের রান্নার প্রশংসা শুনে খুসী হন না।

গৃহস্থালির অন্যান্য কাজকর্মের মতই রান্নাও একটি কলাশিল্প। এক দিনেই কেউ রান্না করতে শেখে না। অপরকে রান্না করতে দেখে এবং নিজেও বারবার করতে করতে যখন হাত খুলে যায়, তখনই "সুপাচিকা" হওয়া যায়, তার আগে নয়। কতটা জলে বা আঁচে কতটা ডাল বা চাল সুসিদ্ধ হয়, অথচ গলে পাঁক হ'য়ে যায় না; কতটা তেল, ঘি বা মসলাপাতি কীভাবে এবং কোন সময়ে দিতে হবে, সে সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা চাই। লবণ-সম্বন্ধে আরো সতর্কতা আবশ্যক, কেননা যে কোন বস্তুর প্রাচুর্য বা অভাব, এ দুকারণেই খাদ্য অখাদ্যে পরিণত হতে পারে। "সৌখীন পাকপ্রণালী" দেখে নিক্তি দিয়ে চুলচেরা ওজন করে দিলে কিংবা অক্ষরে অক্ষরে নির্দেশ পালন করলেও, রান্না যে ভাল হবে তার কোন নিশ্চয়তাই নেই। যাদের আন্দাজ ও মাত্রাজ্ঞান আছে এবং রান্নার সখও আছে, কেবল তাদেরই পক্ষে রান্না করতে করতে "সু-রাঁধুনী" হওয়া সম্ভবপর। তা নইলে "যাঁকে দেখিনি তিনি বড় সুন্দরী এবং যাঁর হাতের রান্না খাইনি তিনি বড় রাঁধুনী" এ প্রবচনটিই হয়ত তার প্রতি প্রযোজ্য হবে।

রান্নার প্রয়োজনীয়তা

(১) খাদ্যকে সহজপাচ্য করা—মাছ, মাংস প্রভৃতি প্রাণিজ প্রোটীন-জাতীয় পদার্থ সুসিদ্ধ হওয়াতে কিংবা অল্প আঁচে রান্নার ফলে কিছুটা বঞ্চিত হয় বলেও সুপাচ্য হয়। ডাল, শিম প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ প্রোটীন সুসিদ্ধ না হলে, তাদের সহজে হজম করা যায় না। তা ছাড়া রান্নার সময়ে

খাদ্যের বিশেষত প্রোটীন-জাতীয় উপাদানের যে নির্যাস (extract) বেরিয়ে আসে, তাতেই রান্নার পর খাদ্য যেমন সুগন্ধি তেমনি সুস্বাদুও হয়। চাল, আটা, ময়দা প্রভৃতির শ্বেতসারের কণার বাইরে যে আবরণ থাকে, সুসিদ্ধ বা সেঁকা অবস্থায় তা ফেটে যায় বলে সেগুলি হজম করাও সহজ-সাধ্য হয়। আবার শাক-সবজি তরি-তরকারিতে যে সেলুলোজ-জাতীয় দুষ্পাচ্য শর্করা-জাতীয় উপাদান থাকে—তারও বহিরাবরণ এ ভাবেই ফেটে যায় বলেও বৃহদন্ত্রে জীবাণুর সাহায্যে তার কতকটা পরিপাক সম্ভবপর হতে পারে, তা না হলে ওগুলি কাঁচা অবস্থায় খেলে পেটের অসুখ হতে পারে। স্নেহজাতীয় এবং লবণ-জাতীয় উপাদানগুলিও উপযুক্ত রান্নার সাহায্যে অন্য খাদ্যাংশগুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ ক'রে তাদের স্বাদ ও পুষ্টিকারিতা বাড়িয়ে তোলে।

(২) জীবাণুদুষ্ট অবস্থা-মোচন—আমাদের নানা খাদ্য জীবাণু, কীটাণু কিংবা তাদের ডিম প্রভৃতির দ্বারা দূষিত হতে পারে, সুতরাং কাঁচা অবস্থায় খেলে তাদের দ্বারা রোগ-সংক্রমণের খুবই আশঙ্কা থাকে। রুগ্ন গরুর দেহ হতে দুধে যক্ষ্মার জীবাণু আসতে পারে। আবার গয়লার দ্বারা অনেক সময় দূষিত জল দুধে মেশানোর ফলেও টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয় প্রভৃতির জীবাণু-দ্বারা দুধ দূষিত হয়। তরি-তরকারি বা শাক-সবজি ক্ষেত হতে তুলে আনা হয়, সুতরাং সেখানে মানুষের মল, গোবর, ঘোড়ার নাদি, কুকুর-বেরাল প্রভৃতির বিষ্ঠা হতেও নানারকম ক্রিমির (যেমন লম্বা ক্রিমি, হুক ক্রিমি, সুতো ক্রিমি) ডিম প্রভৃতি তাদের গায়ে, কিংবা গাছ হতে নীচে যে ফল পড়ে তার উপরও লেগে থাকতে পারে। তা ছাড়া গরু বা শূয়োরের মাংসে জ্যান্ত ফিতে ক্রিমির দেহাংশও থাকতে পারে। তারপর রান্নার জলেও নানা জীবাণু, কীটাণু কিংবা তাদের ডিমও থাকতে পারে। এরূপ অবস্থায় উত্তাপের সাহায্যে খাদ্যকে ভাল করে সিদ্ধ করে নিলে ঐ সকল রোগসংক্রমণের হাত এড়ানো যায়।

(৩) সুগন্ধি ও সুস্বাদু করা—যে কোন খাদ্যের নিজস্ব একটা গন্ধ ও স্বাদ আছে; রান্না অবস্থায় তার নির্যাস বেরিয়ে আসে বলে তার ঘ্রাণ যেমন উপাদেয় হয়, তেমনি আস্বাদও হয় মুখরোচক। আবার উপযুক্ত তেল, ঘি, নুন, মসলাপাতি, গরম মসলা প্রভৃতি সহযোগে রান্না, আরো সুগন্ধি ও সুস্বাদু হয় এবং তার ফলে অধিক পরিমাণে লালা ও পাচকাম্লরস্ প্রভৃতির ক্ষরণ ঘটায় ব'লে খাদ্য আরো সুপাচ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু অতিরিক্ত ভাজা অবস্থায় কিংবা অতিরিক্ত মসলাপাতি-ব্যবহারের ফলে খাদ্য সময়ে সময়ে দুষ্পাচ্য হয়েও পড়ে।

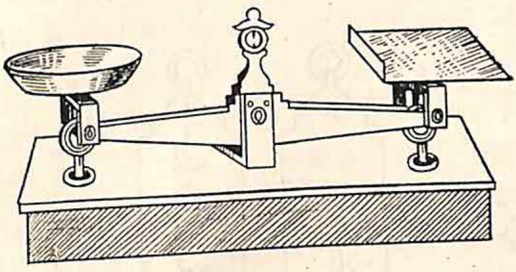
উপযুক্ত রান্না-বান্নার দ্বারা যেমন উল্লিখিত উপকারিতা লাভ করা যায় আবার তেমনি রান্না ঠিক মত না হলে শুধু যে ঐ সকল প্রয়োজন মিটেনা ও উপকার পাওয়া যায় না, এমন নয়, অনেক সময়ে খাদ্যের নানাগুণও নষ্ট হয়ে যায় এবং সুপাচ্যতার পরিবর্তে দুষ্পাচ্যতাও দেখা দিতে পারে। যেমন মাছ কিংবা মাংসকে অধিক ভাজা করলে কিংবা ডিমকে অনেকক্ষণ ধরে সিদ্ধ করতে থাকলে কিংবা সুসিদ্ধ ডিমকে আবার ভেজে মুখরোচক কালিয়ার রূপ দিতে গেলে, ঐগুলি অত্যন্ত দুষ্পাচ্য হয়ে পড়ে। একই ভাবে অত্যধিক তেল, ঘি, কিংবা লঙ্কা বা অন্যান্য মসলার প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যবহারে খাদ্যের নিজস্ব স্বাদ ও গন্ধ ত দূর হয়ই, তার উপর তা অত্যন্ত গুরুপাকও হয়ে উঠে। আলু, শালগম, মুলো, পটোল, ঝিঙ্গে প্রভৃতির খোসাকে পুরু করে ছাড়িয়ে কিংবা ঐগুলিকে সিদ্ধ করে জল ফেলে দিয়ে রান্না করলে অতি প্রয়োজনীয় ধাতব লবণগুলি আর থাকে না। ভাত সিদ্ধ করে ফেন গেলে ফেলে দিলে, তার সমস্ত বেরিবেরি-প্রতিষেধক ভাইটামিন 'বি', -টুকুই বাইরে চলে যায়। শাকপাতা, টমেটো প্রভৃতিকে অনেকক্ষণ ধরে ভাজতে কিংবা খোলা অবস্থায় সিদ্ধ করতে থাকলে তাদের ভাইটামিন 'সি'টুকু নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু ঢাকা অবস্থায় অল্পক্ষণের জন্য সিদ্ধ করলে কিংবা হঠাৎ গরম তেল বা ঘিতে একটু নেড়ে-চেড়ে ভেজে নামিয়ে নিলে অনেকটা ভাইটামিন 'সি'ই অবিকৃত থাকে। মাখনকে অনেকক্ষণ ধরে কোন খোলা পাত্রে জ্বাল দিয়ে ঘি করতে চেষ্টা করলেও ভাইটামিন 'এ' নষ্ট হয়ে যায়। শাক-সবজিও ফলমূলের ভাইটামিন 'সি'-অংশ, রান্নার সময়ে সুসিদ্ধ করার জন্য যে সোডা বা ক্ষার দেওয়া হয়, তার প্রভাবে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। কাঁচা পেঁপেকে কেটে তার সাদা রস মাংসে কিছুক্ষণের জন্য লাগিয়ে রাখলে মাংস অতি সহজে সিদ্ধ হয়ে যায় ও তা মাখনের মত নরম হয়, কিন্তু যদি মাংসকে সিদ্ধ করার সময়ে গরম জলে কাঁচা পেঁপে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে তার 'পেপেন' নামক এন্‌জাইম নষ্ট হয়ে যায় ব'লে, আর মাংসকে নরম করার ক্ষমতা তার থাকে না। ভাত-রান্নার আগে চালকে বারবার ধুতে থাকলে, ঐ ধোয়া জলের সঙ্গে অনেকটা ভাইটামিন বি, ও ফস্‌ফরাস-ঘটিত লবণ বেরিয়ে যায়। আবার ইলিশ মাছকে কেটে ধুয়ে রান্না করলে তার উপাদেয় সুগন্ধ ও আস্বাদটুকুও বহুল পরিমাণে নষ্ট হয়ে যায়। রান্নার সময়ে অপরিষ্কার হাঁড়ি-কুড়ি, খন্তাবেড়ি কিংবা নোংরা হাতের ব্যবহারেও খাদ্য অনেক সময়ে দূষিত হয় এবং রান্না করা খাদ্যকে

পরে ঢেকে না রাখলে মাছি, পোকা, আরশোলা প্রভৃতি তাতে বসে তাকে দূষিত করতে পারে।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ রান্নার আগে ওজন করে চাল, ডাল, তেল-ঘি, নুনের পরিমাণ ঠিক করা হয়। পাকা রাঁধুনী যাঁরা, তাঁরা হাতের মুঠো, কিংবা ডিবে বা কুনকোর সাহায্যেও প্রয়োজনমত জিনিসগুলির মাপ আন্দাজ করে নেন, এবং কতটা জলে কতক্ষণ সিদ্ধ করলে ভাত, ডাল বা ডাল-চালকে একত্র সিদ্ধ করলে খিচুড়ী কিংবা কতটা দুধে কত চাল পায়েসের জন্য দিতে হয়, এ সম্বন্ধে অনেকটা মোটামুটি ধারণা তাঁদের আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে এ রকম আন্দাজের উপর নির্ভর না করে গিন্নীরা প্রতি গৃহে সাধারণ তৌল-যন্ত্রের ব্যবহারে ঐ মাপগুলি ঠিক করেন। আমাদের দেশেও, বিশেষত প্রথম শিক্ষার্থিনীর পক্ষে ঐ রকম একটি তৌল-যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তু কতটা দিতে হবে, ওজন করে ঠিক করে নেওয়া উচিত। নানা রকম **তৌল-যন্ত্র** বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। এক রকম অতি সাধারণ ও সস্তা যন্ত্র আছে, যাতে একটি কাঠের দণ্ডের দু'প্রান্তে একই ভাবে দড়ি নিয়ে দুটি পাতলা তাওয়ার মত থালা ঝুলানো থাকে, আর দণ্ডের ঠিক মাঝখানে একটা ফুটো দিয়ে আটকানো থাকে ঝুলিয়ে রাখবার জন্য একটা শক্ত দড়ির হাতল। তাকে মুঠো করে ধরে তৌল-যন্ত্রকে তুলে ধরলে দণ্ডের দুটি প্রান্তই এক আনুভূমিক তলে থাকে, অর্থাৎ কোন প্রান্তই অপর প্রান্ত অপেক্ষা নীচে ঝুলে পড়ে না। এ অবস্থায় এক দিকে নানা ওজনের বাটখারা চাপিয়ে, অন্য দিকে খাদ্য-উপাদানকে এমত পরিমাণে নিতে হবে যাতে আবার দণ্ডটি একই তলে একেবারে সোজা হয়ে থাকে। তাহলেই ওজন মত জিনিস নেওয়া হল। খাদ্যবস্তু তরল হলে কোন দাগকাটা মাপের স্বচ্ছ পাত্রের সাহায্যে তাকে ওজন-মত নেওয়া চলে। তা না হলে, আগে যে পাত্রে তা নেওয়া হবে, তার সম-ওজনের বাটখারা তৌল-যন্ত্রের অপর দিকে চাপিয়ে যেটুকু ওজনের বস্তু নিতে হবে, সেদিকে তেমনি অন্য বাটখারা নিয়ে অপর দিকে তরল পদার্থকে পাত্রে ঢেলে ওজন করে নিলেই হ'ল।

আবার আর এক রকম তৌল-যন্ত্র আছে, যা দেখতে ঠিক একটা লম্বা ও চৌকো বাক্সের মতন। তার ডালার উপরে দুটো ফুটো আছে এবং তা দিয়ে বেরিয়ে থাকে দুটি পিতলের বা অন্য ধাতুর ডাঁটাশুদ্ধ দুটি ছোট থালার মত প্যান। বাক্সের ভিতরে থাকে স্প্রীংএর সাহায্যে তৌলের ব্যবস্থা।

একটি প্যানে দিতে হয় বাটখারা, আর অন্যটিতে যখন ঠিক তারই সমান ওজনের বস্তু চাপিয়ে দেওয়া হয় তখন আবার দুটি প্যান একই সমতলে এসে

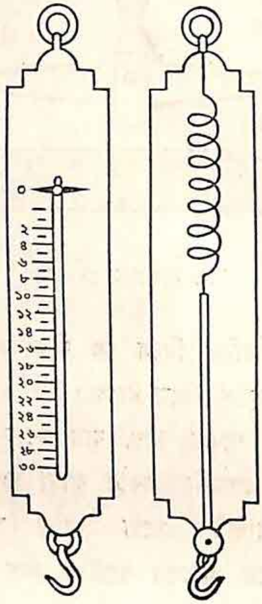


বাক্স আকারের তৌলযন্ত্র

স্থির হয়ে থাকে। বেশী জিনিস দিলে সে দিক কতকটা বসে যায়, আবার কম দিলে তা' অপর দিক হতে উঁচুতে থাকে।

আর এক রকম যন্ত্র পাওয়া যায়, যার মধ্যে একটি গোল বাক্সের গায়ে ঘড়ির গায়ে যেমনটি আছে তেমনি একটা কাঁটা ও ওজনের পরিমাণ লেখা থাকে। ঐ গোল বাক্সটির মধ্যে আছে স্প্রীংএর তৌল-ব্যবস্থা। তার উপরে বসানো আছে আগের যন্ত্রটিরই মত একটা ফুটো দিয়ে বেরিয়ে থাকা ডাঁটাশুদ্ধ একটি প্যান। যে কোন বস্তুকে ঐ প্যানের উপর নিলে তার ওজন কত, যন্ত্রের গায়ের কাঁটা তাই নির্দেশ করে দেয়। কম বা বেশী নেওয়া হলে যথাক্রমে একটু বাড়িয়ে বা কমিয়ে প্রয়োজমত ওজনের বস্তু নেওয়া চলে। স্প্রীংএর আর এক রকম ছোট তৌল-যন্ত্র পাওয়া যায়, যার উপরে থাকে একটি আংটি এবং নীচে থাকে একটি বাঁকানো হুক দেখতে অনেকটা ইংরাজী অক্ষর S-এর মত শক্ত ইস্পাতে গড়া অংশ; তা' তৌল-যন্ত্রের মাঝের অংশের মধ্যে যে স্প্রীং থাকে তার সঙ্গে ঝুলানো। যন্ত্রটির সামনের দিকে পিতলের চাকতির মাঝখানে যে লম্বালম্বি ফাঁক থাকে, সেখানে থাকে স্প্রীংএর সঙ্গে যুক্ত ছোট একটি কাঁটা—আর ঐ কাঁটার দিকেই থাকে লেখা ওজনের নানা সংখ্যা। যে বস্তুকে ওজন করতে হবে, তাকে একটি প্যানে করে দড়ির শিকের সাহায্যে উপরের আংটাকে কোন শক্ত বস্তুর সঙ্গে ঝোলানো-অবস্থায় তৌল-যন্ত্রের বাঁকানো হুকটিতে ঝুলিয়ে দিলে স্প্রীংএর ছোট কাঁটাটি যে সংখ্যা নির্দেশ করবে তৌলের গায়ে, তাই হবে ঐ বস্তুর (অবশ্য প্যান-সহ) ওজন। তা হতে

আলাদাভাবে প্যানের ওজনটুকু বাদ দিলেই বস্তুর ওজনটি পাওয়া যায়। এ তৌল-যন্ত্রটি আকারে ছোট বলে যেখানে-সেখানে নিয়ে যাওয়া যায় এবং আবশ্যক মত বের করে যখন তখন যে কোন বস্তুকে ওজন করে নেওয়া



স্প্রীংএর তৌলযন্ত্র

যায়। কিন্তু এটুকু মনে রাখা উচিত যে স্প্রীংএর তৌল-যন্ত্রগুলির স্প্রীং যদি খারাপ হয়ে যায়, তাহলে তারা অকেজো হয়ে পড়ে; সুতরাং সে অবস্থায় তাদের ব্যবহার করা উচিত নয়।

সকল দেশের ওজনের মাপ কিন্তু এক নয়। আমাদের দেশে অল্প জিনিসের মাপ হয় সের, পোয়া, ছটাক, কাঁচ্চা-হিসাবে এবং ভারী বস্তুর, মণ-হিসাবে। আবার বিলেতে ছোট বস্তু মাপা হয় পাউণ্ড, আউন্স প্রভৃতি হিসেবে কিন্তু ভারী বস্তুকে মাপা হয় হন্দর, টন প্রভৃতি হিসেবে। আবার ওষুধ মাপার জন্য ছোট পাউণ্ড (ট্রয় পাউণ্ড) বলে আর এক রকমের ওজন আছে, যার পরিমাণ ১২ আউন্সের সমান—কিন্তু অন্যান্য বস্তুর ওজনের হিসেব হয়, ষোল আউন্সে এক পাউণ্ড হিসেবে। আবার ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এবং বিশ্বের সকল দেশের বিজ্ঞানসম্মত ওজনের মাপ হলো গ্রাম এবং নীচের দিকে পর পর দশমাংশ এবং উপরের দিকে পর পর দশগুণ হিসেবে।

সেজন্য ভারী কোন বস্তুর মাপ করা হয় কিলো-গ্রাম বা এক হাজার গ্রাম হিসেবে। সেজন্য একদেশের ওজনের সঙ্গে অপর দেশীয় ওজনের কী সম্পর্ক সে সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা থাকলে ভাল হয়। কারণ কোন কোন বস্তু আমাদের দেশেও পাউণ্ড হিসেবে বিক্রী হয়, কিন্তু বাড়ীতে এনে কাজে লাগাতে হলে, তাকে কাঁচ্চা, পোয়া কিংবা সের হিসেবে ওজন করতে হয়। সেজন্য মনে রাখা উচিত যে এক পাউণ্ড আমাদের প্রায় আধ সেরের সমান। সোনা-রূপোর ওজন হয় তোলা হিসেবে; তাই যখন আশি তোলা হয় এক সেরের সমান, তখন বিরাশি তোলা হয় দু'পাউণ্ডের সমান অর্থাৎ এক পাউণ্ড আমাদের আধ সেরের চেয়ে একটু কম। তেমনি একটন প্রায় সাতাশ মণের সমান। সুতরাং এক আউন্স প্রায় আধ ছটাকের মত। আবার ১০০ গ্রাম প্রায় সাড়ে তিন আউন্সের অর্থাৎ পৌনে দু'ছটাকের সমান। খাদ্যের ক্যালরি-মূল্য হিসেব করতে হলে কিংবা বিজ্ঞানের বই-এর নির্দেশ-মত সুসমঞ্জস খাদ্য-তালিকা তৈরী করতে হলে গ্রামের সঙ্গে আউন্সের এবং আউন্সের সঙ্গে ছটাকের সম্পর্ক কী, তা জানা অত্যাবশ্যক।

রন্ধনকালে বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত—যে কোন খাদ্য রান্নার সময়েই বিভিন্ন উপাদানের অনুপাতের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। আগুন ও জল ছাড়া রান্নার কাজ হয় না বল্লেও চলে। সুতরাং উপযুক্ত রান্নার জন্য বিভিন্ন আকারের উনন, দাহ্য পদার্থ ও বিভিন্ন প্রকারের আঁচও আবশ্যক; সে সম্বন্ধে ভাল ধারণা না থাকলে কখনই রান্না ভাল হতে পারে না। যেমন অল্প আঁচে ডাল, ভাত কিংবা মাংস সহজে সিদ্ধ হয় না, তেমনি খুব গণগণে আগুনও রুটি সেঁকা কিংবা ভাজার পক্ষে উপযুক্ত নয়, কারণ তাতে ভাজ্যবস্তু বাইরে পুড়ে যাওয়ার মত হলেও ভিতরে কাঁচা থাকতে পারে। কয়লার আগুন রুটি সেঁকা কিংবা ভাজা-ভুজির পক্ষে মোটেই ভাল নয়। কাঠ কয়লার আগুনে রুটি সেঁকা ও যে কোন ভাজা ভাল হয়। গ্যাস কিংবা ইলেকট্রিকের উননও রুটি সেঁকার পক্ষে সুবিধাজনক নয়। গ্যাসের উননের সুবিধে এইটুকু যে ইচ্ছেমত গ্যাস খুলে দিয়ে কিংবা বন্ধ করে সব রকমেই রান্না করা যেতে পারে। কয়লার উননে ঘেঁষ দিয়ে আঁচকে ঢিমে করে নিতে হয়। কাঠের উননকে ইচ্ছেমত ধরানো ও নিবানো যেতে পারে, গ্যাসের ও ইলেকট্রিকের উননের সে সুবিধে আরো বেশী আছে। পাউরুটি কিংবা পুডিং প্রভৃতির জন্য যাতে নীচে ও উপরে দু'দিকেই ঢিমে আঁচ লাগে, তার ব্যবস্থা থাকা চাই। তেল বা ঘিকে বেশীক্ষণ জলন্ত উননের উপর

রাখলে তাতে আগুন ধরে বিপত্তি ঘটতে পারে। ছানার জিনিসকে খুব কম আঁচে ভাজতে হয়।

আগুনের পর জলের পরিমাণ-সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। চাল, ডাল, তরকারি, মাছ বা মাংস সিদ্ধ করতে হলে ঠিক উপযুক্ত পরিমাণে জল না দিলে হয় তা সিদ্ধ হয় না ও নীচে ধরে যায়, না হয় প্রয়োজনাতিরিক্ত জলকে ঠিক উপযুক্ত পরিমাণে নিয়ে আসতে অনেক সময় লাগে। রুটি বা লুচির ময়দা বা আটাকে থাসতে হলেও উপযুক্ত জল দেওয়া চাই, তা না হলে ভাল লেচি হয় না। কোন কোন তরকারি যেমন লাউ, বেগুন প্রভৃতি হতে প্রচুর জল বেরোয়, স্থতরাং সেগুলি রান্নার সময়ে কম জল দিতে হয়। আবার ভাত, আলু, রাঙ্গাআলু প্রভৃতি অনেকটা জল শুষে নেয় বলে তাদের জন্য একটু বেশী জল দিতে হয়। মাছকে সিদ্ধ করতে হলে মাংসের চেয়ে অনেক কম জল লাগে। অনেক সময়ে জল ছাড়াই শুধু তেল ও সরষে বাটা মেখে পাতায় বেঁধে গরম ভাতের ভাপেই সিদ্ধ করা চলে, তার জন্য জলের প্রয়োজনও হয় না। খিচুড়ী রান্নাকালে শুধু ভাত বা ডালের জন্য যেটুকু জল লাগে তার চেয়ে বেশী জল দিতে হয়, তা না হলে হয়ত সিদ্ধই হবে না, নয়ত নীচে ধরে যাবে। ফুটন্ত তেল-ঘির উপর কখনো জল দিতে নেই কারণ তাতে আগুন ধরে যাওয়ার কিংবা ভাপে হাত-পা বা মুখ ঝলসে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ঝাল-চচ্চড়িতে বেশী জল থাকলে যেমন তা খেতে ভাল হয় না, আবার তেমনি ঝোলে জলের পরিমাণ কম হলেও তা' ঠিক মত রান্না হয় না। খুব বেশী জলে অনেকক্ষণ ধরে চালকে সিদ্ধ করতে থাকলে, ভাত গলে পাঁক হয়ে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে, কিন্তু ডাল যত বেশী সিদ্ধ হয়, ততই তার স্থঘ্রাণ ও আস্বাদ বাড়ে। পায়েস রাঁধতে হলে, চাল যাতে ভাল করে দুধে সিদ্ধ হতে পারে তার জন্য এক সের দুধে চালের পরিমাণ কখনই এক মুঠোর বেশী হওয়া উচিত নয়।

তেল-ঘিও উপযুক্ত পরিমাণে না হলে রান্না কখনই ভাল হতে পারে না। কম তেলে বা ঘিতে রান্না হলে তা অনেকটা ছ্যাকাপোড়া গোছের হয়। কম তেলে ভাজার ফলে ভাজা পুড়ে যায়, তরি-তরকারি বা মাছও সাঁতলানোর সময়ে ধরে যায়। জল ছিটিয়ে আলুকে ভাজা করলে কম তেলেই ভাজা করা চলে, কিন্তু বেগুনকে ভাজতে হলে বেশী তেল লাগে, কেন না বেগুন অতি সহজেই তেলকে শুষে নেয়। ঝোল বা ডালে বেশী তেল-ঘি পড়লে, সেগুলি উপরে ভাসতে থাকে, এবং তাই ব'লে খেতেও যে খুব ভাল হয়, এমন নয়।

আটা কিংবা ময়দা ঠাসবার সময় কম ঘির ময়ান হলে, লুচি বা পুরী শক্ত হয়ে যায়, কিন্তু বেশী ঘি দিয়ে ময়ান দিলে সেগুলি এত নরম হয় যে আস্ত উঠানোই যায় না এবং সেগুলি খাওয়া যায়ও কম। বোয়াল, ইলিশ প্রভৃতি মাছ ভাজতে তেল লাগে কম, সেজন্যই কথায় বলে "মাছের তেলে মাছ ভাজা"! পাঁঠার চেয়ে খাসীর মাংসে এবং অন্যান্য মাংসের চেয়ে ভেড়ার মাংসে চর্বি অনেক বেশি থাকে। কালিয়াতে অনেকটা তেল-ঘি, এবং রোষ্ট, পোলাও, ঘি-ভাত প্রভৃতিতে প্রচুর ঘি লাগে। মসুর ডাল ছাড়া অন্যান্য ডালে সম্বরার সময় ঘি ব্যবহার করলেই খেতে ভাল হয়। ষ্টু, কেক প্রভৃতিতে সামান্য মাখন দিতে হয়, বেশী ঘি বা মাখন দিলে, তাদের স্বাদ ও গন্ধও আর তেমন উপাদেয় থাকে না। তেল বা ঘিতে কড়াভাজা সবকিছুই কতকটা দুষ্পাচ্য হয়ে পড়ে, কিন্তু বেশী ঘিঁতে না ভাজলে লুচি বা পুরী মোটেই ফুলে না, সুতরাং ভাল হয় না।

লবণ খাদ্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। উপযুক্ত পরিমাণে লবণের অভাবে কিংবা আধিক্যেও খাদ্য বিস্বাদ ও খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে। সুতরাং ঠিক মত আন্দাজ করে লবণ দেওয়া সুপাচিকার একটি প্রধান গুণ।

মসলাপাতিরও ঠিক পরিমাণ-মত ব্যবহারে রান্না যেমন ভাল হয়, আবার ঠিকমত না হলেও খাদ্য কখনই মুখরোচক ও উপাদেয় হয় না। হলদি বেশি হলে, কিংবা তাকে ভাল করে সিদ্ধ না করলে কাঁচা হলদির গন্ধ থেকে যেতে পারে। ঝালের পরিমাণও ঠিকমত হওয়া চাই, একেবারে কম হলে আস্বাদ যেমন ভাল হয় না, আবার পরিমাণে বেশি হলে "নাকের জলে চোখের জলে" এক হয়ে যেতে পারে। কোন কোন স্থানের লোকেরা যেমন মান্দ্রাজ ও সমুদ্রতীরবর্তী পূর্ব বাংলার লোকেরা বেশী ঝাল খেতে অভ্যস্ত, এবং লঙ্কার পরিমাণ সে অনুপাতে না হলে, তাদের পক্ষে খাদ্য তেমন মুখরোচক হয় না, কিন্তু অন্যের পক্ষে তা "বিষম" ঝাল বলে বোধ হতে পারে, যে রান্না করে তার সে কথাটা মনে রাখা উচিত। দালচিনি, লবঙ্গ, এলাচ প্রভৃতি গরম মসলাও প্রয়োজনাতিরিক্ত হওয়া উচিত নয়, কারণ তাতে খাদ্যের নিজস্ব আস্বাদ আর কিছুই থাকে না, পেঁয়াজ-রসুন সম্বন্ধেও সে কথা খাটে! ফোঁড়ন-সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক—কোন কোন খাদ্যে পাঁচফোড়ন ব্যবহার করা হয়, আবার কোন কোন খাদ্যে কালজিরে বা শুধু মেথি-ফোড়ন দিলেই চলে। মেথির ফোড়ন আবার বেশী হয়ে গেলে খাদ্য তেতো হয়ে যেতে পারে। শুকনো লঙ্কা ফোড়নে খাদ্য বেশী ঝাঁজালো হয়, এবং ফোড়নের সময় রাঁধুনীর নিজের এবং যারা কাছে থাকে, তাদেরও নাকে বা গলায় ঝাঁজ ঢুকে কাশি বা

হাঁচি হতে পারে। আবার অম্বল, চাটনী প্রভৃতিতে সরষে ফোড়নও দেওয়া হয়।

খাদ্যে চিনির ব্যবহারও পরিমাণ-মত হওয়া চাই। মিষ্টি খাবারও বেশি মিষ্টি হলে বেশি খাওয়া যায় না, আবার খুব কম হলেও ভাল লাগে না। ডাল ও নিরামিষ তরকারিতে কিছুটা চিনি দিলে খেতে ভালই লাগে, কিন্তু মাছ, মাংস বা ডিমের তরকারিতে যতটা কম চিনি দেওয়া যায় ততই ভাল হয়। অম্বলে বা চাটনিতেও চিনির পরিমাণ ঠিকমত না হলে, তা ঠিক উপাদেয় হয় না।

উপাদেয় ও মুখরোচক খাদ্য উপযুক্ত উত্তাপ, সময়, জল, তেল, ঘি, মসলা-পাতি, লবণ, সবকিছুর অনুপাতের সামঞ্জস্যের উপরই নির্ভর করে। কোন একটির ব্যতিক্রমেই সমস্ত পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও উৎসাহ একেবারে বিফল হতে পারে। স্বদেশী যুগের একটি কবিতায় আছে,—

"ছি-ছি-ছি-ছি রাণী রাঁধতে শেখে নি,
জ্যাঠাই-মাকে বলে ঝোলে মসলা দোবো কি,
সুক্তনিতে ঝাল দিয়েছে, অম্বলেতে ঘি।
ছি-ছি-ছি-ছি রাণী রাঁধতে শেখে নি,
পরমান্ন রেঁধে বলে ফেন ফেলবো কি ?
ভোজ-বাড়ীতে খোঁজ পড়েছে এখন উপায় কি ?
ছি-ছি-ছি-ছি রাণী রাঁধতে শেখে নি।"

সাধারণ রান্না-বান্নায় কোন উপাদানে কি দিতে নেই, বা কি করতে নেই, ছোট মেয়ে রাণীকে উপহাসের ছলে তারই একটা ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে।

রান্নার উপকরণসমূহ ও তাদের পরিমাণ

ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, তরি-তরকারি প্রভৃতি যা কিছুই রান্না করা হোক না কেন, তার আগে উপকরণগুলির সবকিছু জোগাড় করা আবশ্যক। একই মুখ্য উপাদান দিয়ে নানারকম মুখরোচক খাদ্য তৈরী হতে পারে, কিন্তু তার জন্য পৃথক্ পৃথক্ মসলাপাতি ও অন্যান্য উপাদান আবশ্যক এবং তাদের রান্নার প্রণালীও এক নয়। প্রতি গৃহে গৃহিণীকে দিনে তিনবার কিংবা চারবারের খাবারের ব্যবস্থা করতে হয় ; কিন্তু প্রতিবারের খাদ্য-তালিকা ঠিক এক হয় না, তার মধ্যে রকম-ফের করতে হয়। আবার প্রতিদিনই দুপুরে কিংবা রাত্রিতে যদি 'থোড়-বড়ি-খাড়া' কিংবা "বড়ি-খাড়া-থোড়" কিংবা "খাড়া-থোড়-বড়ি"

অর্থাৎ একই বস্তু বারবার ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দেয় তাহলেও অনেক সময়ে খাদ্য একঘেয়ে হয়ে উঠে! শরীর-রক্ষার জন্যই খাদ্যের প্রয়োজন, সুতরাং যে কোন প্রকারে প্রোটীন, শর্করা, স্নেহ, ধাতব লবণ ও ভাইটামিনের দৈনন্দিন পরিমাণ ও গুণ ঠিক থাকলেই হ'ল, আর কিছু আবশ্যক নেই এরূপ মনে করা ভুল। খাদ্য-সম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ ও ভিন্ন ভিন্ন রুচি আছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের তৃপ্তি, রসনার তৃপ্তি, মনের তৃপ্তিও জড়িত। সুতরাং মাঠে চরতে চরতে গরু যেমন নির্বিচারে ঘাসকে গিলতে থাকে, তেমনি মানুষের পক্ষে নির্বিচারে "সুশীল সুবোধ বালক, যা পায় তাই খায়" গোছের গিলে খাওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী সময়ে সময়ে খাদ্য তালিকার অদল-বদল আবশ্যক। বাড়ীর গৃহিণী যিনি, তাঁকেই নজর রাখতে হবে, কর্তা কি ভালবাসেন, ছেলে-পুলে কি ভালবাসে, কোলের শিশুর জন্য বা বাড়ীতে রুগ্ন কেউ থাকলে তার জন্যই বা কি ব্যবস্থা হবে, এ সব-কিছু বিবেচনা করে সাধারণ, এবং প্রয়োজন-মত পৃথক্ পৃথক্ খাদ্যতালিকা-প্রণয়নের। আর্থিক সঙ্গতি, সহজলভ্যতা, আবহাওয়ার পক্ষে উপযোগী কি না, সময় এবং শারীরিক শক্তিতে প্রয়োজন মেটানো সম্ভব কিনা—এ সব কিছুর প্রতি দৃষ্টি রেখেই তাকে এ কাজ করতে হবে। দু-ভাবে খাদ্যতালিকা প্রণয়ন করা যেতে পারে। কোন বিশেষ ঘটনা-উপলক্ষে বাড়ীতে লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে হলে, আগেই কী কী রান্না হবে ঠিক করে সেভাবেই জিনিষপত্র কিনে আনতে হয় এবং কোন বস্তু ঠিকমত না পেলে, তার পরিবর্তে অন্য কিছুর ব্যবস্থা করা হয়। আবার প্রতিদিনের রান্না-বান্নার ব্যবস্থা সাধারণতঃ বাজার হতে কী কী জিনিষ এসেছে তা দেখেই ঠিক করতে হয়। অবশ্য ডাল, ভাত বা রুটির ব্যবস্থা, নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার! কোনদিন হয়ত মাছ পাওয়া গেল না, সুতরাং বাজার হতে যখন মাংস এসেছে, তখন তাকেই রান্না করতে হবে। বাজার হতে যদি ফুলকপির পরিবর্তে, বাঁধাকপি এবং ওলকপির পরিবর্তে শালগম আসে তবে সে অনুযায়ীই খাদ্যতালিকার পরিবর্তন করতে হবে। সুতরাং বাড়ীর গৃহিণীকে, যখন আটটার সময় বাজার এসে পৌছলো বাড়ীতে, তখনই অগৌণে ঠিক করে নিতে হবে কী দিয়ে কি হবে, কেননা এক ঘণ্টা পরেই ইস্কুল, কলেজ ও অফিসের ভাত দিতে হবে।

সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং বিত্তশীল যারা বাংলাদেশে, তাদের গৃহে খাবারের আয়োজন শুধু দেহরক্ষার জন্য ব্যবস্থাই নয়, তাকে ভোজন-বিলাসিতা বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। পাঁচ-সাতটা পদ না হলে কোন গৃহিণীরই মনঃপূত হয় না

তারা মনে করেন যে পরিবারের কারো পেটই ভরবে না যদি প্রতিবেলা ঐ রকম রাজসিক আয়োজন না হয়। কিন্তু অন্যান্য দেশে, এমনকি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও খাওয়ার এত আড়ম্বর আর কোথাও দেখা যায় না। সুতরাং নানা কারণে, বিশেষতঃ সামর্থ্য ও স্বাস্থ্যের দিক হতে, বাংলাদেশের গৃহিণীদেরও আজ এমন ভাবে দৈনন্দিন খাদ্যতালিকার পরিকল্পনা করতে হবে, যাতে প্রতিবেলা তিনটি এবং কোন অবস্থাতেই চারটির বেশী পদ না থাকে। অবশ্য যাতে একঘেয়ে না হয়ে উঠে তার জন্য যে কোন একটির বদলে, অপর কোন কিছুর ব্যবস্থা করা, মুখ-বদলানোর দিক্ হতে ভালই বলতে হবে। দৃষ্টান্তস্থলে একদিন হয়ত আটার রুটি হল, তারই বদলে কোন দিন লুচী, পরোটা বা ডালপুরি করা যেতে পারে, সুযোগ ও সুবিধে-মত।

স্বাভাবিক পরিশ্রমী একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে দিনে ২৫০০ ক্যালরি আবশ্যক—এই হিসেবে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও সঙ্গতিপন্ন প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভাব্য তিনটি খাদ্য তালিকা তুলনামূলকভাবে নীচে দেওয়া গেল।

খাদ্যের উপাদান	দরিদ্রের পক্ষে পরিমাণ	মধ্যবিত্তের পক্ষে পরিমাণ	সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির পক্ষে পরিমাণ
সিদ্ধচাল বা ঢেকিছাঁটা চাল	আধসের	পাঁচ ছটাক	চার ছটাক
লাল আটা	দু ছটাক	দু ছটাক	দু ছটাক
ডাল	আধ ছটাক	দেড় ছটাক	এক ছটাক
মাছ বা মাংস	আধ ছটাক	এক ছটাক	দু ছটাক
তেল বা ঘি	সিকি ছটাক	দেড় ছটাক	দু ছটাক
শাক-সবজি	এক ছটাক	দু ছটাক	দু ছটাক
তরি-তরকারি	পৌনে এক ছটাক	তিন ছটাক	তিন ছটাক
ফল	সিকি ছটাক	এক ছটাক	দু ছটাক
চিনি বা গুড়	সিকি ছটাক	এক ছটাক	এক ছটাক
মসলাপাতি	আধ ছটাক	আধ ছটাক	আধ ছটাক
লবণ	প্রয়োজনানুসারে	প্রয়োজনানুসারে	প্রয়োজনানুসারে

নিম্নবিত্ত দরিদ্র গৃহিণীর পক্ষে রান্না-বান্নার আড়ম্বর বিশেষ কিছুই নেই। উল্লিখিত পরিমাণ হতে দুবেলার খাবারের মোটামুটি সাদাসিধে বন্দোবস্তই

চলে ; অর্থাৎ এক বেলা পাঁচ ছটাক চালের ভাত, ও রাত্রিতে তিন ছটাক চালের ভাত ও দু ছটাক আটার রুটি। দু ছটাক ডালকে দুবেলার জন্য ভাগ করলে প্রতি বেলা এক ছটাক করে পড়ে। একঘেয়েমি কমাবার জন্য, তা আবার দুরকম নেওয়া যায়, যেমন একবেলা মুসরী এবং একবেলা ছোলা বা মটর। আবার অল্প একটু কম নিলে, সকালে বা বিকেলে সে পরিমাণ গোটা ডালকে কল-বেরনো অবস্থায় আদা, নুন ও কাঁচা লঙ্কা কিংবা নারকেল ও গুড় দিয়ে খেলেও উপকার হয় এবং একটু রকমারিও হয় তাতে। মাছ, সে ছোট মাছই হউক আর যাই হউক এক বেলা অল্প কিছু তরি-তরকারি, মসলাপাতি ও লবণ সহযোগে এবং আর একবেলা শাক-সবজি বা তরি-তরকারির ঘণ্ট লবণ ও মসলাপাতি সহযোগে রান্না করলে, দু বেলাই তিনপদ করে শুধু ভাত বা ভাত ও রুটির সঙ্গে খাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে। গরীবের গৃহের গিন্নীর পক্ষে এ ভাবেই রোজকার খাদ্য-তালিকা রচনা করতে হয়—বাড়ীতে বা পরিবারে কজন লোক আছে তাদের জন্য (যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয়) ঐ অনুপাতে খাদ্য উপাদান গুলি নিয়ে তারই মধ্যে রকমারি খাদ্য সৃষ্টি করতে হয়।

মধ্যবিত্ত ও সঙ্গতিপন্ন ঘরের গৃহিণীকেও একই ভাবে রোজকার জন্য রোজ খাদ্য-তালিকা প্রণয়ন করতে হয়, উল্লিখিত তালিকানুযায়ী পরিবারের লোকসংখ্যার অনুপাতে এবং তাদের পছন্দ, রুচি, ও মর্যাদা-অনুযায়ী। গরীবের ঘরের খাদ্যে রকমারি ঘটে কদাচিৎ, 'ডাল-ভাত-তরকারি' হলেই হ'ল, অর্থাৎ শরীরের প্রয়োজন ও উদর-পূরণই হয় মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সঙ্গতি ও সামর্থ্য যত বেশী হয়, লোকের চোখের ও মুখের তৃপ্তি ও আড়ম্বরের ভাব ততই প্রবল হতে থাকে। সেজন্যই মধ্যবিত্ত ঘরেই গৃহিণীকে বেগ পেতে হয় খাদ্য-তালিকা-প্রণয়নে সব চেয়ে বেশী। রুটির বদলে লুচি করতে গিয়ে যখন ঘি ফুরিয়ে যায়, তখন ছ্যাকাপোড়া পরোটাতেই কাজ সারতে হয়। রান্না করতে গিয়ে তরকারির পরিমাণ বাড়াতে আলুর অভাবে বেগুন দিতে হয়, তেলের অভাবে বেগুনকে ভাজা না করে বেগুন-পোড়া দিয়েই মুখের স্বাদ বদলাতে হয়। সময় কম থাকলে দুবার চাল ও ডালকে আলাদা আলাদা সিদ্ধ না করে একসঙ্গে সিদ্ধ করে খিচুড়ী করে নিতে হয়। সকাল বেলা চা-তে এবং ছেলে মেয়েদের দুধেই চিনি শেষ হয়ে যায় ব'লে, চাটনি বা অম্বল রান্না করতে গিয়ে তার অভাবে সেগুলি অত্যধিক টক্ হয়ে যায়। সুতরাং নিত্যই তাকে মানসিক উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে হয়। কখনো বা ডালকে বেটে বড়ী দিতে হয়, আবার কখনো বা ধোঁকা করে তরকারিতে নূতনত্ব আনতে হয়। মাংস দিয়ে

কখনো বা ঝোল, কখনো বা কারি, আবার কখনো বা ষ্টু করতে হয়, এবং দু একদিন চপ্-কাট্‌লেট রান্না করার মত দুঃসাধ্য কাজেও হাত দিতে হয় বৈকি ? মাছের রান্নায় কুঁচো চিংড়ীর লাউঘণ্ট, মৌরলা মাছের সুক্তো বা অম্বল, বা অন্যমাছের ঝোল, বা ঝাল বা চচ্চড়ির অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করতে হয়। বড় ঘরে অবশ্য, এরকম কোন ঝক্কি সহ্য করতে হয় না, কারণ সেখানে গৃহিণীর কাজ কেবল তালিকা ঠিক করে দেওয়া পর্যন্ত, কারণ তাঁর আদেশ পালন করে তাকে রূপ দেবে ঠাকুর-রাঁধুনী, সরকার-গোমস্তা প্রভৃতি। কিন্তু তাহলেও অর্থের বা সামর্থের প্রাচুর্য সত্বেও দৈনদিন খাদ্য-তালিকার প্রণয়ন খুব সহজ ব্যাপার নয়। গতানুগতিক ব্যবস্থা বড় ঘরে কখনই চলতে পারে না, কারণ সেখানে, ছেলে মেয়ে বুড়ো, কর্তা-গিন্নী, মায় দাসদাসীর পর্যন্ত মেজাজ থাকে এবং খাদ্য, রুচি, পছন্দ ও মেজাজ-অনুযায়ী না হলে মন-কষাকষি, রাগারাগি, এমনি নানা বিশৃঙ্খলা সংসারে দেখা দিতে পারে। সুতরাং বড়ঘরের সুগৃহিণীর পক্ষে অনেকটা সমদর্শিতা ও বিচক্ষণতা থাকা অত্যাবশ্যক। ঝি-চাকর, ঠাকুর ও গোমস্তার জন্য পৃথক্-ব্যবস্থা থাকলে, একবারের কাজ দুবার করতে হয়, এবং তাতে ঐ শ্রেণীর মধ্যে ক্রমেই যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে তাতে নানা অসুবিধেরই সৃষ্টি হয়। সুতরাং তাদেরও পরিবারের সংখ্যার মধ্যেই ধরে নিয়ে একই খাদ্য-তালিকার গণ্ডীর মধ্যে তাদের টেনে আনলে গৃহের কর্ত্রীর পক্ষে লাভ ছাড়া ক্ষতির কোন আশঙ্কা নেই। প্রতি গৃহে খাদ্য-তালিকা-প্রণয়নের অবস্থা বা ক্ষেত্র ঠিক এক নয়, সুতরাং প্রত্যেকটি অবস্থা ও নানা খুঁটি-নাটি বিচার করে, যে বাড়ীর কর্ত্রী উদ্ভাবনী শক্তির কুশলতা প্রমাণ করেন নানা কাজের মধ্য দিয়ে, তিনিই সত্যি সত্যি 'সুগৃহিণী' আখ্যার উপযুক্ত।

প্রশ্ন

(১) 'সুগৃহিণী' কাকে বলে ? গৃহস্থালি-পরিচালনায় তাঁর বিশেষ বিশেষ কর্তব্যগুলির উল্লেখ কর।

(২) সিল্ক বা রেশম-জাতীয় কাপড়কে কী ভাবে কাচতে, শুকোতে ও ইস্ত্রি করতে হয় ?

(৩) রান্না-করা খাদ্য-গ্রহণের উপকার কি কি ?

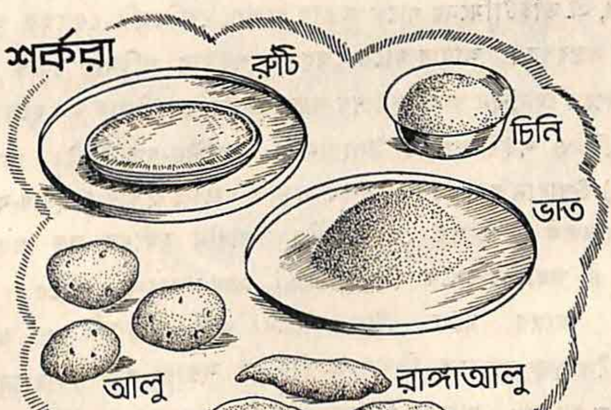
চতুর্থ অধ্যায়

খাদ্য

স্নেহজাতীয় উপাদান

(Fats and Oils)

যদিও প্রোটীন, স্নেহ ও শর্করা, সকল জাতীয় খাদ্য হতেই আমরা চলা-ফেরা, উঠা-বসা, ছুটাছুটি করা প্রভৃতি শারীরিক কাজের জন্য কর্ম-শক্তি লাভ করতে পারি, তাহলেও স্নেহজাতীয় উপাদান অর্থাৎ তেল-ঘি-মাখন হতে তা আমরা পাই শর্করা ও প্রোটীনের তুলনায় অনেক অধিক পরিমাণে। এক গ্রাম ওজনের শর্করা বা প্রোটীন হতে যখন আমরা পাই ৪'১ ক্যালরি উত্তাপ, তখন একই পরিমাণ স্নেহজাতীয় উপাদান হতে আমরা দ্বিগুণের চেয়েও বেশী অর্থাৎ ৯'৩ ক্যালরি উত্তাপ পাই। সুতরাং শুধু কর্মশক্তির জন্য,



শর্করা-জাতীয় খাদ্যোপাদান সমূহ

একমাত্র শর্করা বা প্রোটীন খেলে আমাদের পক্ষে যতটা খাদ্যের আবশ্যক, তাদের যে কোনটির পরিমাণের অর্ধেকের চেয়েও কমের দ্বারা শুধু চর্বিতেই সে চাহিদা

মিটতে পারে। কিন্তু নানা কারণে অত বেশী চর্বি খাওয়া সম্ভবপর নয়; একে ত দাম অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় অনেক বেশী, তার উপর একসঙ্গে বেশি খাওয়াও যায় না। সেজন্য অপেক্ষাকৃত সস্তা, সহজলভ্য এবং খেলেও কোন অসুখ করে না বলে কর্মশক্তির বেশীভাগের জন্য আমাদের ভাত, রুটি, আলু প্রভৃতি কোন না কোন শর্করা-জাতীয় উপাদানকেই প্রধান বা মুখ্য খাদ্যের স্থান দিতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও শীতপ্রধান দেশে শর্করা-জাতীয় মুখ্য খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গেই অধিক উত্তাপ-সৃষ্টির জন্য কতকটা স্নেহজাতীয় উপাদান এবং প্রোটীনও খাওয়ার প্রয়োজন।

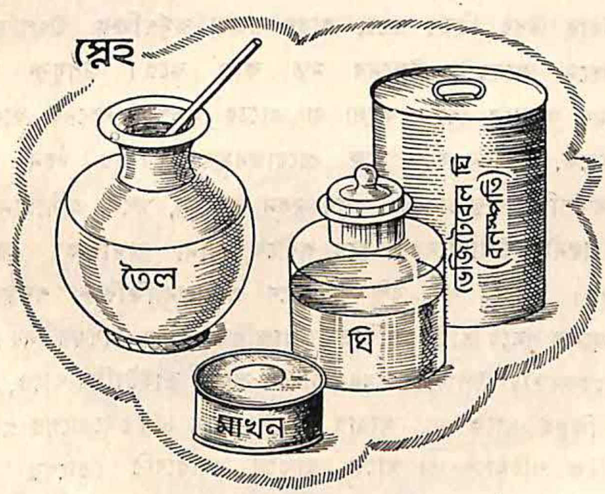
আবার কোন কোন ভাইটামিন, যেমন দেহবৃদ্ধিকারক ভাইটামিন 'এ', রিকেটস্-প্রতিষেধক ভাইটামিন 'ডি', বন্ধ্যাত্ব-প্রতিষেধক ভাইটামিন 'ই' রক্তের তঞ্চন-সংঘটক ভাইটামিন 'কে' প্রভৃতি স্নেহে দ্রবণীয়, সেজন্য মাখন, কডলিভার অয়েল, রেড পাম অয়েল, অঙ্কুরিত গম-নিঃসৃত তেল প্রভৃতি হতেই এ ভাইটামিনগুলি পাওয়া যায়। আবার অলিভ অয়েল (জলপাইর তেল) জাতীয় তেলে অত্যাবশ্যক স্নেহজ-অ্যাসিড থাকাতে, তারা চর্মরোগের প্রতিষেধের কাজ করে। খাদ্যে যথেষ্ট স্নেহ-পদার্থ থাকলে, অন্ত্রের মধ্যে জীবাণুগুলি বেরিবেরি-প্রতিষেধক ভাইটামিন 'বি',ও অতি সহজে তৈরী করে বলে, ঐ ভাইটামিনের খাদ্যে অভাব হলেও বেরিবেরি রোগের অনেকটা প্রতিষেধ সম্ভবপর। আবার খাদ্যে স্নেহ ও শর্করার পরিমাণ বেশি থাকলে, কেবল দেহের দৈনন্দিন ক্ষতি-পূরণের জন্য প্রোটীনের পরিমাণ কম হলেও চলে; এজন্য চর্বি ও শর্করা-জাতীয় উপাদানকে প্রোটীন-রক্ষাকারী (protein-sparer) উপাদান বলা হয়। তেল-ঘি প্রভৃতি খাদ্যের সুস্বাদ ও সুঘ্রাণ-বাড়াবার জন্যও আবশ্যক। খাদ্যের স্নেহ-জাতীয় উপাদান হজমের জন্য অত্যাবশ্যক পিত্তরস ও অগ্ন্যাশয়-রসকে (bile and pancreatic juice) অধিক পরিমাণে অন্ত্রের মধ্যে টেনে আনে এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রগুলির ঝিল্লীকে তৈলাক্ত রাখাতে ছিবড়ে-জাতীয় বা অন্যান্য শক্ত-উপাদানের দ্বারা তা' আহত হয় না। আবার খাদ্যের স্নেহ-উপাদান হতেই শরীরে চামড়ার নীচে যে চর্বির একটি স্তর থাকে তা গঠিত হয়; তার অভাবে শরীরকে কাঠ-খোট্টা দেখায় ও তা স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে এবং অসুখ-বিসুখে কিংবা উপোসের সময়ও, আপৎকালে বা দুর্দিনে দেহে কর্মশক্তির সঞ্চয়-ভাণ্ডারের রিক্ততার জন্য রোগের সঙ্গে লড়াই করা কিংবা উপোস করতে থাকলে বেঁচে থাকা বহুদিন সম্ভবপর হয় না; তাছাড়া চামড়ার নীচে চর্বির

অনতি-পুরু আবরণ, অনেকটা কম্বলের মতই আমাদের শীতের হাত হতে রক্ষা করতে সাহায্য করে। কিন্তু তাই বলে খুব বেশী তেল-ঘি খাওয়া উচিত নয়, তাতে শরীর মেদবহুল হতে পারে এবং পরিণামে অকেজো ও কুৎসিত হয়ে পড়ে এবং সময়ে সময়ে হৃৎপিণ্ডের উপর চর্বি বসাতে তার দৌর্বল্য দেখা দেয়। আবার অতিরিক্ত তেল-ঘি পূর্ণ খাবার খেতে থাকলে কারো কারো অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগও দেখা দিতে পারে—কারণ প্রথমে তাতে পাচকাম্ল রসের ক্ষরণ কম হলেও পরে তারই প্রতিক্রিয়ার ফলে অত্যধিক ক্ষরণ হতে থাকে বলে অম্বলের রোগ জন্মায়।

স্নেহজাতীয় উপাদান কোন কোন খাদ্যে আছে?

এদের সাধারণতঃ দু' শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যেমন—

(১) প্রাণিজ—মাখন-ঘি, চর্বি, (যেমন খাসীর তেল, ভেড়ার চর্বি,



স্নেহ-জাতীয় খাদ্যোপাদান সমূহ

গরুর চর্বি প্রভৃতি) এবং মাছের বা জলজন্তুর তেল (কডলিভার অয়েল, হ্যালিবাট অয়েল, হাঙ্গরের যকৃৎ-তেল, ইলিশ মাছের তেল প্রভৃতি)।

(২) উদ্ভিজ্জ—যেমন সরষের তেল, নারকেল তেল, তিলের তেল, জলপাইর তেল, বাদামতেল, রেড্ পাম অয়েল, গমের অঙ্কুরের তেল, এবং ভেজিটেব্ল ঘি বা দালদা, বনস্পতি প্রভৃতি।

তাছাড়া ডিমের কুসুম, প্রাণিদেহের যকৃৎ, মস্তিষ্ক প্রভৃতি অংশ এবং সোয়াবীন তেলেও ফস্ফোলিপাইড ও কলেষ্টেরোলজাতীয় স্নেহ-উপাদান থাকে

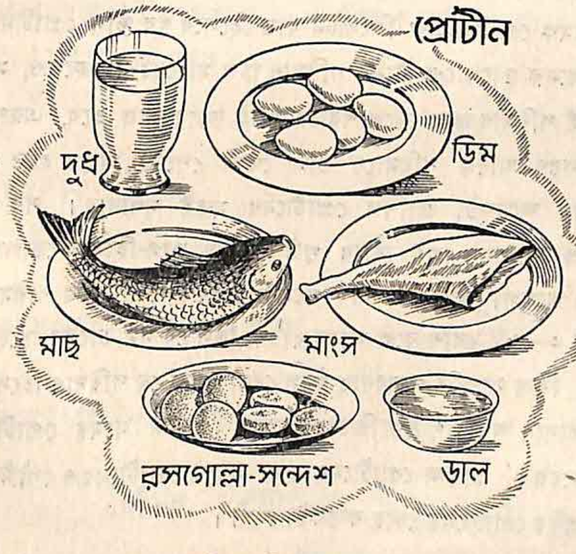
স্নেহজাতীয় ও শর্করা-জাতীয় খাদ্যের তুলনা

দেহের পক্ষে দুইই কর্মশক্তিদায়ক উপাদান হলেও, একই পরিমাণ তেল বা ঘি হতে যে শর্করার (চিনি, শ্বেতসার প্রভৃতি) চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশী উত্তাপ ও কর্মশক্তি লাভ হয় সে কথা আগেই বলা হয়েছে। স্নেহজাতীয় উপাদানকে দেহের চর্বিরূপে, কর্মশক্তির সঞ্চয়-ভাণ্ডাররূপে, যকৃত ও পেশীতে শর্করার গ্লাইকোজেন-রূপে সঞ্চয়ভাণ্ডার হতে অনেক বেশী পরিমাণে সঞ্চয় করে রাখা চলে। কিন্তু প্রয়োজন-মত যখন-তখনই যেমন গ্লাইকোজনকে কর্মশক্তিতে পরিবর্তন করা যায়, চর্বিকে তত সহজে করা যায় না। প্রয়োজন-মত প্রথমে সঞ্চয় ভাণ্ডারটি শেষ হয়ে গেলে, দ্বিতীয় ভাণ্ডারটির উপর চাপ পড়াতে সে চর্বির রূপান্তর ঘটে গতিশীল চর্বিতে এবং নানা পরিবর্তনের পর তাই শরীরে কর্মশক্তি যোগায়। কিন্তু চর্বি অনেকটা তার স্বাভাবিক ক্রিয়ার জন্য শর্করার উপর নির্ভর করে, কারণ শর্করা কর্মশক্তির উৎপত্তির জন্য চর্বির দহনে অনেকটা ইন্ধনের মত কাজ করে। উপযুক্ত পরিমাণে অক্সিজেনের অভাবে যেমন কয়লা বা কাঠের অসম্পূর্ণ দহনের ফলে ধোঁয়া উঠতে থাকে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনমত শর্করার দহন না হলে তাপ ও কর্মশক্তির জন্য চর্বিরও সম্পূর্ণ দহন হয় না, ফলে এসিটোন প্রভৃতি নানা অবাঞ্ছনীয় উপাদানের উদ্ভবে শরীরে নানা অস্বস্তিকর রোগ-লক্ষণ দেখা দেয়। আবার খুব বেশী পরিমাণে প্রয়োজনাতিরিক্ত শর্করা খেতে থাকলে অনেক সময়ে তারও চর্বিতে রূপান্তরিত হওয়া অসম্ভব নয়। কোন কোন স্নেহজাতীয় উপাদানে যেমন চর্বিতে দ্রবণীয় ভাইটামিন থাকে, শর্করাতে সেরকম কিছুই থাকে না, আবার কোন কোন চর্বি চর্মরোগের প্রতিষেধক, এবং অধিক পরিমাণে তা খাদ্যে থাকলে বেরিবেরি রোগের প্রতিষেধ হতে পারে, সেজন্য চর্বিকেও কতকটা দেহরক্ষাধারী উপাদান বলা যেতে পারে; কিন্তু শর্করার সেরূপ কোন ক্ষমতাই নেই (কেবল কতকটা প্রোটীনকে বাঁচানো ছাড়া); তার একমাত্র কাজ শরীরকে কর্মশক্তি যোগান ও একই কারণে চর্বির দহনে সাহায্য করা। মূল্য-হিসেবে শর্করা সাধারণতঃ স্নেহ-জাতীয় উপাদান অপেক্ষা অনেকটা সুলভ এবং কতকটা সহজলভ্যও বটে।

প্রোটীনের পুষ্টিকারিতা

আমাদের খাদ্যতালিকায় যতগুলি উপাদান আছে, তাদের মধ্যে প্রোটীনই প্রধান। আমাদের দেহেরও প্রোটীনই মুখ্য উপাদান। প্রতিদিনই অনবরত

আমাদের অজ্ঞাতসারে শরীরের যে ক্ষয়-ক্ষতি হচ্চে তার জন্য খাদ্যে কতকটা প্রোটীন থাকা অত্যাবশ্যক ; তা না হলে ঐ ক্ষতিপূরণ না হওয়ার জন্য আমরা ক্রমশঃই রোগা হতে থাকবো এবং আমাদের পক্ষে বেশীদিন বেঁচে থাকা সম্ভবপর হবে না। তা ছাড়া শৈশব ও বাল্যকালে যতদিন না দেহের পূর্ণ বিকাশ হয়, ততদিন পর্যন্ত দেহ-বৃদ্ধির জন্যও প্রোটীন-জাতীয় খাদ্য চাই-ই চাই। এ সকল প্রধান কাজ সেরে খাদ্যের যেটুকু প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রোটীন অবশিষ্ট থাকে, শর্করা ও স্নেহ-উপাদানের মতই তারও রূপান্তর হয় কর্মশক্তিতে। সুতরাং যদি আমরা অন্য কোন খাদ্য না খেয়ে কেবল প্রোটীনই যথেষ্ট পরিমাণে খাই, তাহলেও আমরা সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারি। উত্তর মেরুর কাছাকাছি যে এস্কিমোদের বাস, তারা কেবল মাংস খেয়েই বেঁচে থাকে বলা চলে। কর্মশক্তি-হিসেবে প্রোটীনের মূল্য ঠিক শর্করার মতই (১ গ্রাম =৪'১ ক্যালরি)। কিন্তু অন্যভাবে প্রোটীন-জাতীয় খাদ্য, বিশেষভাবে দেহের বিপাকক্রিয়া বাড়িয়ে কতকটা অতিরিক্ত উত্তাপ উৎপাদনে সক্ষম বলে, শীতপ্রধান দেশে খাদ্যে প্রোটীনের পরিমাণ অবশ্যই কতকটা বেশি থাকা চাই।



প্রোটীন-জাতীয় খাদ্যোপাদান-সমূহ

দেহের ক্ষতিপূরণের প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রোটীন হতে কতকটা গ্লাইকোজেন এবং কতকটা চর্বিও দেহে তৈরী হতে পারে, এবং তাই যথাক্রমে সঞ্চিত থাকে

যকৃৎ ও পেশীতে কিংবা চামড়ার নীচে চর্বিরূপে। আবার দেহের পিটুইটারি, থাইরয়েড, অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির দ্বৈপিক অংশ প্রভৃতির উত্তেজক রস ও অন্যান্য নানা অত্যাবশ্যক উপাদান (রক্ত, দুধ প্রভৃতি) প্রোটীন হতেই উৎপন্ন হয় ব'লে দেহের স্বাভাবিকতা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে প্রোটীন না হলে কিছুতেই চলে না।

প্রোটীনের মধ্যে দুটি শ্রেণী আছে, যেমন (১) প্রাণিজ—মাংস, মাছ, দুধ, পনির, ডিম, প্রভৃতি। এ সকল প্রোটীন অনেকটা আমাদের দেহের প্রোটীনের মতই ব'লে এদের সাহায্যে দেহবৃদ্ধি ও তার ক্ষয়নিবারণ অতি সহজেই হয়। (২) উদ্ভিজ্জ—যেমন ডাল, শিম, বরবটি, ঈষ্ট, আলু, ভাত ও গমের প্রোটীন প্রভৃতি। আমাদের দেহের প্রোটীনের ঠিক অনুরূপ নয় ব'লে, এবং কতকটা দুষ্পাচ্য বলেও এগুলি সাধারণতঃ প্রাণিজ প্রোটীনের চেয়ে নিকৃষ্ট বিবেচিত হয়।

সকল প্রোটীনের পৌষ্টিক মূল্য আরো নানা কারণে বিভিন্ন হয়, যেমন দুধ ও ডিমের কুসুমে অন্যান্য প্রোটীনের সঙ্গে ফস্ফোপ্রোটীন (ছানা, ভাইটেলিন প্রভৃতি) থাকাতে শিশু, রোগী ও গর্ভবতী নারীর পক্ষে সেগুলি অত্যন্ত উপযোগী খাদ্য। ভুট্টার জীন নামক প্রোটীন এবং জিলেটিন খাদ্য-হিসেবে খুব ভাল প্রোটীন নয়। একই ভাবে অনেক ডালে প্রোটীনের পরিমাণ ঠিক মাংসের মত হলেও, মাংসের পরিবর্তে একই পরিমাণ ডাল খেলে শরীরে একই ভাবে কাজ হবে, এরূপ মনে করা ভুল, কারণ অধিক পরিমাণে ডাল খেলে পেটের অসুখ হতে পারে। ঈষ্টের প্রোটীন অনেকটা প্রাণিজ প্রোটীনের মতই মূল্যবান্। সব ডালের প্রোটীন কিন্তু আবার একই ভাবে পুষ্টিকর নয়, ডাল-হিসেবে ছোলা ও মুগ অন্যান্য ডাল অপেক্ষা কিছুটা ভাল। গমে সাধারণতঃ প্রোটীনের পরিমাণ চাল হতে শতকরা ৩—৬% বেশি বলে আগে ধারণা ছিল যে গম, চালের চেয়ে অনেক ভাল খাদ্য। কিন্তু সম্প্রতি গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে পরিমাণ-হিসেবে কম হলেও গুণ-হিসেবে অর্থাৎ পুষ্টিকারিতায় চালের প্রোটীন গমের প্রোটীন হতে অনেক উঁচু দরের। উদ্ভিজ্জ প্রোটীনের মধ্যে আলুর প্রোটীনেরও পৌষ্টিক মূল্য অন্যান্য সমশ্রেণীয় প্রোটীনের চেয়ে কতকটা বেশী।

বিভিন্ন বয়সের লোকের খাদ্যে প্রোটীনের পরিমাণ

একজন প্রাপ্ত বয়স্ক স্বাভাবিক পরিশ্রমী লোকের পক্ষে প্রতিদিন কতটা প্রোটীন খাওয়া আবশ্যক, তা' নিয়ে শারীর-বিজ্ঞানীদের মধ্যে বহুকাল ধরে

তর্কবিতর্ক হলেও বর্তমানে এই ধারণা যে প্রতিদিন ৯০—১০০ গ্রাম (অর্থাৎ তিন হতে চার আউন্স = দেড় ছটাক হতে আধপোয়া) আবশ্যক। এর মধ্যে অন্ততঃ তিনভাগের দুভাগ প্রাণিজ প্রোটীন হওয়া আবশ্যক। সেজন্য যারা নিরামিষ খান অর্থাৎ মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি খান না, তাদের পক্ষে প্রচুর দুধ খাওয়া আবশ্যক। যারা রুগ্ন নয় কিংবা যাদের দেহবৃদ্ধিও আর হবে না, তাদের পক্ষে কেবল দেহের ক্ষয়-ক্ষতিপূরণের জন্য প্রতি কিলোগ্রাম, অর্থাৎ প্রতি সের দৈহিক ওজনের জন্য, প্রতিদিন একগ্রাম প্রাণিজ প্রোটীনের চেয়ে কখনই কম খাওয়া উচিত নয়—অর্থাৎ দেড়মণ ওজনের কোন ব্যক্তির পক্ষে ৬০ গ্রাম অর্থাৎ দু' আউন্স = এক ছটাক ভাল প্রোটীন চাই-ই চাই।

ছোট ছোট ছেলেমেয়, গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মেয়েদের জন্য নিজের শরীর বৃদ্ধি ও গর্ভস্থ সন্তান কিংবা কোলের সন্তানের পুষ্টির জন্য কতকটা অধিক পরিমাণে প্রোটীন খাওয়া আবশ্যক। সেজন্য বয়স-হিসেবে নীচের তালিকা মত প্রোটীন প্রতিদিন খাওয়া আবশ্যক।

বয়স	দৈনিক প্রোটীনের পরিমাণ
২১ বছরের চেয়ে বেশী বয়স হলে	প্রতিসের দৈহিক ওজনের জন্য ১ গ্রাম
১৭ হতে ২১ বছর বয়স পর্যন্ত	" ১·৫ "
১৫ " ১৭ "	" ২ "
১২ " ১৫ "	" ২·৫ "
৫ " ১২ "	" ২·৭৫ "
৩ " ৫ "	" ৩ "
১ " ৩ "	" ৩·৫ "
০—৩ মাসের গর্ভবতী মেয়েদের পক্ষে	" ১ "
৪—৯ "	" ১·৫ "
সন্তানকে স্তন্যদাত্রী জননীর পক্ষে	" ২ "

বিভিন্ন উপাদানের উপকারিতা

দুধ

দুধ একটি অতি পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য। জন্মের পর মায়ের দুধই শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী খাদ্য ও পরেও অন্যান্য দুধ তার পক্ষে অত্যাবশ্যক কারণ তা অতি সহজে হজম হয় এবং পরিপুষ্টি ও দেহবৃদ্ধির অত্যাবশ্যক সব কিছু

উপাদান যেমন প্রোটীন, শর্করা, মাখন, ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাস-ঘটিত লবণ, ভাইটামিন এ ও ডি প্রভৃতি সবই দুধের মধ্যে আছে। মায়ের দুধ না থাকলে কিংবা মা মরে গেলে শিশুকে গাধার দুধ কিংবা গরুর দুধে জল ও অন্যান্য উপাদান মিশিয়ে মার দুধের মত করে নিয়ে খেতে দেওয়া যায়। পেট খারাপ করলে কখন কখন ছাগলের দুধও দেওয়া হয়। বয়স্ক লোকেরা গরু কিংবা মহিষের দুধ কিংবা তাহতে প্রস্তুত ক্ষীর, সর, ছানা, মাখন, পনীর, দই, ঘোল, রাবড়ী, রসগোল্লা, সন্দেশ এমনি কত কিছু পুষ্টিকর ও মুখরোচক খাবার খায় সুতরাং কোন দুধে কী উপাদান কতটা আছে, তা জানতে পারলে তাদের পৌষ্টিক মূল্য বিচার করা সম্ভবপর। সেজন্য তুলনামূলক ভাবে নীচে তাদের বিভিন্ন উপাদানের একটি তালিকা দেওয়া গেল।

বিভিন্ন দুধ	প্রোটীন%	স্নেহ-উপাদান%	শর্করা %	ধাতব লবণ %	জল %	ক্যালারি-মূল্য প্রতি১০০ গ্রাম
স্তন দুধ	১·৬	৩-৪	৬-৭	০·২-০·৩	৮৭·৫	৬৭·১
গরুর দুধ	২·৫-৩	৩·৫-৪	৪-৫	০·৬-০·৭	৮৭	৬৬·৮
মহিষের দুধ	৪·৫২	৮·২	৪·৬	০·৩৮	৮১·৫	১০৬·১
ছাগলের দুধ	২-২·৫	৩-৩·৫	৪-৫	০·৯	৮৭	৭১·৬
গাধার দুধ	১·৭৯	১·০২	৫·৫	০·৪২	৯০·১৭	৩৮·১

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মহিষের দুধই সকলের চেয়ে পুষ্টিকর, কিন্তু তার মধ্যে প্রোটীন ও মাখনের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী বলে, তা কখনই শিশুদের কিংবা যাদের পরিপাক-শক্তি কম তাদের পক্ষে উপযোগী নয়। ছাগলের দুধ আবার অনেকটা গরুর দুধের মতই, কেবল ধাতব লবণের পরিমাণ তাতে থাকে গরুর দুধের প্রায় দেড়গুণ। গাধার দুধ অনেকটা স্তন-দুধের মতই, কেবল স্নেহ-উপাদান আর ধাতব লবণ ছাড়া, প্রথমটী মায়ের দুধের দেড় হতে দ্বিগুণ বেশি। দুধে ভাইটামিনগুলির পরিমাণ নির্ভর করে পশুদের খাদ্য ও চরে খাওয়ার সুবিধের উপর। যে গরু রোদে মাঠে চরে কাঁচা ঘাস খেতে পায়, তার দুধে ভাইটামিন-গুলি থাকে বেশি, আর যেগুলি বাঁধা অবস্থায় শুধু শুখ্‌নো খড় আর ভুসি মাত্র খেতে পায় তাদের দুধে ভাইটামিনও খুব কম থাকে। কাঁচা ঘাস খেতে পেলে

তাদের দুধের রঙ হয় কতকটা হলদে, কেননা ঘাসের সবুজ উপাদান ক্লোরোফিল হতে, ভাইটামিন 'এ'র পূর্ববর্তী উপাদান কেরোটীন উৎপন্ন হয়ে দুধের সঙ্গে বেরিয়ে আসে বলেই দুধের রঙ ঐ রকম হয়। যে কোন একটি গরুর দুধ অপেক্ষা শিশুকে কয়েকটি গরুর দুধ একত্র মিশিয়ে তাহতে খানিকটে দুধ খেতে দেওয়াই ভাল, কারণ যদি কোন গরুর দুধে কোন একটি বিশেষ উপাদান কম থাকে তাহলে, অতি সহজেই অন্য দুধ হতে তার পূরণ হয়ে যায় একে অন্যের সাহায্যে, ঐ মেশানো দুধে। দুধকে অনেকক্ষণ জাল দিতে থাকলে কিংবা তাকে ঘন করে ক্ষীর করলে তার ভাইটামিনগুলি অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। আবার দুধের ছানা কেটে যখন সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতোয়া প্রভৃতি রসনা-তৃপ্তিকর খাবার তৈরী হয় তখন ছানার জলের সঙ্গে প্রচুর প্রোটীন, দুধের শর্করা, কিছুটা মাখন, ধাতব লবণ ও ভাইটামিনগুলিকে ফেলে দেওয়া হয়। সুতরাং কখনই এভাবে তা নষ্ট করা উচিত নয়। দুধকে যখন দই করা হয়, তখন তার মধ্যস্থ ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড ব্যাসিলাস্ নামক জীবাণু তার পরিপাককে অনেকটা সহজতর করে এবং সেকারণেই তাকে কতকটা অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্যে পরিণত করে।

দুধ একাই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্য অর্থাৎ প্রোটীন, শর্করা, স্নেহ, ধাতব লবণ ও ভাইটামিন প্রভৃতি, আমাদের দেহ-বৃদ্ধি, দেহের দৈনন্দিন ক্ষতিপূরণ, কর্মশক্তি লাভ, রোগের প্রতিষেধ প্রভৃতির জন্য যে সকল উপাদানের আবশ্যক তাদের সব ক'টিই উপযুক্ত পরিমাণে দুধে আছে। এজন্যই দুধ শিশু ও দুর্বল ব্যক্তির পক্ষে অপরিহার্য খাদ্য। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক একজন স্বাভাবিক পরিশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে কেবল দুধ পান করে বেঁচে থাকতে হলে, উপযুক্ত ক্যালরির জন্য প্রায় চার সের করে দুধ পান করতে হয়। তা যেমন সুবিধেজনক নয় তেমনি মূল্যের দিক হতেও অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্যও বটে।

ডিম—ডিমও দুধের মতই একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্য, কারণ এতেও দেহবৃদ্ধি, দেহ-রক্ষা ও স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য যা কিছু আবশ্যক, সে সকল উপাদানই আছে, তা সত্বেও একই কারণে অর্থাৎ অসুবিধে-জনক ও খরচও অত্যন্ত বেশী বলে শুধু ডিম খেয়ে জীবন-ধারণ করা প্রাপ্ত-বয়স্ক লোকের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

সাধারণতঃ আমরা হাঁস বা মুরগীর ডিমই খাই। আকারে হাঁসের ডিম মুরগীর ডিমের চেয়ে প্রায়শঃ বড় হলেও, কোন কোন জাতীয় মুরগীর ডিম আকারে হাঁসের ডিমের মতই কিংবা তার চেয়েও বড় হতে পারে।

ডিমের বাইরে একটি সাদা শক্ত ক্যাল্সিয়াম-ঘটিত খোসা থাকে, তাকে ভাঙলে প্রথমেই সাদা জেলির মত যে অংশ দেখা যায়, তার মধ্যে এল্বুমিন ও গ্লোবিউলিন নামে দুটি ভাল প্রোটীন থাকে। তারই মধ্যে কতকটা গোল যে হলদে অংশ বা কুসুম থাকে, তাতেই ফস্ফোপ্রোটীন ভাইটেলিন, স্নেহ-পদার্থ, ধাতব লবণ ও ভাইটামিনগুলি থাকে, এজন্য ডিমের কুসুমই সাদা অংশ অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর। ঐ অংশে ক্যাল্সিয়াম ও ফস্ফরাস-ঘটিত ধাতব লবণ এবং ভাইটামিন 'এ' থাকাতে, ডিম খাদ্য-হিসেবে দেহ-বৃদ্ধির পক্ষে খুবই উপযোগী খাদ্য।

ডিম বা তার অংশ	জল%	শর্করা%	স্নেহ%	ধাতব লবণ%
মুরগীর ডিম	৭৩.৭	১৩.৩	১৩.৩	১.০
হাঁসের ডিম	৭১.০	১৩.৫	১৩.৭	১.০
ডিমের কুসুম	৫৩.০	১৪.০	৩০.০	১.২
ডিমের সাদা অংশ	৮৭.০	১১.৫	—	১

ডিমকে কাঁচা, আধসিদ্ধ, পুরোপুরি সিদ্ধ, ডিমের কালিয়া, পোচ, অমলেট কিংবা পুডিং প্রভৃতিতেও খাওয়া যায়। কাঁচা অবস্থায় ডিমে যে গন্ধ থাকে, কয়েক মিনিট ফুটন্ত জলে ডিমকে ঢেকে রাখলে যখন আধসিদ্ধ হয়ে যায় তখন ঐ গন্ধ আর ততটা থাকে না। ডিম অধিক সিদ্ধ হয়ে যখন শক্ত হয়ে যায়, তখন আধসিদ্ধ ডিম অপেক্ষা তাকে হজম করা শক্ত হয়; কালিয়া-অবস্থায় ভাজা ডিম, অধিক মসলাপাতি-সহযোগে আরো দুষ্পাচ্য হয়ে উঠে। অমলেট কিংবা ঘিতে ভাজা পোচ অপেক্ষা জলে সিদ্ধ পোচ হজম করা অনেক সহজ। ডিমের দ্বারা পুডিং ও অন্যান্য মুখরোচক খাবারও প্রস্তুত হয়।

মাংস—প্রাণিজ প্রোটীন হিসেবে মাংস একটি অতি পুষ্টিকর প্রোটীন-জাতীয় খাদ্য। মাংস বলতে সাধারণতঃ মাংসের পেশী ও তৎসংলগ্ন হাড় এবং যকৃৎ, বৃক্ক, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি অংশ-বিশেষ বুঝায়। মাংসের মধ্যে আবার দুই শ্রেণী আছে, যেমন (১) লাল মাংস—পাঁঠা, খাসী, ভেড়া, শূয়র, হরিণ, গরু প্রভৃতির মাংস এ শ্রেণীর। (২) সাদা মাংস—যে কোন পাখীর এবং খরগোশের মাংস এ শ্রেণীভুক্ত।

লাল মাংসে পিউরিন-জাতীয় পদার্থ বেশী তৈরী হয় বলে, তাহতে ইউরিক

অ্যাসিড নামে যে অসার পদার্থ পরিণামে বেরিয়ে আসে, তা যদি কোন কারণে না বেরিয়ে পায়ের বা হাতের ছোট ছোট অস্থি সন্ধিগুলিতে জড় হতে থাকে তাহলে অতি বেদনাকর গেঁটে বাত রোগ জন্মায়। সাদা মাংসে কখনই সে রকম হয় না, এবং তার হজমও হয় লাল মাংসের চেয়ে অনেকটা সহজে।

আমাদের দেশে পাঁঠা ও ভেড়ার মাংসই লোকে বেশী পছন্দ করে, তারপরেই গোমাংস ও শূয়রের মাংস। এ সকল প্রাণীর মাংসের পুষ্টিকারিতা অনেকটা নির্ভর করে তাদের বংশ-মর্যাদা ও পুষ্টিকর খাদ্যের উপর। পাঁঠা ও ভেড়ার মাংসের প্রোটীন সাধারণতঃ খুব সহজ-পাচ্য এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে চর্বিও বেশ থাকে। প্রত্যেক মাংসেরই একটি নিজস্ব গন্ধ ও আস্বাদ আছে, যে জলে তাকে সিদ্ধ করা যায়, তাতেই নির্যাসরূপে তা বেরিয়ে আসে, এজন্যই ভিন্ন ভিন্ন মাংসের 'সূপ'-এ ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ পাওয়া যায়। দুম্বার ও খাসীর মাংসে চর্বি অত্যন্ত বেশী থাকে। পাঁঠা কিংবা ভেড়াকে ছোলা খাওয়ালে, তাদের মাংস যেমন বেশি হয়, তা আবার তেমনি পুষ্টিকরও হয়। সেজন্যই 'গ্রাম-ফেড' ভেড়ার মাংসের এত আদর! শূয়রের মাংসেও চর্বি ও প্রোটীন বেশি থাকে ব'লে গরুর মাংসের চেয়ে তা বেশী পুষ্টিকর। আমাদের দেশে গরু প্রায়ই ভাল খেতে পায় না ব'লে অক্ষম ও দুর্বল হয় এবং বংশ-মর্যাদায়ও বিলাতের কিংবা পশ্চিম ভারতের গরু অপেক্ষা তারা অনেক নিকৃষ্ট, এজন্য তাদের মাংসও খুব পুষ্টিকর নয়। হরিণের মাংসে চর্বি থাকে কম এবং নির্যাস থাকে বেশী, সেজন্য তা খেতে যেমন সুস্বাদু আবার তেমনি হজমও হয় সহজেই। একই ভাবে যে কোন বন্য পশু বা পাখীর মাংস গৃহ-পালিত পশু ও পাখীর মাংসের চেয়ে কতকটা চর্বিহীন হলেও, তাদের মাংস হজম হয় গৃহপালিত পশুর মাংস অপেক্ষা অনেকটা সহজে। গৃহপালিত পশুকে, বন্যদের তুলনায় অনেকটা ছুটাছুটি কম করতে হয় ব'লে, তার শরীরে বেশী চর্বি জমা হয়—কিন্তু তার মাংস আর তেমন সুপাচ্য থাকে না। শিকার-করা-মাত্র কিংবা কোন পশুকে কাটা-মাত্র তার মাংস খাওয়া উচিত নয়, কারণ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার পেশীগুলি মরণ-সংকোচের ফলে অনেকটা শক্ত হয়ে যায়। ঐ অবস্থায় মাংস সহজে সিদ্ধ হতে চায় না। মৃত্যুর আঠারো হতে চব্বিশ ঘণ্টা পরে, তা সহজেই সুসিদ্ধ হয় এবং খেতেও ভাল লাগে। তাই বলে গরম দেশে খুব বেশী সময় মাংসকে ফেলে রাখা উচিত নয় কারণ, তা পচে গিয়ে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যেতে পারে।

ডিমের বাইরে একটি সাদা শক্ত ক্যাল্‌সিয়াম-ঘটিত খোসা থাকে, তাকে ভাঙলে প্রথমেই সাদা জেলির মত যে অংশ দেখা যায়, তার মধ্যে এল্‌বুমিন ও গ্লোবিউলিন নামে দুটি ভাল প্রোটীন থাকে। তারই মধ্যে কতকটা গোল যে হলদে অংশ বা কুসুম থাকে, তাতেই ফস্‌ফোপ্রোটীন ভাইটেলিন, স্নেহ-পদার্থ, ধাতব লবণ ও ভাইটামিনগুলি থাকে, এজন্য ডিমের কুসুমই সাদা অংশ অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর। ঐ অংশে ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাস-ঘটিত ধাতব লবণ এবং ভাইটামিন 'এ' থাকাতে, ডিম খাদ্য-হিসেবে দেহ-বৃদ্ধির পক্ষে খুবই উপযোগী খাদ্য।

ডিম বা তার অংশ	জল%	শর্করা%	স্নেহ%	ধাতব লবণ%
মুরগীর ডিম	৭৩·৭	১৩·৩	১৩·৩	১·০
হাঁসের ডিম	৭১·০	১৩·৫	১৩·৭	১·০
ডিমের কুসুম	৫৩·০	১৪·০	৩০·০	১·২
ডিমের সাদা অংশ	৮৭·০	১১·৫	—	১

ডিমকে কাঁচা, আধসিদ্ধ, পুরোপুরি সিদ্ধ, ডিমের কালিয়া, পোচ, অমলেট কিংবা পুডিং প্রভৃতিতেও খাওয়া যায়। কাঁচা অবস্থায় ডিমে যে গন্ধ থাকে, কয়েক মিনিট ফুটন্ত জলে ডিমকে ঢেকে রাখলে যখন আধসিদ্ধ হয়ে যায় তখন ঐ গন্ধ আর ততটা থাকে না। ডিম অধিক সিদ্ধ হয়ে যখন শক্ত হয়ে যায়, তখন আধসিদ্ধ ডিম অপেক্ষা তাকে হজম করা শক্ত হয়; কালিয়া-অবস্থায় ভাজা ডিম, অধিক মসলাপাতি-সহযোগে আরো দুষ্পাচ্য হয়ে উঠে। অমলেট কিংবা ঘিতে ভাজা পোচ অপেক্ষা জলে সিদ্ধ পোচ হজম করা অনেক সহজ। ডিমের দ্বারা পুডিং ও অন্যান্য মুখরোচক খাবারও প্রস্তুত হয়।

মাংস—প্রাণিজ প্রোটীন হিসেবে মাংস একটি অতি পুষ্টিকর প্রোটীন-জাতীয় খাদ্য। মাংস বলতে সাধারণতঃ মাংসের পেশী ও তৎসংলগ্ন হাড় এবং যকৃৎ, বৃক্ক, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি অংশ-বিশেষ বুঝায়। মাংসের মধ্যে আবার দুই শ্রেণী আছে, যেমন (১) লাল মাংস—পাঁঠা, খাসী, ভেড়া, শূয়র, হরিণ, গরু প্রভৃতির মাংস এ শ্রেণীর। (২) সাদা মাংস—যে কোন পাখীর এবং খরগোশের মাংস এ শ্রেণীভুক্ত।

লাল মাংসে পিউরিন-জাতীয় পদার্থ বেশী তৈরী হয় বলে, তাহতে ইউরিক

অ্যাসিড নামে যে অসার পদার্থ পরিণামে বেরিয়ে আসে, তা যদি কোন কারণে না বেরিয়ে পায়ের বা হাতের ছোট ছোট অস্থি সন্ধিগুলিতে জড় হতে থাকে তাহলে অতি বেদনাকর গেঁটে বাত রোগ জন্মায়। সাদা মাংসে কখনই সে রকম হয় না, এবং তার হজমও হয় লাল মাংসের চেয়ে অনেকটা সহজে।

আমাদের দেশে পাঁঠা ও ভেড়ার মাংসই লোকে বেশী পছন্দ করে, তারপরেই গোমাংস ও শূয়রের মাংস। এ সকল প্রাণীর মাংসের পুষ্টিকারিতা অনেকটা নির্ভর করে তাদের বংশ-মর্যাদা ও পুষ্টিকর খাদ্যের উপর। পাঁঠা ও ভেড়ার মাংসের প্রোটীন সাধারণতঃ খুব সহজ-পাচ্য এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে চর্বিও বেশ থাকে। প্রত্যেক মাংসেরই একটি নিজস্ব গন্ধ ও আস্বাদ আছে, যে জলে তাকে সিদ্ধ করা যায়, তাতেই নির্যাসরূপে তা বেরিয়ে আসে, এজন্যই ভিন্ন ভিন্ন মাংসের 'সূপ'-এ ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ পাওয়া যায়। দুম্বার ও খাসীর মাংসে চর্বি অত্যন্ত বেশী থাকে। পাঁঠা কিংবা ভেড়াকে ছোলা খাওয়ালে, তাদের মাংস যেমন বেশি হয়, তা আবার তেমনি পুষ্টিকরও হয়। সেজন্যই 'গ্রাম-ফেড' ভেড়ার মাংসের এত আদর! শূয়রের মাংসেও চর্বি ও প্রোটীন বেশি থাকে ব'লে গরুর মাংসের চেয়ে তা বেশী পুষ্টিকর। আমাদের দেশে গরু প্রায়ই ভাল খেতে পায় না ব'লে অক্ষম ও দুর্বল হয় এবং বংশ-মর্যাদায়ও বিলাতের কিংবা পশ্চিম ভারতের গরু অপেক্ষা তারা অনেক নিকৃষ্ট, এজন্য তাদের মাংসও খুব পুষ্টিকর নয়। হরিণের মাংসে চর্বি থাকে কম এবং নির্যাস থাকে বেশী, সেজন্য তা খেতে যেমন সুস্বাদু আবার তেমনি হজমও হয় সহজেই। একই ভাবে যে কোন বন্য পশু বা পাখীর মাংস গৃহ-পালিত পশু ও পাখীর মাংসের চেয়ে কতকটা চর্বিহীন হলেও, তাদের মাংস হজম হয় গৃহপালিত পশুর মাংস অপেক্ষা অনেকটা সহজে। গৃহপালিত পশুকে, বন্যদের তুলনায় অনেকটা ছুটাছুটি কম করতে হয় ব'লে, তার শরীরে বেশী চর্বি জমা হয়—কিন্তু তার মাংস আর তেমন সুপাচ্য থাকে না। শিকার-করা-মাত্র কিংবা কোন পশুকে কাটা-মাত্র তার মাংস খাওয়া উচিত নয়, কারণ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার পেশীগুলি মরণ-সংকোচের ফলে অনেকটা শক্ত হয়ে যায়। ঐ অবস্থায় মাংস সহজে সিদ্ধ হতে চায় না। মৃত্যুর আঠারো হতে চব্বিশ ঘণ্টা পরে, তা সহজেই সুসিদ্ধ হয় এবং খেতেও ভাল লাগে। তাই বলে গরম দেশে খুব বেশী সময় মাংসকে ফেলে রাখা উচিত নয় কারণ, তা পচে গিয়ে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যেতে পারে।

মাংসকে আমরা ঝোল, রোষ্ট্, চপ, কাটলেট, শিক-কাবাব, পোলাও প্রভৃতি নানা ভাবে রান্না করে, মুখরোচক করে খাই। খুব বেশী তেল-ঘি, মসলাপাতি কিংবা গরম মসলা ব্যবহার করলে মাংস খেতে ভাল হয় বটে কিন্তু তার সুপাচ্যতাও অনেকটা নষ্ট হয়ে যায় এবং তার নিজস্ব গন্ধ ও স্বাদ খুবই কম থাকে। কড়া ও রোষ্ট, শিক-কাবাব, চপ. কাটলেট প্রভৃতি এবং অন্যভাবে কড়া-ভাজা মাংসও হজম করা অত্যন্ত শক্ত।

এক ভাইটামিন বি, ছাড়া মাংসে আর বিশেষ কোন ভাইটামিনই থাকে না। মাংসের প্রোটীন অনেকটা আমাদের শরীরের প্রোটীনের অনুরূপ বলে দেহের ক্ষতি-নিবারণ ও দেহ-বৃদ্ধির পক্ষে খুবই উপযোগী। ভাল রান্না করা মাংসের গন্ধে ও স্বাদে খিদে যেমন হয়, আবার হজমও হয় সহজে এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠে; তাহলেও ঐ ক্রিয়াগুলি খুবই ক্ষণস্থায়ী। সর্বদা বেশী মাংস খেলে বৃক্কের উপর বিশেষ চাপ পড়াতে, তার অক্ষমতা দেখা দিতে পারে, এবং বৃক্কপ্রদাহ, গেঁটে বাত প্রভৃতি রোগ দেখা দিতে পারে। অধিক মাংস খাওয়ার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মায়, সেজন্য মাংসের সঙ্গে প্রচুর ফলমূল ও শাকপাতা-জাতীয় তরকারি খেতে হয়। মাংস হতে বিপাক-ক্রিয়ার বৃদ্ধির জন্য যে অনেকটা উত্তাপের উৎপত্তি হয়, সেকথা আগেই বলা হয়েছে, সেজন্য গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে বা গ্রীষ্মকালে কোন দেশেই বেশী মাংস খাওয়া উচিত নয়। মাংস পচে গেলে, জীবাণুদের দ্বারা তার মধ্যে 'টমেইন' (ptomain) নামে এক প্রকার মারাত্মক বিষের সৃষ্টি হয়, তা খেলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে, এজন্যই টিনের কৌটায় পাওয়া যায় যে 'রক্ষিত মাছ বা মাংস' তা কখনই খাওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া রুগ্ন পশুর দেহের মাংস হতে কোন কোন রোগের জীবাণুও মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে, যক্ষার জীবাণু, গোমাংস ও শূয়রের মাংস হতে ফিতে ক্রিমি প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত। প্রাণীদের যকৃতে প্রচুর ভাইটামিন 'এ', ফলিক অ্যাসিড, লোহা, ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি থাকাতে কাঁচা ও রান্না করা অবস্থায় যকৃৎ খেলে রক্তশূন্যতা দূর হয় বটে, কিন্তু সর্বদা বেশী পরিমাণে যকৃৎ, বৃক্ক, অগ্ন্যাশয় প্রভৃতি খেলে, তাদের মধ্যে প্রচুর পিউরিন উপাদান থাকাতে, গেঁটে বাত রোগ দেখা দিতে পারে।

নীচে তুলনামূলক ভাবে বিভিন্ন মাংসের উপাদানগুলি দেওয়া গেল :—

বিভিন্ন মাংস	প্রোটীন %	শর্করা %	চর্বি %	লবণ %
ছাগ মাংস	১৮·৫	০·৫	৪	১
ভেড়ার মাংস	১৯	০·৫	৩	১
শূয়রের মাংস	২০	০·৬	৬·২	১·১
গরুর মাংস	২০	০·৬	১·৫	১·২
মুরগীর মাংস	২২·৭	১·৩	২	১

মাছ—বাঙালীর খাদ্যে প্রাণিজ প্রোটীনের বেশীভাগই আসে মাছ হতে। মাছে যেমন সহজ-পাচ্য ও আমাদের দেহগঠনোপযোগী প্রোটীন থাকে, আবার তেমনি কতকটা তেল, ধাতব লবণ এবং নানারকমের ভাইটামিনও (ভাইটামিন 'সি' ছাড়া) থাকে ব'লে, তা খুবই পুষ্টিকর খাদ্য। সামুদ্রিক মাছে আবার আয়োডিন-ঘটিত লবণ থাকাতে, তার খাদ্য-মূল্য আরো বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে আমরা সাধারণতঃ নদী, নালা, বিল ও পুকুরের এবং সময়ে সময়ে ইলিশ, ভেটকি প্রভৃতি নদীর মোহানার মাছ খাই। এদের মধ্যে দু'রকমের মাছ দেখতে পাওয়া যায়, (১) তেলহীন, যেমন—শোল, ল্যাটা, কই, মাগুর প্রভৃতি এবং (২) তেলপূর্ণ যেমন—ইলিশ, রুই, কাতলা, মহাশোল, মৃগেল প্রভৃতি। প্রথম শ্রেণীর মাছে জল থাকে শতকরা ৭৫—৮৫ ভাগ। প্রোটীন ১২—২৫ ভাগ, স্নেহ ০·৮ হতে ৩ ভাগ এবং ধাতব লবণ ১—১·৭৫ ভাগ মাত্র, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মাছে জল থাকে শতকরা ৭৫—৮০ ভাগ, প্রোটীন ১০—২৪ ভাগ, স্নেহ ৫—১২ ভাগ এবং ধাতব লবণ ০·৫—২ ভাগ মাত্র।

নীচে কতকগুলি সাধারণ মাছের প্রোটীন, স্নেহ ও ধাতব লবণের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে দেওয়া গেল।

মাছ	প্রোটীন %	স্নেহ %	ধাতব লবণ %
রুই	১৮·৩৫	৭·৫৫	১·৪০
ভেটকি	১৬·২৫	৪·১০	০·৮৫
ইলিশ	১৪·৮৫	৯·২০	০·৯৫
মাগুর	১৯·৫০	০·৫০	১·৩০
কই	১৭·৭৫	০·৪৫	১·০০
ট্যাংরা	১৭·৩০	০·৩০	১·১০

ট্যাংরা, খলসে, পুঁটি, মৌরলা প্রভৃতি ছোট মাছগুলি তৈলহীন শ্রেণীর অন্তর্গত বলে এদের হজম করা সহজ, কিন্তু পাকা রুই, মৃগেল, কাতলা, মহাশোল, ইলিশ প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাছে তেল বেশী থাকে বলে, অসুস্থ কিংবা যাদের পরিপাক-শক্তি কম, তাদের পক্ষে হজম করা শক্ত। কিন্তু এ সকল মাছ শুধু খেতেই যে ভাল এমন নয়, তাদের যকৃতের তেলে ভাইটামিন 'এ' থাকাতে তারা অনেক অধিক পুষ্টিকরও ব'টে।

কই, মাগুর, শিঙ্গী, শোল, গজাল, ল্যাটা প্রভৃতি মাছকে জল হতে উঠিয়ে নিলে অন্যান্য মাছের মত তখনই মরে যায় না কারণ, জল হ'তে অক্সিজেন নেবার জন্য তাদের যেমন কানকোর নীচে ফুলকা থাকে, আবার তেমনি ফুস্ফুসও আছে। এজন্যই তোলা-জলে কয়েকদিন তাদের বাঁচিয়ে রাখা যায় ব'লে তাদের নাম 'জীয়ল মাছ'। আবার এদের মধ্যে তেল খুবই কম থাকে বলে, এদের হজম করা সহজ, সেজন্য এ মাছগুলিই রোগীর পথ্যের পক্ষে প্রশস্ত।

গলদা চিংড়ী, বাগদা চিংড়ী, কাঁকড়া, অয়েষ্টার প্রভৃতি জলজ-প্রাণী বলে আমাদের খাদ্য-তালিকায় স্থান পেলেও, তারা মাছ নয়, সুতরাং তাদের হজম করা খুবই শক্ত। অনেকের আবার ঐগুলি সহ্য হয় না, কেননা খেলেই আমবাত বা অন্যান্য কষ্টকর লক্ষণ দেখা দেয়। আবার কোন কোন চিংড়ী বা কাঁকড়ার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আর্সেনিক থাকাতে, ঐরূপ খাদ্য খাওয়ার ফলে লোক

মারা গেছে, এরূপও শুনতে পাওয়া যায়। সুতরাং ঐগুলি যতদূর সম্ভব কম খাওয়া উচিত।

মাছ পচে গেলে তা কখনই খাওয়া উচিত নয়। একইভাবে মাংসের মত টিনের কৌটায় সংরক্ষিত মাছও কখনই খাওয়া উচিত নয়—কেননা 'টমেইন' বিষের ক্রিয়ার ফলে স্বাস্থ্য নষ্ট কিংবা মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

বাদাম-জাতীয় ফসল

এ শ্রেণীর ফল সাধারণতঃ শুখ্‌নো ফলরূপেই খাওয়া হয়। একটি অতি শক্ত খোসার নীচে এদের যে শাঁস থাকে, তাকে খোসাকে ভেঙ্গে বের করে খেতে হয়। অন্যান্য ফলের তুলনায় এ জাতীয় ফলে অনেক বেশী স্নেহ (বা উদ্ভিজ্জ তেল) এবং প্রোটীন থাকে, কিন্তু শর্করা থাকে খুবই কম। তার উপর তাদের মধ্যে থাকে প্রচুর ভাইটামিন বি$_1$, সি, কেরোটিন ও নানা ধাতব লবণ। সেজন্য খাদ্য-হিসেবে তাদের মূল্য অন্যান্য ফলের চেয়ে অনেক বেশী। যদিও এদের প্রোটীন মাংস বা মাছের প্রোটীনের মত এত ভাল নয়, তাহলেও এগুলি ডাল বা অন্যান্য উদ্ভিজ্জ প্রোটীন অপেক্ষা অনেকটা সুপাচ্য—কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলি প্রাণিজ প্রোটিন অপেক্ষা শ্রেয়ঃ কারণ এগুলি হতে খুবই কম হানিকর অসারবস্তু শরীরে তৈরী হয় বলে দেহের পক্ষে এগুলি মোটেই অনিষ্টকর নয়। কাঁচা-অবস্থায় চিবিয়ে খেলে তাদের হজম করা খুব সহজ নয়, কিন্তু গুড়ো করে, কুচিয়ে নিয়ে কিংবা পিষে নিলে হজম করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। আবার ঐভাবে রান্না করলে, মালাইকারী কিংবা অন্যভাবে তরকারিতে দিয়ে সিদ্ধ করে নিলে, তাদের ছিবড়েগুলি নরম হয়ে যায় ব'লে হজম করা শক্ত হয় নয় না। তা সত্ত্বেও এগুলি বেশি খাওয়া উচিত নয় কারণ অত্যধিক প্রোটীন ও স্নেহ, এবং সঙ্গে সঙ্গে শক্ত ছিবড়ে থাকাতে, পেটের গোলমাল হতে পারে। বাদাম, আখরোট, নারকেল প্রভৃতি এ জাতীয় ফল।

বাদাম—বাদামের শাঁসে প্রোটীন ও স্নেহ ছাড়া যথেষ্ট পরিমাণে লোহা, ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস, ও পটাশিয়াম-ঘটিত লবণ এবং কতকটা ভাইটামিন বি, ও কেরোটিন আছে। খুব ভাল করে চিবিয়ে কিংবা পিষে না খেলে বাদামকে হজম করা খুবই শক্ত। মিষ্টি বাদাম হতে যে তেল পাওয়া যায় তা ক্ষতিকর নয় এবং চামড়ার প্রদাহও ঘটায় না, কিন্তু তেতো বাদামের তেলে অতি মারাত্মক বিষ হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড থাকে। তেলকে জ্বাল দিয়ে নিলে ঐ অ্যাসিডটি গ্যাসের আকারে বেরিয়ে যায় এবং তা নির্দোষ হয়ে যায়।

আখরোট—কতকটা সহজে হজম হয় ব'লে এবং বাদামের চেয়ে ভাইটামিন বি, ও কেরোটিনের পরিমাণও বেশী ব'লে, এটি অধিকতর পুষ্টিকর ফল। এতে ধাতব লবণ বিশেষত লোহা-ঘটিত লবণ থাকাতে রক্তাল্পতা দূর হয়।

নারিকেল—এর মধ্যে প্রচুর তেল ও শক্ত ছিবড়ে থাকাতে, খেতে ভাল লাগলেও নারকেলের শাঁস হজম করা খুব সহজ নয়। কিন্তু কচি অবস্থায় নারকেলে যে এন্‌জাইম জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে থাকে তার দ্বারা মাংস, চিংড়ীমাছ প্রভৃতির পরিপাক কতকটা সহজ হয়। এজন্যই মাংসের কিংবা, চিংড়ী মাছের মালাই-কারী (যাতে নারিকেলের দুধ দেওয়া হয়) হজম করা খুব শক্ত হয় না। এর মধ্যে কিছু কিছু ভাইটামিন বি, ও সিও থাকে। নারকেলের তেলে যে বিশেষ স্নেহজ অ্যাসিড থাকে, তাতে অন্ত্রের মধ্যে গ্যাস তৈরী হতে পারে, এজন্য রান্নাবান্নার জন্য নারকেলের তেল খুব ভাল উপাদান নয়, যদিও ঐ তেল কিংবা তা হতে প্রস্তুত 'ককো জেম' ভারতবর্ষের নানাস্থানে রান্নার জন্য ব্যবহৃত হয়। অল্প পরিমাণে অঙ্কুরিত ছোলা বা মুগ, কুরানো নারিকেল ও গুড়সহ, অতি মুখরোচক ও পুষ্টিকর খাদ্য।

কাঁচা অবস্থায় নারকেলকে ডাব বলে। শাঁস হাওয়ার আগে ডাবের জলে যথেষ্ট শর্করা, সামান্য প্রোটীন ও স্নেহপদার্থ, ধাতবলবণ, ভাইটামিন বি, ও কেরোটিন থাকাতে ডাবের জল অতি স্নিগ্ধ ও উপাদেয় একটি পানীয়।

চীনেবাদাম—চীনেবাদাম একই শ্রেণীভুক্ত খাদ্য হলেও দামে সকলের চেয়ে সস্তা। এর খোসাও খুব শক্ত নয়, এবং হাত দিয়েই তা ছাড়ানো যায়। চীনেবাদাম হজম করা শক্ত হলেও, গরীবের পক্ষে তা হতেই কতকটা স্নেহ-উপাদান লাভ হতে পারে। গুড়সহ পাক দিয়ে নিলে চীনেবাদামকে হজম করা কতকটা সহজ হয়। কিন্তু কোন অবস্থাতেই চীনেবাদাম কাঁচা, ভাজা কিংবা তরকারিতেও বেশি খাওয়া উচিত নয়, কারণ তাতে পেটের অসুখ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয় ; আবার তাতে যকৃৎও খারাপ হতে পারে। চীনে-বাদামের মধ্যেও অল্প পরিমাণে ভাইটামিন বি, ও কেরোটিন আছে। চীনে-বাদামের তেল স্বাভাবিক অবস্থায় হজম করা যায় না, কিন্তু হাইড্রোজেন-সংযোগে তাকে খাওয়ার উপযোগী সহজপাচ্য করে নেওয়া যায়। আজকাল বাজারে 'ভেজিটেবল ঘি' বলে যা' পাওয়া যায় (দালদা, বনস্পতি, রসুই, পকাও প্রভৃতি) তারা হয় হাইড্রোজেন-সংযোগে নির্দোষিত ও সুপাচ্যীকৃত চীনেবাদাম কিংবা কাপাস-বীচির তেল ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐগুলির খাদ্য-হিসেবে

ব্যবহারে, স্নেহ-উপাদানের ক্যালরি-মূল্য ছাড়া আর কিছু পাওয়া সম্ভবপর নয়। অতিরিক্ত পরিমাণে না খেলে এগুলি শরীরের পক্ষে খুব হানিকরও নয়।

ডাল—মাছ ও ভাতের পরে ডালই বাঙ্গালীদের আর একটি প্রধান খাদ্য। মসুর, মুগ, ছোলা, মটর, অড়হর, কলাই প্রভৃতি ডালের কোনটি না কোনটি আমাদের দেশে প্রত্যহ খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত থাকে। ডালকে খুব ভাল করে সিদ্ধ করে নিলে তার নিজস্ব সুবাস ও আস্বাদ ভাল করে পাওয়া যায়। সিদ্ধ করে ডালকে তেল বা ঘিতে পাঁচফোড়ন কিংবা পেঁয়াজ-লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে সম্বার দিলে খেতে খুব ভাল হয়। তা ছাড়া ডাল বেটে ধোকা, বড়ি, বা পাঁপররূপেও খাওয়া যায়। মুগ, ছোলা, মটর প্রভৃতি ডালকে অঙ্কুরিত অবস্থায় আদা, লবণ, ও কাঁচালঙ্কা সহযোগে অল্প পরিমাণে খেতে বেশ ভাল লাগে, আবার ঐ অবস্থায় তাতে ভাইটামিন 'বি', ও 'সি' প্রচুর থাকে ব'লে তার খাদ্যমূল্য অনেকটা বেড়ে যায়, কিন্তু সিদ্ধ অবস্থায়ই ডাল যখন হজম করা শক্ত, তখন কাঁচা অবস্থায়ও তা কমই খাওয়া উচিত, তা না হলে পেটের অসুখ হতে পারে। কোন কোন ডালে, যেমন মসুর ডালে প্রোটীনের পরিমাণ অনেকটা মাংসের প্রোটীনের মতই, এজন্য তাকে বলা হয় "ভারতীয় গোমাংস" (Indian beef)। বোধ হয় এজন্যই বাংলা-দেশের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরা ও হিন্দুঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবারা অন্য সব ডাল খেলেও মসুর ডালকে অস্পৃশ্য মনে করেন। আগেই বলা হয়েছে যে ডালের প্রোটীন পরিমাণে বেশ কিছু হলেও, তা খুব সুপাচ্য নয়। আবার তাদের মধ্যে কাঁচামুগ ও কাঁচা কলাইই কতকটা সহজে হজম হয় এবং এ দুটি ডাল পাকস্থলীতে কম অম্ল সৃষ্টি করে বলে, তাদের রোগীর পথ্যেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অড়হর ও ছোলা, হজম করা শক্ত হলেও ঘি বা মাখন সহযোগে রান্না করলে কতকটা সহজপাচ্য হয়। ডালের মধ্যে পরিপুষ্টি, সহজপাচ্যতা, ও অন্যান্য গুণ-বিবেচনায় ছোলা ও মুগই সবচেয়ে ভাল এবং খেসারী সবচেয়ে নিকৃষ্ট। খেসারী ডালে আবার অনেক সময় আক্‌তা নামে একপ্রকার বীজ মেশানো থাকাতে, সর্বদা খেসারী ডাল খেলে, পা দুর্বল হওয়াতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয়, এম্নি ল্যাথিরিজম্ নামে একটি রোগ হতে পারে। ভাত কিংবা রুটির সঙ্গে ডালের পরিমাণ কখনই চার ভাগের একভাগ অপেক্ষা বেশী হওয়া উচিত নয়। সর্বদা মটরের ডাল খেলে ছেলে-পুলে কম হয়, কোন কোন বিজ্ঞানী এরূপ মনে করেন।

ডাল ও চালকে একসঙ্গে সিদ্ধ করে নিলে যে খিচুড়ী হয় তা শুধু ডাল-ভাতের চেয়ে অনেক বেশী গুরুপাচ্য। ছোলাকে যাঁতায় পিষে নিলে যে বেসন হয় তাদিয়ে অনেক মুখরোচক খাদ্য তৈরী হয়। কলাই, মসুর, খেসারী প্রভৃতি

ডালকে বেটে বড়ি দেওয়া হয়, তাদের রোদে শুকিয়ে নিতে হয় ; আবার বাটা ডালকে ভেজে ধোকা তৈরী হয়। এগুলির সাহায্যে তরকারি রান্না করলে খেতে ভাল লাগে এবং প্রোটীন-জাতীয় পুষ্টিকর উপাদানও কতকটা খাওয়া হয়। মুগ প্রভৃতি ডালকে বেটে, কিছু সোডা-বাই-কার্ব মিশিয়ে যেভাবে আমের রস হতে আমসত্ত্ব প্রস্তুত হয়, ঠিক সেভাবেই পাঁপর প্রস্তুত করা হয়। রোদে শুকোতে শুকোতে ঐ সোডা-বাই-কার্বের প্রভাবে ডাল কতকটা সুপাচ্যতা লাভ করে, এবং তার নিজস্ব ঘ্রাণ ও স্বাদ অনেকটা প্রাধান্য লাভ করে। পাঁপরকে সেঁকে কিংবা তেল ঘিতে ভেজেও খাওয়া যায়। শেষোক্ত অবস্থায় যদিও তা অধিকতর মুখরোচক হয় তাহলেও সেঁকা অবস্থায় তা' যেমন সুপাচ্য থাকে তেমনটি থাকে না। সুতরাং পাঁপরকে তেল বা ঘিতে না ভেজে ঢিমে আঁচে সেঁকে খাওয়াই ভাল। আবার থাসা ময়দার লেচিকে বেলবার সময়ে মাঝখানে ডালবাটা দিয়ে যে ডালপুরি এবং মধ্যে কড়াইশুঁটির পুর দিয়ে কিংবা বেলবার সময়ে একই সঙ্গে কড়াইশুঁটির পুর মিশিয়ে নানা রকমের কচুরী তৈরী হয়, সেগুলিও খুব উপাদেয় পুষ্টিকর খাদ্য। কড়াইশুঁটি, অর্থাৎ কাঁচা মটরের বীচি অন্যান্য তরকারির সঙ্গে খেতে বেশ লাগে, এবং ভাজা অবস্থায় ঘুঘনীর আকারেও তা খুব মুখরোচক খাদ্য। তা ছাড়া কাঁচা শিমের বা পাকা শিমের শুখ্‌নো বীচিও ডাল রূপে খাওয়া যায়, কেননা শিম ও ডাল একশ্রেণীরই উদ্ভিদ হতে উৎপন্ন হয়। বরবটি, ফ্রেঞ্চ বীন বা ফরাসও ঐ শ্রেণীরই অন্তর্গত।

প্রশ্ন

(১) স্নেহ জাতীয় খাদ্যের সঙ্গে শর্করা-জাতীয় খাদ্যের ক্রিয়ার তুলনা কর।

(২) দুধ ও ডিমকে স্বয়ং সম্পূর্ণ খাদ্য বলা হয় কেন ?

(৩) আমাদের কোন কোন খাদ্যে দেহের ক্ষতিপূরণের জন্য উপযুক্ত প্রোটীন আছে ?

(৪) অন্যান্য ফলের সঙ্গে বাদাম জাতীয় ফলের খাদ্য মূল্য তুলনা কর।

সরল গার্হস্থ্য বিদ্যা

[অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য]

প্রথম অধ্যায়

বাসগৃহ

গৃহপরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ

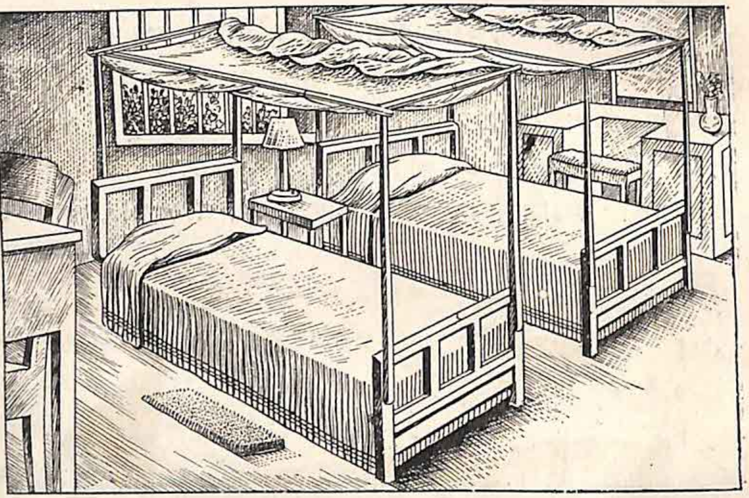
বাড়ীর বিভিন্ন অংশ, উঠান, বাগান প্রভৃতি কোথায় হবে এবং কি ভাবে হবে, সে কথা সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে। বাড়ী কাঁচাই হোক আর পাকাই হোক, তা হবে উঠান হতে বেশ কিছু উঁচু। পাকা মেঝে থাকলে একটু নীচু হলেও তত ক্ষতি নেই, কিন্তু মাটির মেঝে অন্ততঃ দুহাত উঁচু হওয়া চাই। কাঁচা বাড়ী হলে খড়ের চালই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, কারণ এতে



আদর্শ কাঁচা বাড়ী

গরমের সময় যেমন গরম কম লাগে, আবার শীতকালে তেমনি শীতও বোধ হয় কম। টিনের কিংবা টাইলের চাল হলে গরমের সময় খুব কষ্ট হয়, সেজন্য সেগুলির নীচে কাঠের কিংবা অন্য কিছুর ছাদের ব্যবস্থা থাকলেই ভাল হয়। প্রত্যেকটি ঘরের পূব ও দক্ষিণ দিক যাতে খোলা থাকে, সেরকম পরিকল্পনা করা চাই, কারণ প্রতি ঘরে প্রচুর আলো, রোদ ও হাওয়া যাতে ঢুকতে পারে তার জন্যই

এরূপ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। প্রতি ঘরে মুখোমুখি বসান হবে বড় বড় দরজা ও জানালা, যাতে একদিক হতে অন্যদিকে মুক্তবায়ুর সঞ্চালন হতে পারে। প্রতি ঘরের সঙ্গে পূব বা দক্ষিণ দিকে বড় বড় দু-একটি বারান্দা থাকলে ভাল হয়। ঘরগুলিও বেশ খোলা-মেলা, বড় এবং উঁচু হওয়া চাই। শয়ন ঘরে প্রতি লোকের জন্য অন্ততঃ এক হাজার ঘনফুট স্থান থাকা অত্যাবশ্যক। এক ঘরে কখনই তিন বা চার জনের বেশী লোকের রাত্রিবাস করা উচিত নয়। ঘরের উচ্চতা যদি ১২ ফুট হয়, তাহলে চার জনের বাসের উপযোগী ঘরের মেঝে অবশ্যই হবে $\frac{১০০০ \times ৪}{১২}$ = ৩৩৩ বর্গফুট অর্থাৎ ঘরটি হবে চৌকো ১৮ ফুট লম্বা ও চওড়া, কিংবা

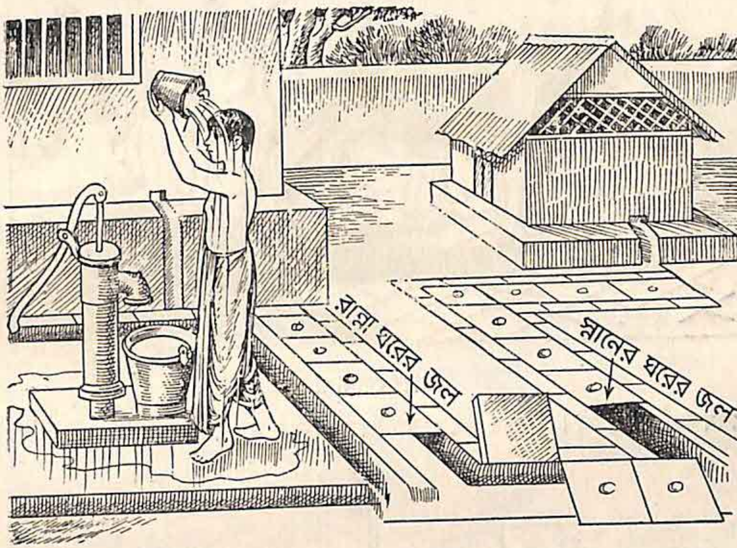


আদর্শ শয়ন ঘর

২১ ফুট লম্বা ও ১৬ ফুট চওড়া। এর কম হলে কিছুতেই তা স্বাস্থ্যের অনুকূল হবে না। শয়ন ঘরে বাক্স-তোরঙ্গ, আলনা, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি যত কম থাকে ততই ভাল। শয়ন ঘরের পাশেই স্নানের ঘরের পাকা মেঝে এমন হওয়া চাই, যাতে সেখানে জল একেবারেই না দাঁড়িয়ে ড্রেন বেয়ে নীচের নরদমায় চলে যেতে পারে।

বাড়ীর উঠানের মাঝখান হবে উঁচু ও তার চারদিক হবে নীচু, যাতে জল আপনি গড়িয়ে নরদমায় গিয়ে পড়তে পারে। নরদমাগুলি ক্রমশঃ একদিক হতে ঢালু হয়ে নীচে নেমে যাবে বাড়ীর উত্তর-পশ্চিমের কোণে, যাতে জল আপনি নীচে নেমে যেতে পারে। রান্নাঘরের তরল আবর্জনা এবং স্নানের ঘরের জলও এভাবেই নীচে নেমে যাবে। বাড়ীতে যদি গোশালা থাকে, তা পুকুর কিংবা জলাশয়

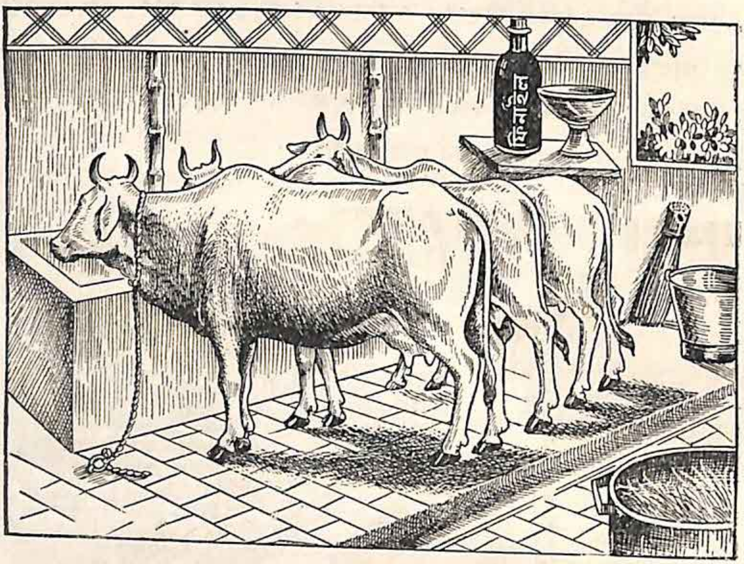
হতে অন্ততঃ ত্রিশ ফুট দূরে থাকবে এবং তার পাকা নরদমাও ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গিয়ে ঐ বড় নরদমায় মিশবে। গোশালার মেঝেও হবে পাকা এবং সেখানে গরুর খাবার ও গোবরের জন্য আলাদা আলাদা পাত্র থাকবে। গোশালায় প্রত্যেক গরুর জন্য কমপক্ষে ৪ × ৮ = ৩২ বর্গফুট এবং প্রত্যেক মহিষের জন্য কমপক্ষে ৫ × ৮ = ৪০ বর্গফুট স্থান থাকা আবশ্যক।



পাকা নরদমা

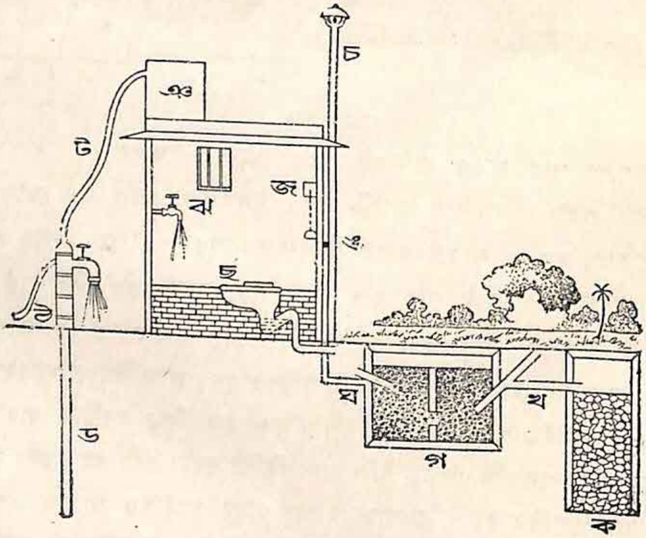
গোশালা পার হয়েও খানিকটা দূরে থাকবে মলশোধক পায়খানা। ব্যবহারের পরই সেখানকার পোর্সিলেনের মলভাণ্ডে প্রচুর জল ঢেলে দিলে জলের তোড়ে মল ৩-আকারের বাষ্পনিরোধক-নলের মধ্য দিয়ে, উপরে ঢাকনি দেওয়া পরিদর্শন-প্রকোষ্ঠ পার হয়ে গিয়ে পড়বে মলশোধক চৌবাচ্চায়। এ প্রকোষ্ঠটি দু-ভাগে ভাগ করা থাকে, প্রথমটিতে জমা হবার পর অবায়ুজীবী জীবাণুর দ্বারা মল-মূত্রাদি তরল অবস্থায় পরিণত হয়; তখন উৎপন্ন অ্যামোনিয়া, কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস উপরিস্থিত নল দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং তরলীকৃত উপাদানগুলি প্রায় ছ'ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট ফুটো দিয়ে প্রকোষ্ঠের দ্বিতীয় অংশে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে আবার বায়ুর প্রবেশের সুযোগ থাকাতে বায়ুজীবী জীবাণুরা অ্যামোনিয়া-ঘটিত উপাদানগুলিকে নাইট্রাইট ও নাইট্রেটে পরিবর্তিত করে এবং এ ভাবেই মল গন্ধহীন ও নির্দোষ হয়ে, নির্গম-নলের সাহায্যে স্তরে স্তরে সাজানো খোয়ার মধ্য দিয়ে চুঁইয়ে মাটির নীচে চলে যায়। স্থানাভাব

হলে এ জাতীয় পায়খানা শোবার বা অন্যান্য ঘরের অনতিদূরে থাকলেও



আদর্শ গোশালা

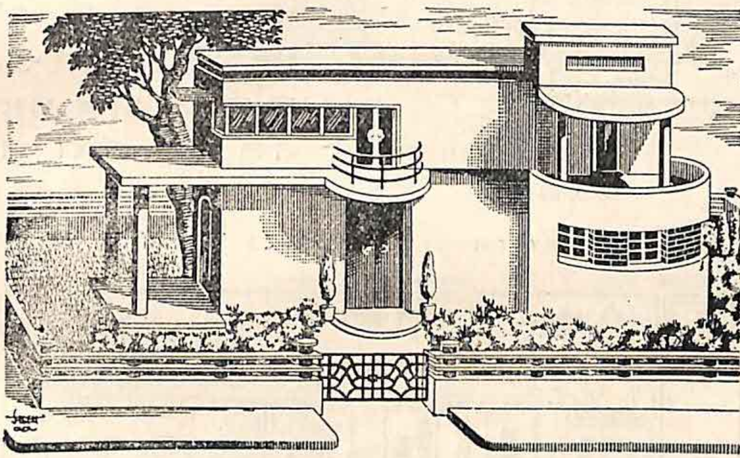
বিশেষ ক্ষতি হয় না। তবে প্রত্যেকটি পায়খানার মল-শোধনের একটি নির্দিষ্ট,



মলশোধক পায়খানাঃ ক—ঝামাপূর্ণ ফিল্টার; খ—মলশোধক চৌবাচ্চার নির্গম পথ; গ—মলশোধক চৌবাচ্চাঃ ঘ—পরিদর্শন প্রকোষ্ঠ; ঙ—গ্যাস বাইরে যাবার পথ; চ—উহার উপরকার অংশ; ছ—মলভাণ্ড; জ—জলের ফ্ল্যাশ; ঝ—জলের কল; ঞ—জলের ট্যাঙ্ক; ট—নলকূপ থেকে জল উপরের ট্যাঙ্কে যাবার পাইপ; ঠ—নলকূপ; ড—নলকূপের নীচের অংশ

ক্ষমতা আছে। যাতে একই পায়খানা বহুলোক ব্যবহার না করে সেজন্য প্রতি চার বা পাঁচ জন লোক-পিছু একটি করে পায়খানা থাকলে ভাল হয়, তা না হলে এর বিশোধক ক্ষমতা শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায়।

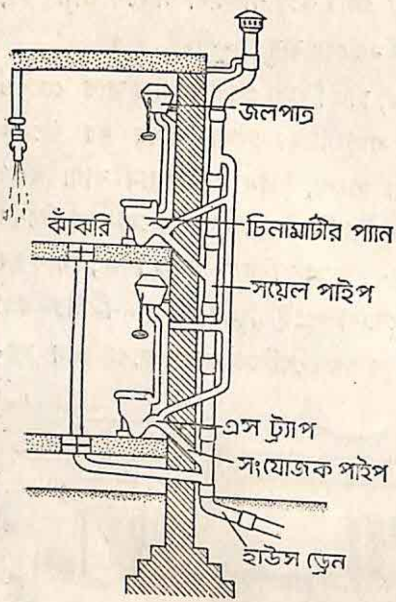
শহরের বাড়ী সাধারণতঃ দুই, তিন, চার কিংবা প্রয়োজন মত তার চেয়েও অধিক তলা-বিশিষ্ট হয়, কারণ সেখানে পাড়াগাঁয়ের তুলনায় জমির দর অনেক বেশী এবং অনেক বাড়ীতেই খোলা জায়গা, উঠান বা বাগান রাখা সম্ভব হয় না। পাড়াগাঁয়ের মত শহরেও জমি উঁচু কি নীচু, ডোবা-বুজানো না বহুদিনের পাকা জমি, বস্তি, কলকারখানা, শ্মশান-গোরস্থান নিকটে আছে কিনা, লোকজন ও পাড়াপড়শী নোংরা কিনা, এসব বিবেচনা করেই বাড়ীর জন্য স্থান-নির্বাচন করা উচিত। বাড়ী দক্ষিণ-মুখো এবং যতদূর সম্ভব সেদিকে খোলা হলেই ভাল হয়;



L—আকারর বাড়ী

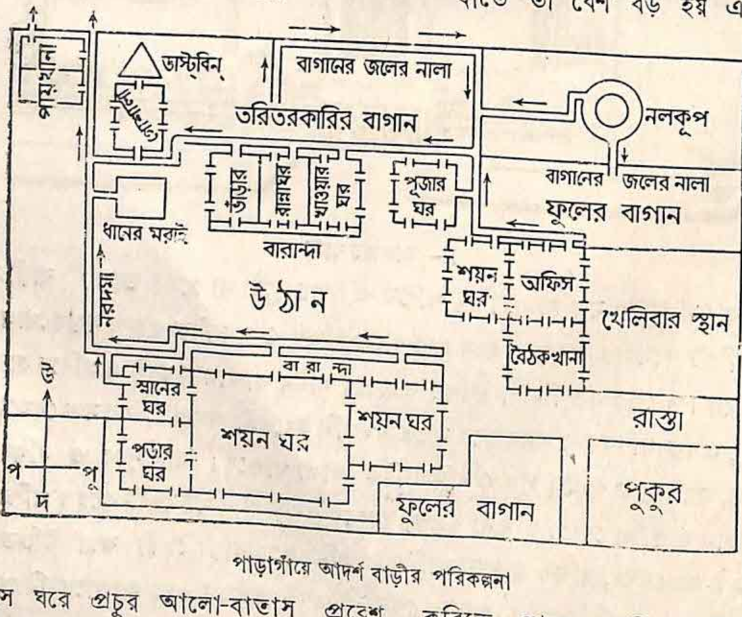
পূবমুখো হলেও মন্দ হয়না, কিন্তু পশ্চিম ও উত্তর-মুখো না হলেই ভাল। বাড়ীর প্রতিটি কামরার অবস্থান এমন হবে যাতে দক্ষিণ ও পূব দিক যতদূর সম্ভব খোলা থাকে। বাক্সের মত কিংবা পরপর কামরার লাইন থাকলে কখনই এ সুবিধে হবে না, এজন্য পরিকল্পনা এমন হবে যাতে ঘরগুলি ইংরেজী অক্ষর L-এর মত দেখতে হয়, তা হলেই বাড়ীর পূব ও দক্ষিণ দিক খোলা থাকবে। যদি পূবে ও দক্ষিণে কোন রাস্তা বা খোলা স্থান না থাকে, তাহলে একটু আকারে ছোট করেও পশ্চিম ও উত্তর ঘেঁসে, দক্ষিণ ও পূবে খানিকটা জমি ছেড়ে বাড়ী তৈরী করা উচিত। বাড়ীতে যে কটি তলাই থাকুক না কেন, ঐ একই ভাবে L-এর আকারে বিন্যাস হবে তার, যাতে প্রত্যেক ঘরে সব সময়েই প্রচুর রোদ ও মুক্ত বাতাস ঢুকতে

পারে। উত্তর কিংবা পশ্চিম দিকে থাকবে স্নানের ঘর, পায়খানা, ময়লা-নিকাশের ড্রেন ও ছাদের জলের বড় পাইপ প্রভৃতি। সম্ভবপর হলে গ্যারেজও পশ্চিম কিংবা উত্তর দিকে তৈরী করা চলতে পারে। ঐ দুটি দিকের যে কোন দিকেই আবার মেথর ও অন্যান্য চাকর বাকরের আনাগোনার জন্য খিড়কী দোর থাকতে পারে।



ময়লা-নিকাশের ড্রেন

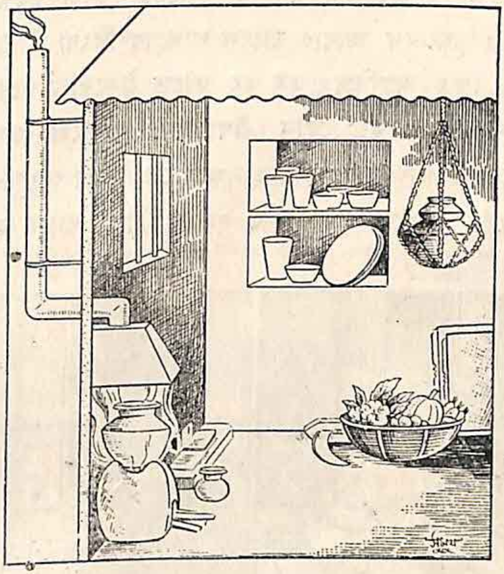
ভাঁড়ারঘরও উত্তরে কিংবা পশ্চিমে থাকলে ক্ষতি নেই। কিন্তু সকল অবস্থাতেই শয়নঘর, পড়ার ঘর প্রভৃতি থাকবে দক্ষিণ ও পূব ঘেঁসে। আর রান্নাঘরও এমন হওয়া উচিত যাতে তা বেশ বড় হয় এবং



পাড়াগাঁয়ে আদর্শ বাড়ীর পরিকল্পনা

সে ঘরে প্রচুর আলো-বাতাস প্রবেশ করিতে পারে। যদি বাড়ীতে গ্যাসের কিংবা ইলেকট্রিকের উনান না থাকে, তা হলে এমনভাবে কাঠের

বা কয়লার উনান বসাতে হবে যাতে ধোঁয়া সোজাসুজি একটা বড় পাইপ দিয়ে ছাদেরও কয়েক ফুট উপরে চলে যায়।



পরিচ্ছন্ন রান্নাঘর

বাড়ীর সিঁড়ি এমন হবে যাতে সব সময়েই সেখানে প্রচুর আলো আসে এবং সিঁড়িগুলির প্রত্যেকটি ধাপ খুব উঁচু উঁচু না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। লোহার



নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর সিঁড়ি

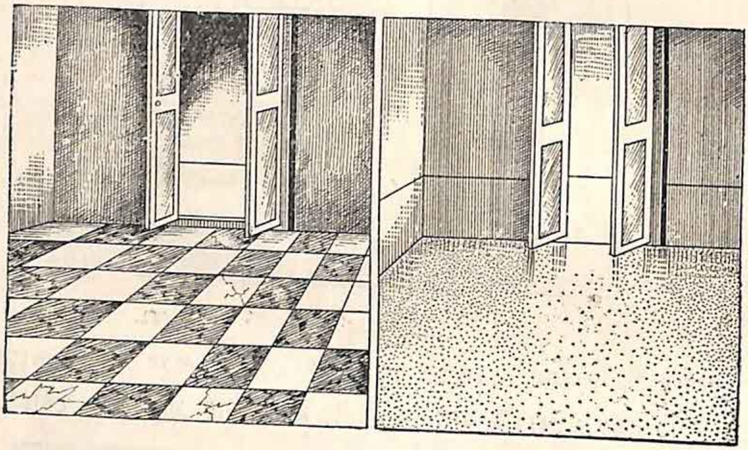


পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সিঁড়ি

রেলিং কিংবা কাঠের নক্সাকাটা রেলিং-এর পরিবর্তে সিমেণ্ট বা মোজাইকের

আগাগোড়া পালিশ করা হাতল বা পাঁচিলই শ্রেয়ঃ, কারণ তাতে ধূলো জমতে পারে কম এবং ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করাও সহজ।

ঘরের মেঝে মোজাইকের, পেটেণ্ট ষ্টোনের কিংবা কেবল সিমেণ্টের হলেই ভাল হয়। অনেকে আবার মার্বেল পাথরের কিংবা টাইলের মেঝেও পছন্দ করেন, কিন্তু অসুবিধে এই যে তাতে টুকরো টুকরো পাথর বা টাইল, সিমেণ্ট কিংবা অন্য কোন উপাদানের সাহায্যে একটিকে অন্যের সঙ্গে জুড়ে দিতে হয় বলে ঐ জোড়ার স্থানগুলোতে ময়লা ও ধূলা-বালি জমে। তা ছাড়া মার্বেল পাথরের মেঝে সব সময়েই ঠাণ্ডা থাকে বলে শীতকালে



মার্বেল ও মোজাইকের মেঝে

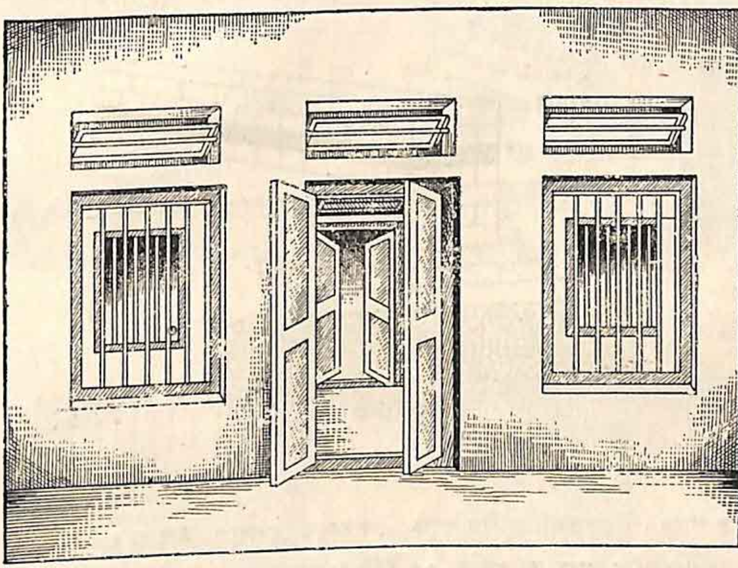
স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল নয়। মেঝেগুলি আবার এমনভাবে তৈরী হবে যাতে ঘরধোয়া জল গড়িয়ে নির্দিষ্ট ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

প্রতি ঘরেই অনেকগুলি বড় বড় দরজা-জানালা থাকবে, আর তাদের অবস্থানও এমন হবে যাতে হাওয়া একদিক দিয়ে ঢুকে সোজাসুজি আর একদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। শীতকালে কিংবা বর্ষাকালে যখন সব সময়ে দরজা জানালা খোলা রাখা সম্ভব হয় না তখন যাতে উপযুক্ত বায়ু-সঞ্চালন হতে পারে তার জন্য ছাদের কিছুটা নীচেই বিপরীত দেওয়ালে মুখোমুখি থাকবে ঘুলঘুলি। প্রতি ঘরেই দু'একটি দেওয়াল-আলমারি থাকলে খুব সুবিধে হয়, কারণ তাতে সমসংখ্যক আলমারির স্থান বেঁচে যায়। বাড়ীতে প্রতি তলায় একটি বা দুটি করে বড় ও চওড়া বারান্দা থাকা ভাল, ফলে রোদ ও বৃষ্টির হাত থেকে দরজা-জানালাগুলি কতকটা রক্ষা পায়। বারান্দা না

থাকলে জানালাগুলির উপর কার্নিশ বা কাঠের শেড দিলে এগুলিকে রোদ ও জলের ঝাপটা হতে কতকটা রক্ষা করা যায়।

বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিকের ব্যবস্থা থাকলে প্রথম হতেই বাতি ও পাখার জন্য অনেকগুলি পয়েন্ট-এর বন্দোবস্ত করে রাখা ভাল, কারণ পরে আবশ্যক মত যে কোন পয়েন্ট-এ বাতি কিংবা পাখা বসানো যেতে পারে।

কলিকাতা প্রভৃতি শহরে বাড়ী তৈরীর আগে নক্সা দেখিয়ে কর্পোরেশনের অনুমতি না নিয়ে বাড়ী তৈরী করা যায় না। আগে কলিকাতায় গায়ে গায়ে

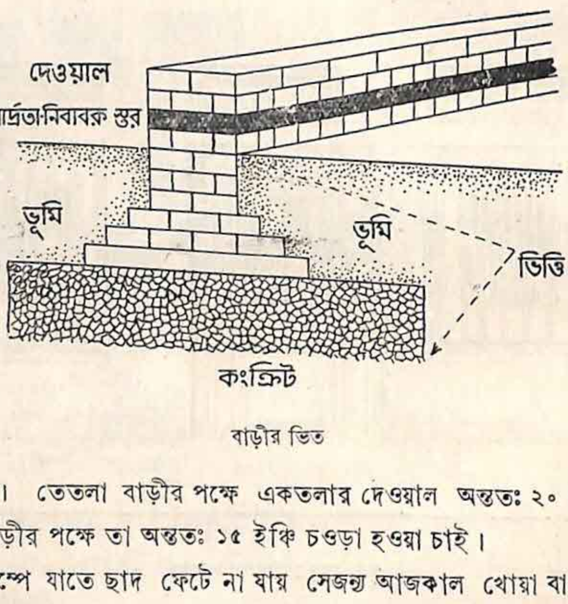


গৃহে বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা

লাগা বাড়ী তৈরী হতো; তার ফলে রোদ এবং হাওয়ার প্রবেশ-পথ অনেক বাড়ীতেই থাকতো না। কিন্তু এখন নিয়ম হয়েছে যে দুটি পাশাপাশি বাড়ীর মাঝে কমপক্ষে ৮ ফুট জমি থাকবে, আর প্রত্যেক বাড়ীর অন্ততঃ এক দিকে ১০ ফুটের মত জমি ছাড়তেই হবে। এই ব্যবস্থার ফলে আজকাল যে সকল নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে সেগুলি পুরানো ধরণের বাড়ীর চেয়ে অনেকটা স্বাস্থ্যকর।

বাড়ী যখন আরম্ভ হয় তখন তার ভিত সম্বন্ধে অর্থাৎ তার গভীরতা এবং প্রসার কতটা হবে তার ব্যবস্থা সতর্কতার সঙ্গে করা উচিত, কেননা দোতলার উপযুক্ত ভিত দিয়ে কখনই দোতলার উপর তেতলা করা উচিত

নয়। ভিতের জন্য চওড়া ও গভীর করে মাটি কেটে সকলের নীচে অন্ততঃ ১৮ ইঞ্চি গভীর কংক্রিট বসিয়ে খুব ভাল করে পিটিয়ে নিতে হয়। যদি জমি ডোবা বা পুকুর-ভরাট হয় তা হলে তার মাঝে মাঝে পিন পুতে তার বনেদকে শক্ত করে নেওয়া উচিত। কংক্রিটের স্তরের উপর ২।৩ ফুট পর্যন্ত উচু ইটের গাথনির পর একটি সীসের পাত, অ্যাস্‌ফেল্ট অথবা খুব ভাল সিমেন্টে তৈরী এমন একটা স্তর দিতে হয় যা সহজেই আর্দ্রতাকে বাধা দিতে পারে। তার উপর আবার পাকা ইটের গাথনি জমির উপর পর্যন্ত তুলে দিতে হয়। দেওয়ালেরও পরিসর বাড়ীর উচ্চতা-অনুসারে কম-বেশি

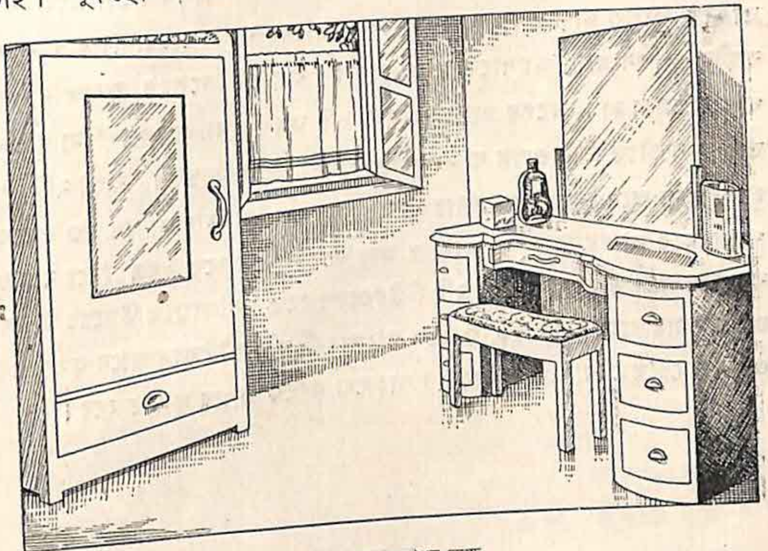


বাড়ীর ভিত

হতে পারে। তেতলা বাড়ীর পক্ষে একতলার দেওয়াল অন্ততঃ ২০ ইঞ্চি এবং দোতলা বাড়ীর পক্ষে তা অন্ততঃ ১৫ ইঞ্চি চওড়া হওয়া চাই।

ভূমিকম্পে যাতে ছাদ ফেটে না যায় সেজন্য আজকাল খোয়া বা পাথরের নুড়ির সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে সিমেণ্ট মিশিয়ে খুব শক্ত কংক্রিটের ছাদ তৈরী করা হয়, তা যেমন শক্ত হয় আবার তেমনি খুব ভারীও হয় না; তার উপর আবার ৫।৬ ইঞ্চি পুরু চুন ও সুরকি-মেশানো খোয়া সাজিয়ে ভাল করে পিটিয়ে জল-ছাদ করা হয়, ফলে বৃষ্টির জল চুঁইয়ে ছাদের নীচে যেতে পারে না। জল-ছাদের মশলায় গুড় ও খয়ের মিশিয়ে দিলে তা আরো শক্ত হয় এবং তার উপর খড় বিছিয়ে বৃষ্টির জলে পচিয়ে নিলে আরও ভাল হয়। ছাদের যে দিকে বৃষ্টির জল বেরোবার পাইপের মুখ থাকে, ছাদ ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নেমে সেদিকেই যাবে, তাহলে আর ছাদে জল দাঁড়াতে পারবে না। ছাদ যত বড় হবে, সে অনুসারে বৃষ্টির জলের নির্গম-পাইপগুলির সংখ্যাও বেশী হবে।

কামরাগুলির সংখ্যা এবং আকার বাড়ীর লোকসংখ্যার অনুপাতে হওয়া চাই। খুব ছোট কামরা স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। একই ঘরে



স্বাস্থ্যকর প্রসাধন-কক্ষ

কখনই দুজন বা তিন জনের বেশী লোকের থাকার ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়।



ছেলেমেয়েদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর খেলার ঘর

স্বাস্থ্যকর শয়ন-গৃহের জন্য তিনজন লোকের পক্ষে অন্ততঃ ১৫ × ২০ = ৩০০ বর্গফুট

মেঝে আবশ্যক। পুরুষদের বসবার ঘর, ছেলেমেয়েদের পড়া ও খেলার ঘর, অতিথি-অভ্যাগতের শয়ন-ঘর প্রভৃতিও এ অনুপাতেই প্রশস্ত হওয়া প্রয়োজন। তা ছাড়া কাপড় ছাড়ার ঘর, শয়নকক্ষ-সংলগ্ন স্নানের ঘর ও পায়খানার বন্দোবস্তও বাড়ীর লোকসংখ্যার অনুপাতে হওয়া চাই। বাড়ীতে জলেরও সুবন্দোবস্ত না থাকলে চলবে না। কলের জলের যোগান যদি কম হয় বা একেবারেই না থাকে, তাহলে বাড়ীতে টিউবওয়েল বা নলকূপের ব্যবস্থা করাই উচিত। বাড়ী যদি উঁচু হয় তাহলে অনেক সময়ে সবতলায় কলের জল পাওয়া যায় না, সে জন্য জলকে পাম্প্ করে ছাদের ট্যাঙ্ক্ বা আধারে জমা করে সেখান হতে সর্বত্র নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করা উচিত। আর যদি টিউবওয়েল হতে সোজাসুজি উপরের ট্যাঙ্কে জল উঠাবার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে পাম্পের নিকটবর্তী কোন স্থানে জলাধারে জল ধরে রেখে সেখান হতে পাম্পের সাহায্যে জলকে উপরে তুলতে হবে।

বায়ু

আমাদের প্রাণ-ধারণের জন্য বায়ু একটি অত্যাবশ্যক উপাদান, কারণ বায়ু না থাকলে বেঁচে থাকা অসম্ভব। বায়ুতে অক্সিজেন নামে যে গ্যাস থাকে তাকে প্রশ্বাসের সঙ্গে ফুস্ফুসের মধ্যে যখন আমরা টেনে নিই, তখন তা ফুস্ফুস হতে রক্তে মিশে তাকে নির্দোষ করে এবং রক্তের দ্বারা দেহের প্রতিটি কোষে বাহিত হয়ে তাদের পুনরায় সক্রিয় ও সজীব করে তোলে। আবার এই রক্ত কোষগুলি হতে অক্সিজেনের পরিবর্তে কার্বন ডাইঅক্সাইড নামক গ্যাস গ্রহণ করে শিরার মধ্য দিয়ে ফুস্ফুসে ফিরে আসে এবং এই গ্যাসই নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরোতে থাকে।

প্রাণীদের মত উদ্ভিদের পক্ষেও বায়ু অপরিহার্য, কিন্তু ঠিক একভাবে নয়। আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দিই উদ্ভিদ তাই গ্রহণ করে অক্সিজেন ত্যাগ করে। এ জন্য কোন সময়েই বায়ুর এ দুটি প্রধান উপাদানের পরিমাণের বিশেষ কোন তারতম্য ঘটে না। জীব-জগৎ যা নেয় উদ্ভিদ্-জগৎ তাই ফিরিয়ে দেয়; আবার উদ্ভিদ্-জগৎ যা নেয় জীব-জগৎ তাই পূর্ণমাত্রায় বায়ুকে প্রত্যর্পণ করে। এ দুটি ছাড়াও বায়ুতে আরও নানা উপাদান আছে। নিম্নে বায়ুতে বর্তমান বিভিন্ন গ্যাসগুলির নাম ও পরিমাণ দেওয়া গেল:—(১) নাইট্রোজেন—শতকরা ৭৯ ভাগ; (২) অক্সিজেন—২০.৯৬

ভাগ ; (৩) কার্বন ডাইঅক্সাইড—০'০৩ ভাগ ; (৪) জলীয় বাষ্প, হিলিয়াম, আর্গন, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি গ্যাস—০'০১ ভাগ মাত্র। সুতরাং বায়ু একটি মৌলিক কিংবা যৌগিক পদার্থ নয়, বিভিন্ন গ্যাসের সংমিশ্রণে গঠিত একটি মিশ্র বায়বীয় উপাদান মাত্র। বিশুদ্ধ বায়ুর কোন বর্ণ, গন্ধ বা স্বাদ নেই, কিন্তু অনেক সময়ে অক্সিজেন অপেক্ষা অধিক উপকারী অজোন থাকাতে সমুদ্রতীরের বায়ুর একপ্রকার আঁশটে গন্ধ থাকে ; অজোন থাকে ব'লেই সমুদ্রের হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল।

শুধু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যই নয়—বহিজগতে কাঠ, কয়লা প্রভৃতির দহনের জন্যও অক্সিজেন গ্যাস আবশ্যক। অক্সিজেনের অভাবে দেহের চর্বি ও অন্যান্য কার্বন-ঘটিত উপাদান, কিংবা কাঠ, কয়লা, মোমবাতি, কেরোসিন তেল প্রভৃতি কার্বন-ঘটিত নানা উপাদানের সম্পূর্ণ দহন হয় না ! অক্সিজেনের অভাবে অসম্পূর্ণ দহনের জন্য দাহ্য বস্তু হতে যেমন ধোঁয়া বের হতে থাকে, তেমনি আমাদের শরীরেও চর্বি প্রভৃতির অসম্পূর্ণ দহনের ফলে সৃষ্ট কিটোনজাতীয় উপাদানগুলি রক্তে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। আবার অক্সিজেনের হাইড্রোজেন নামক অপর একটি গ্যাসের সঙ্গে যৌগিক ক্রিয়ার ফলে জলের সৃষ্টি হয়। সুতরাং নানা কারণে অক্সিজেন আমাদের পক্ষে বা যে কোন প্রাণীর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বস্তু।

বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড শুধু উদ্ভিদের পক্ষেই নয়, আমাদের পক্ষেও প্রয়োজনীয় আর একটি গ্যাস। এই গ্যাসের প্রভাবে আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে যে শ্বসন-কেন্দ্রটি আছে তার স্বাভাবিক সক্রিয়তা রক্ষিত হয় এবং রক্তে এর অভাব হলে শ্বসন-ক্রিয়া মন্থর ও ব্যাহত হয়। অধিকন্তু কোন কক্ষে অত্যধিক-সংখ্যক লোকের সমাবেশ-হেতু মুক্ত বায়ু-সঞ্চালনের অভাবে যখন নিঃশ্বসিত কার্বন ডাইঅক্সাইডের দ্বারা ঘরের বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে, তখন অনেকেরই অস্বস্তি বোধ হতে থাকে এবং বহুক্ষণ ধরে এরকম চলতে থাকলে স্বাস্থ্যহানিরও খুব আশঙ্কা থাকে।

বায়ুর নাইট্রোজেন একটি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় গ্যাস। প্রাণিদেহে তা যেমন প্রশ্বাসের সঙ্গে গৃহীত হয়, আবার ঠিক তেমনি নিঃশ্বাসের সঙ্গেও অপরিবর্তিত অবস্থাতেই বেরিয়ে আসে। কিন্তু কোন কোন 'শিম'-জাতীয় উদ্ভিদ্ নিজ নিজ শিকড়ের দ্বারা বায়ুর নাইট্রোজেনকে দেহের মধ্যে টেনে নেয় এবং তা হতেই তাদের দেহে প্রোটীন তৈরী হয়।

বায়ুতে বর্তমান জলীয় বাষ্পের জন্য তা সর্বদাই কতকটা ভিজে অবস্থায় থাকে। বায়ুর মধ্যে কিছুটা বাষ্প থাকাতে আমাদের নাক, গলা ও গলবিলের

কোমল ঝিল্লি তার আগম ও নির্গমে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। অন্যথা বায়ু বাষ্পহীন হলে স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর হত। কিন্তু বায়ুতে বাষ্পের আধিক্যও স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব অনুকূল নয়। সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানে অথবা বর্ষাকালে যখন প্রচুর বৃষ্টি হয় তখন স্বভাবতই বায়ু খুব আর্দ্র থাকে। বায়ুর আর্দ্রতা এবং আবহাওয়ার উত্তাপ যদি একই সময়ে খুব বেশী থাকে, তা হলে ভাপসা গরমে খুব ঘাম হতে থাকে এবং শরীরের কার্য-ক্ষমতা অনেকটা কমে যায়। এই আর্দ্রতার জন্যই বর্ষাকালে ভিজে কাপড় সহজে শুকাতে চায় না।

বায়ুর অন্যান্য উপাদানগুলি পরিমাণে এত কম থাকে যে আমাদের উপর তাদের বিশেষ কোন প্রভাব নেই। কিন্তু যদি বিশেষ কারণে কোনটি পরিমাণে অত্যন্ত বেশী হয়ে পড়ে (যেমন সময় সময় মলমূত্রাগারের নিকটস্থ বায়ুতে অ্যামোনিয়া গ্যাসের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়) তাহলেও স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

যে কোন কারণে অক্সিজেনের অভাব হলে আমাদের দেহ ও মন সহজেই অবসন্ন হয়ে পড়ে। এবং বহুক্ষণ ধরে এ অভাব চলতে থাকলে স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী। এজন্যই ঘরে সর্বদা যাতে মুক্তবায়ুর চলাচল হয় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। সাধারণতঃ প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি ঘণ্টায় ০.৬ ঘনফুট কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে এবং ১০০০ ঘন ফুট বায়ু-চলাচলের ফলে নিঃশ্বসিত কার্বন ডাইঅক্সাইড ০.১% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়; কিন্তু ২০০০ এবং ৩০০০ ঘনফুট বায়ু-সঞ্চালনের ফলে এ পরিমাণ যথাক্রমে ০.০৭ ও ০.০৬%এ হ্রাস পায়। সুতরাং প্রত্যেক লোকের পক্ষে অন্ততঃ ৩০০০ ঘনফুট বিশুদ্ধ বায়ুই আবশ্যক বলে বিবেচিত হয়।

ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ থাকলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তা নিঃশ্বসিত বায়ুতে এবং অন্যান্য কারণে কতকটা গরম হয়ে উঠে এবং উপযুক্ত বায়ু-চলাচলের ফলে অর্থাৎ দরজা-জানালা যখন খোলা থাকে তখন বাইরের মুক্তবায়ুর সংস্পর্শে তা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ঘর গরম থাকলে কাজ-কর্মের অত্যন্ত অসুবিধে হয়, সেজন্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঘরের গরম কমাবার জন্য পাখার ব্যবহার আবশ্যক। পাখা, সে হাতটানা কিংবা বৈদ্যুতিক যাই হোক না কেন, কিছুক্ষণ চলতে থাকলে ঘরের আবহাওয়া কতকটা কাজ-কর্ম করার পক্ষে অনুকূল হয়। আবার শীতকালে দরজা-জানালা খোলা থাকলে ঘরের ভিতরের হাওয়া এত ঠাণ্ডা হতে পারে যে সর্দি-কাশি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগ দেখা দিতে পারে। এক কথায় খুব গরম কিংবা খুব ঠাণ্ডা হাওয়া কোনটিই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। কিন্তু আমাদের দেশে পালাক্রমে ছয় ঋতুর আবর্তনে আবহাওয়ার অবস্থা

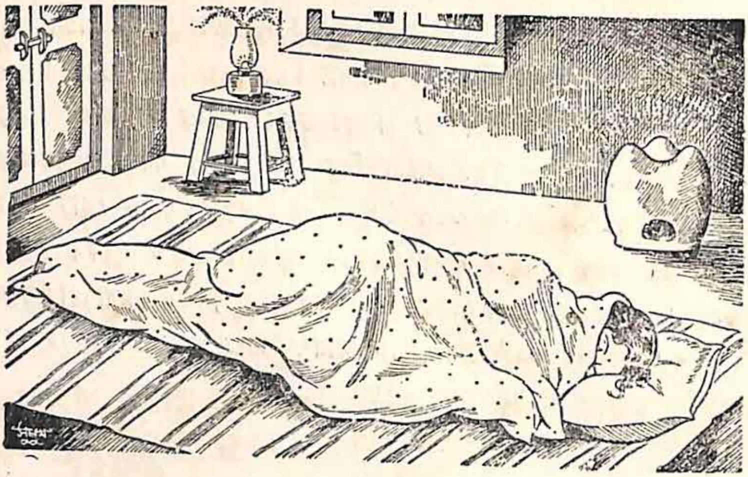
এত বদলায় যে, সময়ে সময়ে দারুণ গ্রীষ্মে আমরা যেমন অতিষ্ঠ হয়ে উঠি, তেমনি আবার শীতকালেও ঠাণ্ডায় কাতর হয়ে পড়ি। শীতপ্রধান দেশগুলিতে গরমের সময়ে কোন কষ্ট হয় না ব'লে শুধু শীত নিবারণের জন্য ঘরে চিমনি বা আগুনের ব্যবস্থা রাখলেই হয়। কিন্তু আমাদের দেশে অতি গ্রীষ্ম ও অতি শীত এ দুয়েরই উপযুক্ত প্রতিষেধক-ব্যবস্থা আবশ্যক। সেজন্য আজকাল বড় বড় অফিস, গবেষণাগার প্রভৃতির আভ্যন্তরিক আবহাওয়ার সমতা রক্ষার জন্য শীততাপ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (air-conditioning) থাকে; ছোট ছোট বাড়ী কিংবা যে কোন বাড়ীতে দু-একখানি কামরার জন্যও এরকম ব্যবস্থা সম্ভবপর। তার জন্য কয়েক হাজার টাকা খরচ হয় বটে, কিন্তু সে ব্যবস্থার ফলে যতটুকু কার্য-ক্ষমতা ও আরাম বাড়ে তার তুলনায় খরচ বেশী কিছুই নয়।



চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বাইরে যাবার ব্যবস্থা

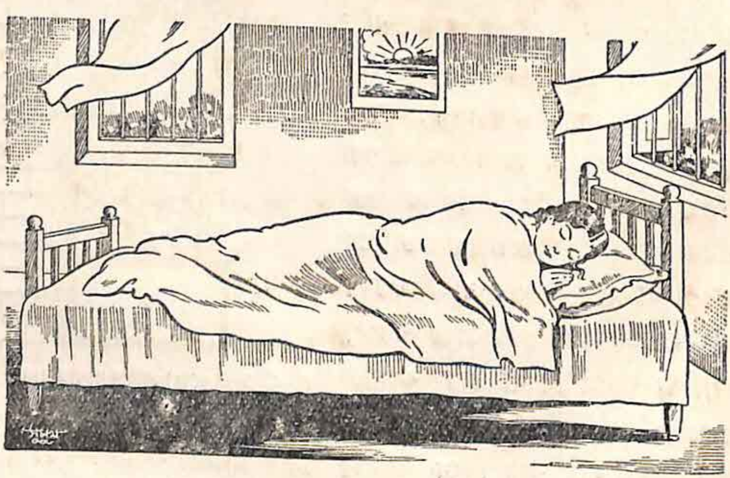
এরূপ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকলেও প্রতি ঋতুতে ঘরের মধ্যে যাতে স্বাস্থ্যের উপযোগী তাপ ও আবহাওয়া রক্ষিত হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। গ্রীষ্মকালে যে পরিমাণ তাপ-নিয়ন্ত্রণে লোকে আরাম বোধ করে, শীতকালে তাই কষ্টদায়ক বা অস্বস্তিকর মনে হতে পারে। সেজন্যই ঋতু-অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আবশ্যক। সকলের পক্ষে অবশ্য এরকম ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়। তাহলেও গ্রীষ্মকালে দরজায় খসের পর্দা টাঙিয়ে পিচকারি দিয়ে বারবার জল ছিটিয়ে এবং ঘরের মধ্যে পাখা চালিয়ে ঘরকে অনেকটা ঠাণ্ডা রাখা সম্ভব। এইভাবে শীতকালে বেশী ঠাণ্ডা পড়লে, বৈদ্যুতিক উনান কিংবা কাঠ কয়লার আগুন জালিয়েও ঘরকে কতকটা গরম রাখা চলে। কিন্তু ঘরে কাঠ কিংবা কয়লার উনান জালিয়ে কখনই সব দরজা ও জানালা বন্ধ করে রাখতে নেই, কারণ উপযুক্ত চিমনি বা নির্গম-পথের অভাবে ধোঁয়ায় স্বাস্থ্যহানি হতে পারে কিংবা তার চেয়েও অনেক বেশী ক্ষতিকর অঙ্গার বা কার্বনের অসম্পূর্ণ দহন-জনিত কার্বন মনোক্সাইড নামক গ্যাসে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। শীতকালে ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করে, আগুন

কিংবা কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে শোয়ার ফলে লোক মরে পড়ে আছে,



এভাবে আগুন ও আলো জ্বেলে দরজা-জানালা বন্ধ করে শোয়া উচিত নয়

এরূপ ঘটনাও দেখা কিংবা শোনা যায়। অক্সিজেনের অভাবে জ্বালানো কয়লা,



এইভাবে বায়ু চলনের ব্যবস্থাযুক্ত গৃহে শোয়া উচিত

কাঠ কিংবা বাতির তেলের কার্বনের অসম্পূর্ণ দহন-জনিত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসউদ্ভবের ফলেই ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটে।

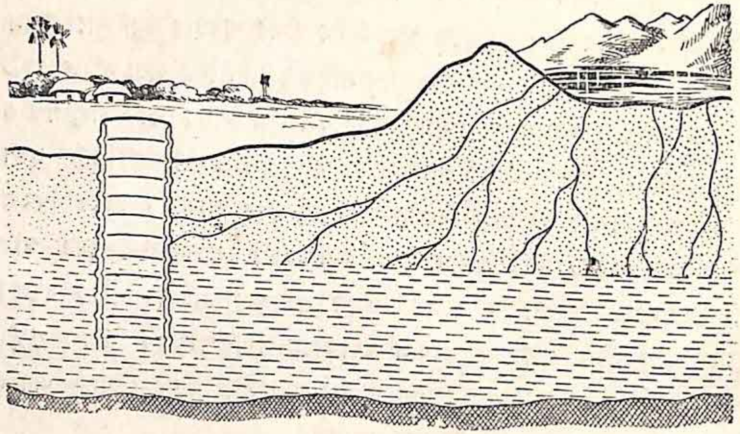
জল

মুক্ত ও নির্দোষ বায়ুর মতই নির্মল ও শীতল জলও আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সেজন্য প্রতি গৃহে প্রচুর নির্মল জলের ব্যবস্থার কথা আগেই বলা হয়েছে। জল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন নামক দুটি গ্যাসের দ্বারা গঠিত একটি যৌগিক উপাদান এবং সম্পূর্ণ রাসায়নিকভাবে উৎপন্ন জলের কোন স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ থাকে না। স্থান ও উৎসহিসেবে জলের স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণের পরিবর্তন হয়। কোন কোন জলে ধাতব উপাদানগুলি থাকাতে, তার স্বাদ কটু, তেতো কিংবা কষায় হতে পারে, আর গন্ধও ভিন্ন ভিন্ন হয়। স্বাভাবিক জলের স্বাদ হয়, তার মধ্যে কিছুটা অক্সিজেন গ্যাস দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে ব'লে। সমুদ্রের জল নীল দেখায়, নদীর জল বর্ষাকালে ঘোলাটে হয়, এঁদো পুকুর কিংবা দীঘির জল নীচের শেওলার জন্য কতকটা সবুজ দেখায়—এমনি নানাকারণে তার রঙের পরিবর্তন হতে পারে।

আমরা প্রধানতঃ পানীয়রূপেই জলকে ব্যবহার করি ; তার জন্য জল নির্মল ও জীবাণুমুক্ত না হলে আমাদের অসুখ হতে পারে। আবার স্নান করা, কাপড়কাচা প্রভৃতির জন্যও আমরা যে জল ব্যবহার করি তাতে কোন কোন স্থলে ক্ষার-জাতীয় উপাদানের উপস্থিতিতে সাবানের ফেনা কম হয়। সেজন্য তা স্নান করা বা কাপড়-কাচার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। আমরা রান্না-বান্না, বাসন-কোসন মাজা বা ধোওয়া, ঘর-মোছা, বা পরিষ্কার করা প্রভৃতি অসংখ্য গৃহস্থালির কাজে যে জলকে ব্যবহার করি, তাও জীবাণুমুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এজন্য জলের বিশোধন-সম্বন্ধে, কী শহরে, কী পাড়াগাঁয়ে আমাদের কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

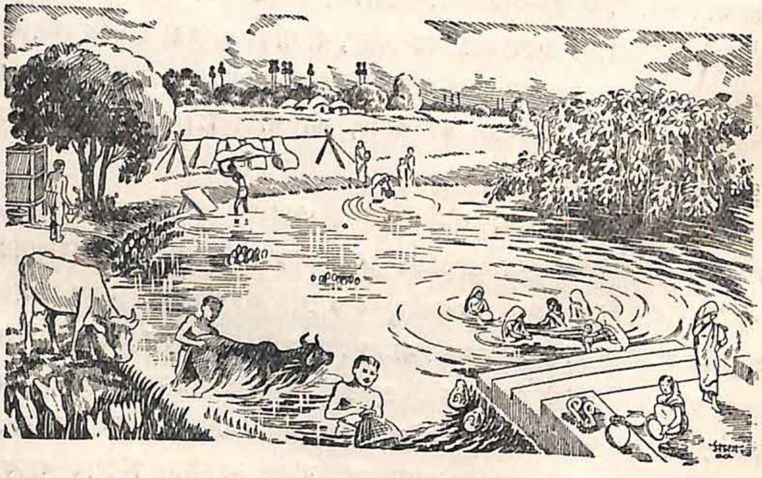
পাড়াগাঁয়ে সাধারণতঃ পানীয় জলের একান্ত অভাব। কারণ পুকুর, দীঘি, নদী, অগভীর কূপ প্রভৃতির জল, পাড়াগাঁয়ের অজ্ঞ জনসাধারণের অবিবেচনার ফলে এবং কতকটা বর্ষাকালে আশেপাশের নালা, খাল প্রভৃতির জলের দ্বারা এবং কতকটা মাটির শোষকস্তরের সাহায্যে চুয়ানো দূষিত জলের দ্বারাও জীবাণুদুষ্ট হয়ে পড়ে। সুতরাং কখনই তাদের যথাবিহিত শোধন না করে পানের জন্য কিংবা গৃহস্থালির কাজের জন্যও ব্যবহার করা উচিত নয়। বৃষ্টির জল, ঝরণার জল ও গভীর কূপের জল যদিও অনেকটা নির্দোষ থাকে, তাহলেও তাকে উপযুক্তভাবে পুরোপুরি শোধন না করে পানীয়রূপে গ্রহণ করা উচিত নয়। একমাত্র গভীর নলকূপের জলকেই, সাবধানতার সঙ্গে তুলে নিয়ে

পাত্রে ভরে রাখলে, নিঃসন্দেহে পান করা চলে। শহরে যে কলের জলের



এভাবে মাটির শোষক স্তরের সাহায্যে কূয়োর জল দূষিত হয়

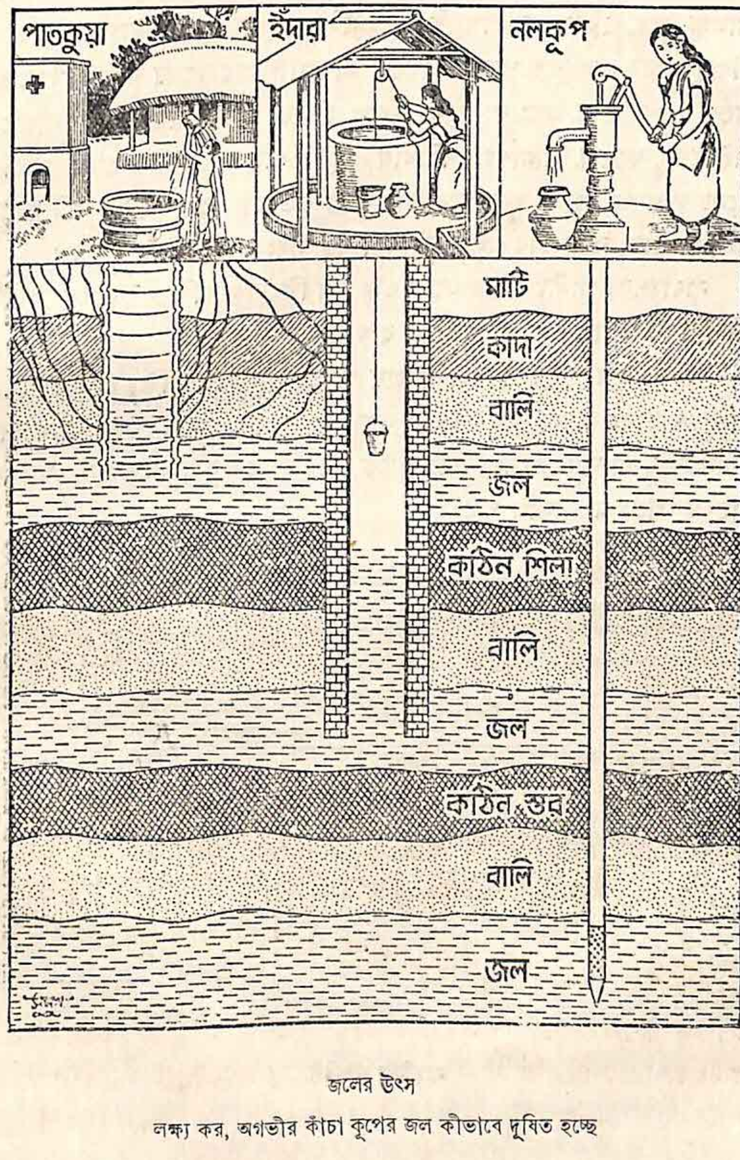
ব্যবস্থা আছে, সাধারণতঃ কোন নদী বা সংরক্ষিত কোন আধার হতে,



এভাবে অজ্ঞ জনসাধারণ-কর্তৃক জল দূষিত হয়

কোন রাসায়নিক উপাদানের সাহায্যে কিংবা ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত কিংবা

বালির স্তরের মধ্যে ধীরে ধীরে বা তাড়াতাড়িতে চুইয়ে আসা জলকে কোন উঁচু



জলের উৎস

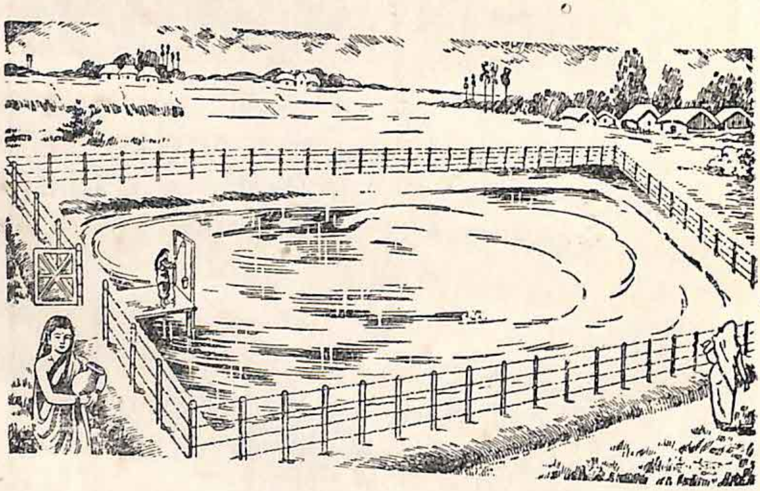
লক্ষ্য কর, অগভীর কাঁচা কূপের জল কীভাবে দূষিত হচ্ছে

আধারের মধ্যে তুলে, সেখান হতে শহরের সর্বত্র সীসের নলের সাহায্যে চালিয়ে

দেওয়া হয়। অনেক শহরেই জলকে ফুটিয়ে শোধন করার ব্যবস্থা নেই। তার উপর কলিকাতা প্রভৃতি নগরীতে মাটির নীচে বহুদিনের পুরানো ময়লার নলগুলি ও জলের নলগুলি কাছাকাছি থাকে। অনেক সময় তাদের জোড়া আলগা হয়ে, কিংবা পাশাপাশি ক্ষয়ে গিয়ে ফুটো হয়েও ময়লার নল হতে জীবাণু জলের নলে ঢুকে পড়ে। এজন্যই আজকাল আর কলের জলকে কিছুতেই বিশুদ্ধ বলা চলে না, এবং তা পান করলে কিংবা রান্নাবান্নার কাজে লাগালে টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয়, কৃমিরোগ প্রভৃতি হতে পারে। সুতরাং শহরের কলের জলকেও শোধন করে পান করা অবশ্য কর্তব্য। শুধু বাড়ীতে যদি গভীর নলকূপ থাকে, তবে তার জলকে নিঃশঙ্কচিত্তে ব্যবহার করা চলতে পারে।

সাধারণতঃ পানীয় জলের জন্য গভীর কূপ কিংবা সংরক্ষিত পুকুরের জলকে নিম্নলিখিত উপায়ে অনেকটা নির্দোষ রাখা যেতে পারে।

(১) এরূপ পুকুর কিংবা কূয়োর পাড়কে উঁচু করে বাঁধিয়ে নেওয়া উচিত যাতে বাইরের ময়লা জল তাতে এসে না পড়ে। আর পুকুর হলে তার চারদিকে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে তাকে ঘিরে রাখতে হবে যাতে গরু, মোষ বা মানুষও তাতে না নামতে পারে।



সংরক্ষিত পুষ্করিণী

(২) পুকুর বা কূয়ো এমন জায়গায় হবে, যেখান হতে আঁস্তাকুড়, পায়খানা, গোয়াল, আস্তাবল, শ্মশান কিংবা গোরস্থান অনেক দূরে থাকবে।

(৩) কূয়ো বা পুকুরের নিকটে কেউ মলমূত্র ত্যাগ করবে না, কিংবা স্নান বা ময়লা কাপড়-চোপড় কাচাকাচি করবে না।

(৪) কূয়োর পাকা উঁচু দেওয়ালের উপর জালের ঢাকনি থাকবে যাতে পাতা, খড়-কুটো এসে জলে না পড়ে। মাঝে মাঝে দুতিন বছর অন্তর কূয়োর দেওয়ালকে পরিষ্কার করিয়ে নিতে হবে।

(৫) পুকুর খোলা-মেলা জায়গায় হবে, এবং তাতে প্রচুর রোদ এসে পড়বে। তাতে পানা, আগাছা প্রভৃতি যাতে না জন্মে তা দেখতে হবে। পুকুরে ছোট ছোট্ মাছ ছেড়ে দেওয়া ভাল কারণ, তারা শেওলা, পোকামাকড়, মশার ডিম প্রভৃতিকে খেয়ে ফেলে।

(৬) কূয়ো বা পুকুরের জলও একটা পাকা মাচান হতে স্বতন্ত্র দড়ি ও বালতির সাহায্যে তুলে অন্য পাত্রে ঢেলে নিতে হবে। কোন অবস্থাতেই অন্য দড়ি বা পাত্র জল-তুলতে ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ তাদের সংস্পর্শেও জল দূষিত হতে পারে।

কোন কারণে পুকুর কিংবা কূয়োর জল দৈবক্রমে বা কারও অসতর্কতার ফলে দূষিত হয়ে পড়লে প্রতি গ্যালন জলের পরিমাণ ৩০ গ্রেণের মত পটাশ পার্মাঙ্গানেট গুলে জলের সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে, প্রায় দিন পনেরো জলকে ব্যবহার না করে, ফেলে রেখে দিলে ঐ জল অনেকটা জীবাণুমুক্ত হতে পারে।

যতদূর সম্ভব পানের জন্য এবং গৃহস্থালির কাজে নদীর জল ব্যবহার করা উচিত নয় কারণ মলমূত্র, পশুপাখীর মৃতদেহ, বাঁধ হতে ধুয়ে আসা যত নোংরা কিছু, সবই নদীর জলকে এত দূষিত করে যে সব সময়েই তা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। একমাত্র ভাল করে ফুটিয়ে ফিল্টার করে নিলে, তবে তাকে সংসারের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

নানাভাবে জলের আংশিক ও সম্পূর্ণ বিশোধন করা যায়। কোন পরিষ্কার মিহি কাপড়ে ছেঁকে নিলে খড়কুটো, শেওলা, পাতার কুচি, বড় বড় ধূলোবালির কণা প্রভৃতি কাপড়ে আটকে যায় ব'লে, তা দেখতে কতকটা পরিষ্কার হলেও, নির্দোষ ও জীবাণুমুক্ত হয় না। সূক্ষ্ম ধূলোবালির কণা কিন্তু এভাবে দূর করা যায় না। অনেকক্ষণ কোন পাত্রে ধরে রাখলে কতকটা ময়লা থিতিয়ে যখন নীচে পড়ে যায় তখন উপরের জলকে আস্তে আস্তে ঢেলে নিলে, কতকটা পরিষ্কার জল পাওয়া সম্ভবপর হয়। কিছুটা ফটকিরি জলে মিশিয়ে নিলে, ময়লাগুলির থিতানো অনেকটা সহজ হয়, কিন্তু এভাবে জলকে জীবাণুমুক্ত করা যায় না।

জলকে নির্দোষ করার সবচেয়ে ভাল উপায়, ছাঁকা ও থিতানো জলকে আগুনে ফুটিয়ে নিয়ে ফিল্টার করে নেওয়া। এভাবে জলকে শোধন করার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা হয়। সবচেয়ে সহজ উপায় **চার ঘড়ার ফিল্টার**। পাড়াগাঁয়ের রেলষ্টেশনগুলিতে সাধারণতঃ এ রকম ফিল্টারই ব্যবহৃত হয়। একটি লম্বা কাঠের তেপায়ার চারটি তাকে বসানো থাকে চারটি মাটির কলসী। উপরের তিনটি কলসীর নীচে ফুটো থাকে, কিন্তু সকলের নীচেরটিতে তা থাকে



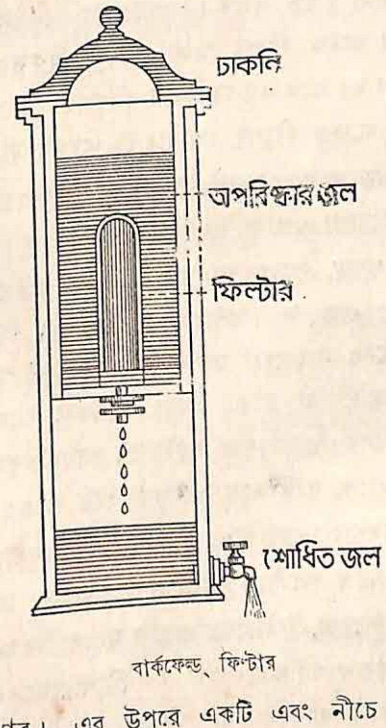
চার ঘড়ার ফিল্টার

না। সকলের উপরের কলসীতে শুধু জল, দ্বিতীয়টিতে কাঠকয়লা, তৃতীয়টিতে থাকে বালি এবং চতুর্থটির মুখ ঢাকা থাকে পরিষ্কার মিহি কাপড় দিয়ে। আগেই কতকটা ছাঁকা ও থিতানো জলকে ভাল ক'রে কোন পাত্রে ফুটিয়ে নিয়ে ঐ জলকে প্রথম কলসীতে ঢেলে দিতে হয়। দ্বিতীয় কলসীতে কাঠকয়লার মধ্য দিয়ে আসতে আসতে জলের দুর্গন্ধ ও কতকটা ময়লা তাতে আটকে যায়, পরে নীচের ফুটো দিয়ে জল যখন তৃতীয় কলসীতে নেমে আসে তখন ঐ

কলসীর মিহি বালিতে আরো অনেক কিছু ময়লা আটকে যায়। সুতরাং তার নীচের ফুটো দিয়ে পরিষ্কার ও নির্দোষ জলের ধারা চতুর্থ কলসীতে নেমে আসে। সেখানে জমা হওয়ার আগে তার মুখের মিহি কাপড় ছাঁকনীর কাজ করে বলে দ্বিতীয় কলসীর কাঠকয়লার কুচি কিংবা তৃতীয় কলসীর বালিও আটকে যায় তার উপর। সুতরাং এ অবস্থায় ঐ চতুর্থ কলসীর নির্দোষ ও সংশোধিত জল পান করলে রোগের কোন আশঙ্কা থাকে না।

গৃহে জলকে ফিল্টার করার জন্য নানা রকমের ফিল্টার বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, যেমন **বার্কফেল্ড ফিল্টার** (Berkefeld Filter), **পাস্তুর-চেম্বারলেন ফিল্টার** (Pasteur Chamberlain filter) প্রভৃতি। এগুলির সাহায্যে গৃহে পানীয় জলকে অনায়াসে অনেকটা নির্মল ও নির্দোষ ক'রে পানের যোগ্য করে নেওয়া চলে।

বার্কফেল্ড ফিল্টার—এটি পোসিলেন বা চীনেমাটির একটি লম্বা



বার্কফেল্ড ফিল্টার

ঢাকনি দেওয়া আধার। এর উপরে একটি এবং নীচে আর একটি প্রকোষ্ঠ আছে। এক রকম মাটি দিয়ে তৈরী ছিদ্রযুক্ত ফাঁপা নলের সাহায্যে উপরের প্রকোষ্ঠে ঢেলে দেওয়া জল ফিল্টার হয়ে যখন ফোঁটা ফোঁটা ক'রে নীচের

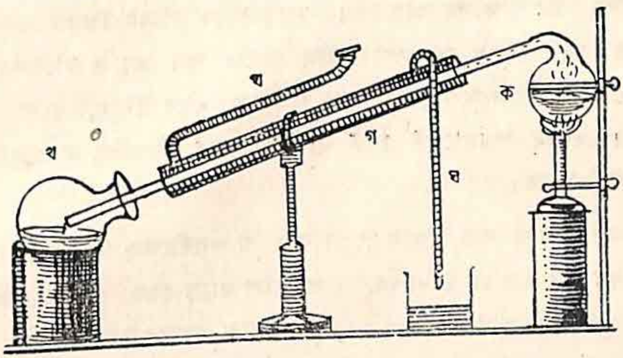
প্রকোষ্ঠে পড়তে থাকে, তখন তা জীবাণুমুক্ত থাকে, কেননা, ঐ অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রে জীবাণুগুলি আটকে যায়। এর সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জলের শোধন সম্ভবপর হয়। তবে অসুবিধে এই যে উপরের প্রকোষ্ঠে ঘোলা জল ঢাললে, তলানি প'ড়ে নলের ছিদ্রগুলি বন্ধ হ'য়ে যায় ও তা অকেজো হ'য়ে পড়ে। সুতরাং কয়েকদিন পর পর বুরুশ দিয়ে তাকে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করে নিতে হয়; মাঝে মাঝে গরমজলে ফুটিয়ে নিয়ে পরিষ্কার করলে আরো ভাল হয়। ঐ ছাঁকনির নলটি মাটির তৈরী ব'লে, খুব বেশীদিন টিকে না, সহজেই ভেঙ্গে যায়।

পাস্তুর-চেম্বারলেন ফিল্টার—এর বাইরের গড়ন বার্ক্‌ফেল্ড ফিল্টারের মতই; কিন্তু এর মধ্যে ছিদ্রযুক্ত কতকগুলি পোর্সিলেনে তৈরী নল আছে, এবং তাদের মধ্য দিয়ে জল যখন চুইয়ে যেতে থাকে, তখন জীবাণুগুলি ঐ সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে গ'লে যেতে পারে না বলেই নীচের আধারে নির্মল ও জীবাণুমুক্ত জল জমা হ'তে থাকে। বার্কফেল্ড্ ফিল্টারের চেয়ে পাস্তুর-চেম্বারলেন ফিল্টার অনেক বিষয়ে ভাল এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এর নলগুলিও খুব ভঙ্গুর নয় ব'লে এরকম একটি ফিল্টার কিনলে অনেকদিন চলে, আর ব্যবহারের পক্ষেও বিশেষ সুবিধে। এরকম ফিল্টার প্রয়োজন-মত ছোট, মাঝারি বা বড় আকারের পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে এ রকম ফিল্টার খুবই নির্ভরযোগ্য এবং সুবিধেজনকও বটে।

আবার যখন পুকুর, কূয়ো, বা কলের জলাধারে কোন কারণে জল দূষিত হওয়ার জন্য একসঙ্গে বিশোধন আবশ্যক হয়, তখন কোন উপযুক্ত রাসায়নিক উপাদানের সাহায্যেই তা করতে হয়। পটাশ পার্মাঙ্গানেটের কথা আগেই বলা হয়েছে। তা ছাড়া ব্লিচিং পাউডার, ক্লোরোজেন প্রভৃতিও এভাবে জল-সংশোধনের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এদের মধ্যে যে মুক্ত ক্লোরিন গ্যাস থাকে, তাই জলে দ্রবীভূত হয়ে জীবাণুগুলিকে সমূলে নষ্ট করে। কিন্তু জলে মেশানো ক্লোরিনের গন্ধ মোটেই ভাল নয়, তা ছাড়া অনেক-দিন ধরে ক্লোরিন-মিশ্রিত জল পান করতে করতে আবার পেটও খারাপ হ'তে পারে। কিন্তু যখন কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি মহামারীর আকারে দেখা দেয়, তখন মহামারীর প্রসারকে খর্ব করার জন্য জল-বিশোধনের এরকম ব্যাপক ও নির্ভরযোগ্য কোন উপায় অবলম্বন করা খুবই দরকার।

চোলাইকরণ—জলকে সব রকমে নির্দোষ ও জীবাণুমুক্ত ক'রতে হ'লে তা একমাত্র সম্ভব **চোলাইকরণ** (distillation) প্রক্রিয়ার সাহায্যে।

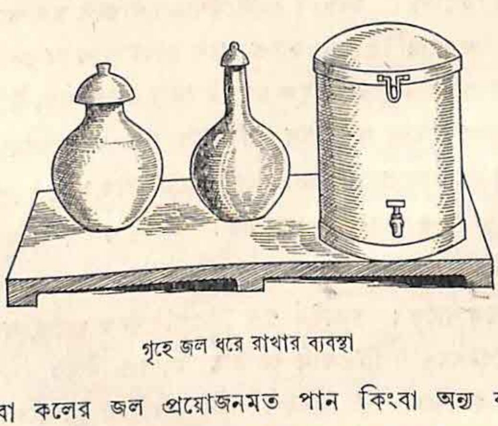
ছাঁকা ও থিতানো জলের সঙ্গে পটাশ পার্মাঙ্গানেট মিশিয়ে সে জলকে প্রথমে বাষ্পে ও সে বাষ্পকে ঠাণ্ডা করে পুনরায় জলে পরিণত করার নামই চোলাইকরণ। চোলাইকরা জল সাধারণতঃ ঔষধ-তৈরী ও ইন্‌জেক্‌শনের জন্য এবং বৈদ্যুতিক ব্যাটারি প্রভৃতিতেও ব্যবহৃত হয়। চোলাই করার জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা আবশ্যক। সাধারণতঃ বাড়ীতে এরূপে চোলাই করে জলকে



চোলাইকরণ যন্ত্র

নির্দোষ করা সম্ভবপর নয়, তাছাড়া ঐ জল অত্যন্ত বিস্বাদও বটে, কারণ জলে যে অক্সিজেন থাকাতে আমরা জলের স্বাভাবিক স্বাদ পাই, চোলাইকরা জলে ঐ অক্সিজেন একেবারেই থাকে না। ঐ অবস্থায়ও বিশুদ্ধ জলে অজোনপূর্ণ বায়ুকে চালিয়ে দিলে আবার তার স্বাভাবিক আস্বাদ ফিরে আসে।

ঘরে জল ধ'রে রাখার ব্যবস্থা—নলকূপের, গভীর কূয়োর, সংরক্ষিত


গৃহে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা

পুকুরের কিংবা কলের জল প্রয়োজনমত পান কিংবা অন্য ব্যবহারের জন্য এমনভাবে কোন উপযুক্ত পাত্রে ধরে রাখতে হয়, যাতে তার মধ্যে ধুলোবালি না

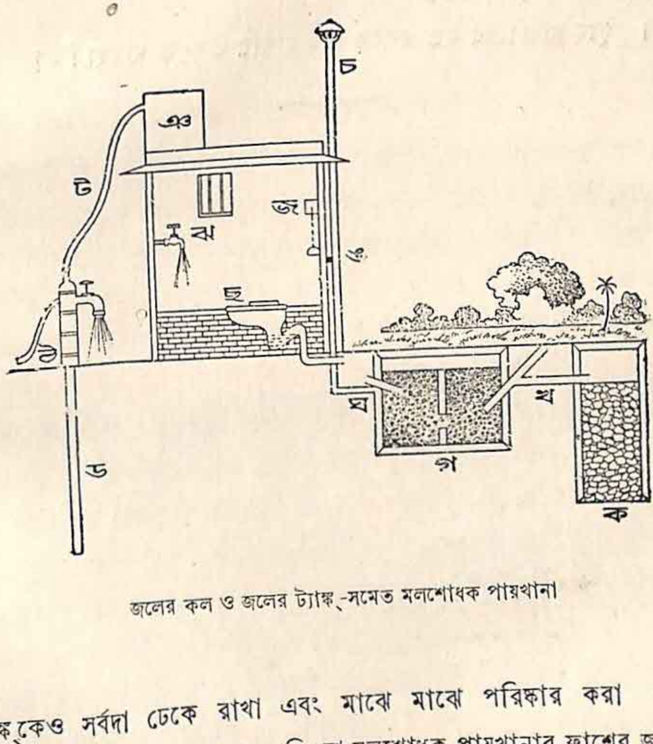
পড়তে পারে, কিংবা ময়লা হাত, আঙ্গুল বা ঘটি-বাটির দ্বারা তা দূষিত না হতে পারে। ব্যবহার্য পানীয় জলকে পিতলের কিংবা দস্তালিপ্ত (গ্যালভেনাইজ্ড্) লোহার চাদরের ড্রাম, পিতলের ঘড়া বা কলসী, মাটির কলসী, মাটির কুঁজো প্রভৃতি নানা আকার ও প্রকারের জলাধারের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখা হয়। ড্রামগুলিতে উপরে ঢাকনি ও নীচের দিকে গায়ে প্রয়োজনমত জল বের করে নেওয়ার জন্য কলের চাবি থাকলেই ভাল হয়। মাঝে মাঝে ড্রামের ভিতর ভাল ক'রে পরিষ্কার ক'রে নিতে হয় এবং রোজ তাতে জল ভরতি ক'রে দরকারমত কলের চাবি ঘুরিয়ে জলকে কোন গ্লাসে বা পাত্রে ধ'রে নিলে, জলের অপব্যয় হয় না। কোন অবস্থাতেই হাত বা অন্য পাত্র ঐগুলির মধ্যে ডুবিয়ে জল তোলা উচিত নয়।

পিতল কিংবা অন্য কোন ধাতুর ঘড়া বা কলসীতেও জল রাখা যায়, কিন্তু তাদের মুখ যেন এত ছোট না হয়, যাতে মাঝে মাঝে হাত ঢুকিয়ে মেজে-ঘসে ভিতর পরিষ্কার করা যায় না। মাঝে মাঝে এভাবে তাদের পরিষ্কার ক'রে নিতে হয় এবং তাহ'তে জল ঢেলে কিংবা গড়িয়ে নিয়ে কলসীর মুখে আবার ঢাকনি চেপে দিতে হয়। জল গড়িয়ে নেওয়ার সময়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করলে প্রয়োজনাতিরিক্ত জল ছলকে পড়ার জন্য শুধু জলের অপচয়ই হয় না, মেঝে, দেওয়াল প্রভৃতিও নষ্ট হতে পারে।

গ্রীষ্মকালে জল ধ'রে রাখার পক্ষে মাটির কলসীই ভাল, কারণ তার সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলি দিয়ে যখন খানিকটা জল বাইরের গরম হাওয়ায় মিশে যেতে থাকে, তখন সঙ্গে সঙ্গে জলও ঠাণ্ডা হতে থাকে। এজন্য মাটির কলসীর জল পান ক'রলে শরীর স্নিগ্ধ হয়। মাটিতে বালিমেশানো থাকলে জল আরো বেশী ঠাণ্ডা হয়। মাটির কলসীর ভিতরও মাঝে মাঝে পরিষ্কার ক'রে নেওয়া উচিত এবং জলকে সর্বদাই কলসীর মুখে উপযুক্ত ঢাকনি দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত। এভাবে মাটির কুঁজোতেও পানের জন্য অল্প পরিমাণে জল ধ'রে রাখা যায়। কিন্তু অসুবিধে এই যে. তাতে বেশী জল ধ'রে না এবং তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তাকে মাঝে মাঝে পরিষ্কার করাও সম্ভবপর নয়। মাটির কলসী বা কুঁজো নতুন হ'লে প্রথম দু-একদিন তাতে জল রেখে তা ফেলে দিতে হয়, কেন না ঐ জলে পোড়ামাটির গন্ধ থাকে। যতদিন সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলি ঠিক থাকে, জল বেশী ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু ক্রমশঃ যখন ঐ ছিদ্রগুলি বন্ধ হয়ে আসতে থাকে, তখন আর জল তেমন ঠাণ্ডা হয় না। ঐ অবস্থায় মাটির কলসী বা কুঁজোকে বদলে নেওয়াই উচিত। মাটির কলসী বা কুঁজোর দামও এমন কিছু নয়, সুতরাং বছরে

দু-তিনবার বদলাবার খরচও খুব বেশি পড়ে না। আবার অনেক সময়ে অসতর্ক ব্যবহারের ফলেও তা ভেঙে যায়, তখন বদলাতে-ই হয়।

শহরের উঁচু উঁচু বাড়ীতে অনেক সময়ে কলের জল, তেতলা, চারতলায় উঠেনা, এমন কি সময়ে সময়ে দোতালাতেও জল পাওয়া না। যাতে বাড়ীর সর্বত্র জল পাওয়া যায় তার জন্য ছাদের উপরে একটি বড় ট্যাঙ্ক্ করে নিয়ে, হয় টিউবওয়েলের সঙ্গে পাম্প লাগিয়ে, না হয় আর একটি আধারের মধ্যে জমানো জলকে পাম্প করে ঐ ট্যাঙ্কে তুলে নিতে হয় এবং তা হ'তে পাইপের সাহায্যে বাড়ীর যে কোনখানে যে কোন সময়ে জল পাওয়া যায়। ঐ দুটি



জলের কল ও জলের ট্যাঙ্ক্-সমেত মলশোধক পায়খানা

ট্যাঙ্ক্‌কেও সর্বদা ঢেকে রাখা এবং মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা উচিত। পায়খানার ফ্লাশে ব্যবহারের জন্য, কিংবা মলশোধক পায়খানার ফ্লাশের জন্য ছাদে আর একটি অপরিস্রুত জলের ট্যাঙ্ক্ থাকা আবশ্যক। কলের জল সারাদিন পাওয়া যায় না, সুতরাং স্নান ও অন্যান্য গৃহস্থালির কাজের জন্য জলকে একটি চৌবাচ্চায় ধরে রাখা উচিত। জলের প্রয়োজন কম হলে বড় ড্রাম বা কয়েকটি বালতিতেও তা ধরে রাখলে চলে, কিন্তু যে ভাবেই রাখা হোক না কেন, সর্বদাই জলকে ঢেকে রাখা উচিত।

প্রশ্ন

১। গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ দাও।

২। গৃহের উচ্চতা অনুসারে ভিত এবং একতলা, দোতলা ও তিনতলার দেওয়ালের প্রস্থ কি হওয়া উচিত ?

৩। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে কি পরিমাণ মুক্তবায়ু আবশ্যক ? দুটি শয্যাযুক্ত একটি শয়ন কক্ষের স্বাস্থ্যসম্মত আকার ও উচ্চতা কি হওয়া উচিত ?

৪। গৃহে সাধারণতঃ কি ভাবে শৈত্য ও তাপ নিয়ন্ত্রণ করা যায় ?

৫। গৃহে ব্যবহৃত জল বিশোধনের উপায় কি ? সেগুলির মধ্যে সকলের চেয়ে সহজ উপায় বর্ণনা কর।

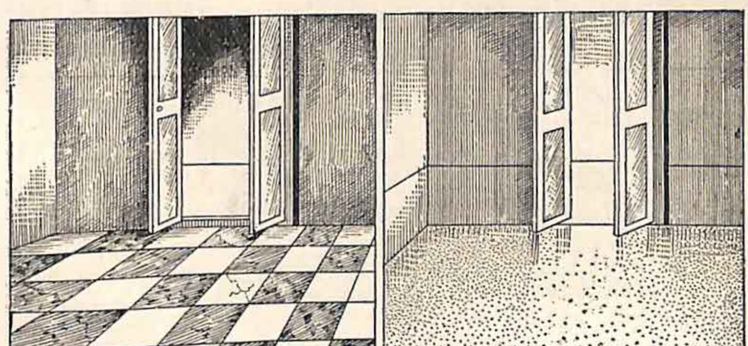
৬। গৃহে ব্যবহারের জন্য জলকে ধরে রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা কি ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

গৃহের সাজ-সজ্জা

গৃহের সাজ-সজ্জা ব'লতে আমরা ঘরের মেঝের, দেওয়ালের, দরজা-জানালার ও ছাদের সুদৃশ্য গড়ন ও সজ্জার সঙ্গে, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ঘরে সুচারুরূপে আসবাব-পত্রেরও উপযুক্ত সংস্থান বুঝি। কাঁচা কিংবা পাকাবাড়ী যাই হোক না কেন, নির্মাণকালে তার প্রতিটি অংশের প্রতি নজর থাকা উচিত, যাতে তার প্রত্যেকটি অংশ প্রয়োজনমত এবং সুরুচিসম্মত হয়। সব কিছুর সামঞ্জস্য গৃহের সাজ-সজ্জার একটি প্রধান অংশ। মেটে ঘরে মার্বেল পাথরের মেঝে যেমন বেমানান, তেমনি প্রাসাদে গোবর-নিকানো মেঝেও দৃষ্টিকটু। সুতরাং সব সময়েই সব কিছুর সামঞ্জস্যের প্রতি নজর রাখা উচিত।

কার্পেট বা গালচে—কুঁড়ে ঘরে মাটির মেঝে হলেও প্রত্যহ গোবর মাটি দিয়ে নিকানো মেঝে দেখতে বেশ হয়। টিনের বা টালির ছাদযুক্ত ঘর হ'লে, মেঝেকে সিমেন্ট করিয়ে নেওয়াই উচিত। পাকা বাড়ীতে সামর্থ্য অনুসারে কেউ বা সিমেণ্টের কেউ বা মোজাইকের, কেউ বা টাইলের আবার কেউ বা মার্বেল পাথরের মেঝে করেন। এদের মধ্যে ঢালা সিমেণ্ট বা



সিমেণ্ট বা মোজাইকের মেঝে

মোজাইকের মেঝে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পক্ষে ভাল এবং ইচ্ছেমত নক্সা কেটে মোজাইকের মেঝে করলেও দেখতে মন্দ হয় না। টালি ও নানা রঙের মার্বেল পাথরের চৌকো চৌকো টুকরো জুড়ে যে মেঝে তৈরী

হয়, তা দেখতে খুব ভালই হয় বটে, কিন্তু পুরানো হ'য়ে গেলে তাদের জোড়ার ফাঁকগুলিতে ময়লা বা ধূলোবালি জমার আশঙ্কা থাকে। অনেকে আবার মেঝের উপর নানা সুদৃশ্য কার্পেট বা গালচে বিছিয়ে গৃহের সৌন্দর্য্য বাড়াতে চেষ্টা করেন। ফুল, লতা-পাতা ও অন্যান্য নানা নক্সা-কাটা গালিচা কিনতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সব চেয়ে দামী ও দেখতে সুন্দর, পারস্যদেশে বা কাশ্মীরে যেগুলি প্রস্তুত হয়। সেগুলি এত পাতলা, মখমলের মত মসৃণ, ও সুন্দর যে ঘরের মেঝেতে বিছানো থাকলে, তাতে ঘরের চেহারাই একেবারে বদলে যায়। আবার কম দামের গালচেও পাওয়া যায়, কিন্তু ঘরের সৌন্দর্য্য তাতে যতই বাড়ুক, উপযুক্তভাবে রোজই ইলেক্‌ট্রিক যন্ত্রের সাহায্যে পরিষ্কারের ব্যবস্থা না থাকলে ক্রমাগত তাতে ধূলোবালি জমতে থাকে বলে, স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার খুবই আশঙ্কা থাকে। সুদৃশ্য বহুমূল্য পারসীক বা কাশ্মীরী গালচেও যথেচ্ছ ব্যবহারে,



কার্পেট বিছানো ঘরের মেঝে

অর্থাৎ ধুলো, কাদা, বালি, সিগার বা সিগারেটের ছাই প্রভৃতিতে কিছুকালের মধ্যেই এমন নোংরা ও অব্যবহার্য্য হয়ে উঠে যে, যা আগে ছিল নয়ন মুগ্ধকর, তাই হ'য়ে পড়ে চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক। সুতরাং ঘরের সৌন্দর্য বাড়াতে, কার্পেট বা গালচে মেঝেতে পেতে দিলেই হল না, যাতে তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে তার সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখা যায় সেজন্য প্রচুর যত্ন নেওয়া উচিত।

ঘরে অল্প মূল্যের পুরু ও লম্বা লম্বা আঁশ-যুক্ত গালচে না পাতাই ভাল, কারণ তাতে ঘরের সৌন্দর্য্য ত বাড়েই না, বরং তাকে উপযুক্তভাবে পরিষ্কার রাখতে প্রাণান্ত পরিশ্রম হয়—আর তা না রাখতে পারলে তাতে প্রচুর ধুলো-বালি জমা হওয়াতে ঘরের আবহাওয়া পর্যন্ত দূষিত হয়ে পড়ে।

ভাল কার্পেটের মধ্যে নানারকমের নক্সা থাকে। তার মধ্যে নানারকমের ফুল, লতাপাতা প্রভৃতির সূক্ষ্ম কারুকার্যই বেশি থাকে। কোন কোনটিতে অতি প্রসিদ্ধ কোন কিছুর—যেমন মিশরের পিরামিড, আগ্রার তাজমহল বা কোন মসজিদ বা মন্দির প্রভৃতিও আঁকা থাকে, আবার কোন কোনটিতে প্রাকৃতিক দৃশ্য কিংবা মরুভূমিতে উটের ছবি, সমুদ্রে বা নদীতে ভাসমান নৌকো বা জাহাজের ছবি, কোনটিতে বন্যজন্তু কিংবা শিকারীর ছবি, এমনি নানারূপ নক্সা পাওয়া যায়। সুতরাং কার্পেট-নির্বাচনে সর্বদাই নজর রাখা উচিত যে তা যেন ঘরের অন্যান্য সাজসজ্জা ও আসবাব পত্রের অনুরূপ হয়। অতি সাদাসিধে ঘরের মেঝেতে জবড়জঙ কার্পেট পাতলে তাতে ঘরের সৌন্দর্য্য কমে বই বাড়ে না। আবার মন্দির বা মসজিদের ছবি আছে যে কার্পেটে, তা ড্রয়িংরুমে পেতে, যদি তার উপর জুতো মস্‌মস্‌ করে চলাফেরা করা যায়, তাহলে তাও সুরুচিসম্মত হয় না।

দেওয়ালে আঁকা ছবি ও কারুকার্য—কুঁড়ে ঘরের গোবর-মাটিতে নিকানো কাঁচা দেওয়ালে আমাদের দেশের আগেকার পটুয়াদের আঁকা ছবি থাকতো। শোয়ার ঘরের দেওয়ালে নানা ফুলের গাছ ও বরকনে প্রভৃতির ছবি, পূজোর ঘরে ঠাকুর-দেবতার ছবি প্রভৃতি আগেকার কালে লোকের পছন্দ ও রুচি-সঙ্গত ছিল। তখনকার দিনে পাকাবাড়ীর দেওয়ালেও মালিকের পছন্দ-অনুসারে চিত্রকরেরা নানারঙে নানা প্রসিদ্ধ ঘটনার ছবি এঁকে গৃহসজ্জা বাড়াতেন।

মিলানের প্রসিদ্ধ গীর্জায় যীশুখ্রীষ্টের বারোজন শিষ্যসহ শেষ সান্ধ্য ভোজনের ছবি একখানি ইতিহাস প্রসিদ্ধ চিত্র। এ ভাবেই আমাদের দেশে মন্দির প্রভৃতিতে কোথাও দেব-দেবী, কোথাও হনুমানজী প্রভৃতির ছবি আজও দেখতে পাওয়া যায়। পুরাতন কালে বাংলাদেশেরও ধনীদের পাকাবাড়ীর দেওয়ালে দেব-দেবী কিংবা ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক ঘটনার ছবি আঁকানো হতো। আজকাল রাজা-মহারাজের প্রাসাদ ছাড়া, বাড়ীর দেওয়ালে বা ছাদে ছবি-আঁকানো আধুনিক যুগের পক্ষে খুব রুচিসম্মত নয়। মুসলমানযুগের ছোট ছোট পাথর বা কাঁচ বসিয়ে দেওয়ালে নানা নক্সা বা ছবি তৈরী করার রেওয়াজও আজকাল আর নেই।

দেওয়ালের রঙ—পাকাবাড়ীতে অনেকেই এক রঙা দেওয়াল পছন্দ করেন, কেউ বা সাদা, আবার কেউ বা নানারঙের ডিস্‌টেম্পার করা রঙ পছন্দ করেন। পছন্দ ও রুচিতে ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক ; বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রঙের উপযোগিতা-সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে সে অনুসারে ছাদে ও দেওয়ালে রঙ করালে, শুধু চোখের ও মনের পক্ষেই আরামদায়ক হয় না, অনেক সময়ে কার্যকারিতাও বাড়ে। রঙের প্রভাবে চোখের কাজ সহজ কিংবা কঠিন হয়, মনে প্রফুল্ল কিংবা বিমর্ষভাব আসে, আবার কাজকর্মের প্রেরণা কিংবা অবসাদও আসতে পারে। দেওয়াল ও ছাদের পক্ষে সাদা রঙই অনেকে পছন্দ করেন। সাদা রঙ পবিত্রতার প্রতীক কিন্তু উজ্জ্বল দিবালোকে রোদ এসে পড়লে তা মানুষের চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক হয় ও তাতে সহজেই ক্লান্তি আসে। কিন্তু রাত্রিকালে পড়াশুনা করতে হলে, অন্য রঙগুলি বাতির উজ্জ্বলতাকে অনেকটা শোষণ করে নেয় ব'লে সাদা রঙই পড়ার ঘরের দেওয়াল ও ছাদের পক্ষে বেশী উপযোগী।

শয়ন-ঘরের রঙ কখনই খুব উজ্জ্বল হওয়া উচিত নয়—কারণ ক্লান্ত দেহ ও মনে যে সময় লোক শয্যায় দেহকে এলিয়ে দিয়ে আরাম উপভোগ করতে চায়, সে সময়ে দেওয়ালের উজ্জ্বল রঙ তার চোখকে ও মনকে আরো অবসন্ন ও ক্লান্ত করে দেয়, এজন্য শয়ন কক্ষের জন্য কোন ফিকে ও স্নিগ্ধ রঙই উপযোগী। ফিকে সবুজ বা কচি কলাপাতার রঙ কিংবা ফিকে নীল রঙ, এ দুটির যে কোনটিই শোয়ার ঘরের দেওয়ালের উপযুক্ত রঙ। বৈঠক খানা কিংবা অফিসঘরের পক্ষে হলদে কিংবা ফিকে গোলাপী রঙই প্রশস্ত, কারণ তাতে মনে সজীবতা, প্রফুল্লতা ও আনন্দের পরিবেশ জাগে। শিশুদের পড়াশুনা কিংবা খেলার ঘরের দেওয়ালে এমন রঙ থাকবে যাতে তাদের মনে সর্বদাই আনন্দ, প্রেরণা ও উদ্দীপনার ভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। কমলা, গোলাপী এবং কতকটা সোনালী রঙ এ হিসেবে উপযুক্ত। খাবার ঘরের পক্ষেও এ রঙগুলি উপযোগী, কেন না খাবার সময়ে মন প্রফুল্ল ও অবসাদমুক্ত না হ'লে খাওয়ার তৃপ্তি-লাভ সে রকম হয় না। পূজার ঘরের পক্ষে সাদা রঙই প্রশস্ত। গাঢ় লাল ও কাল রঙ কিংবা নানা রঙের মিশ্রণ গৃহের কোন ঘরেরই দেওয়ালের পক্ষে উপযুক্ত নয়। দেওয়ালে যে কোন রঙই থাকুক না কেন, ছাদের খানিকটা নীচে যদি কালো রঙের একটি সরু রেখা সোজাসুজি চারটি দেওয়ালের উপরের অংশে টেনে দেওয়া হয়, তাতে ঘরের দেওয়ালের রঙটি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠে। রাত্রিতে গান-বাজনার আসর কিংবা বৈঠক বসে যে ঘরে, সে ঘরের রঙ কখনই ফিকে

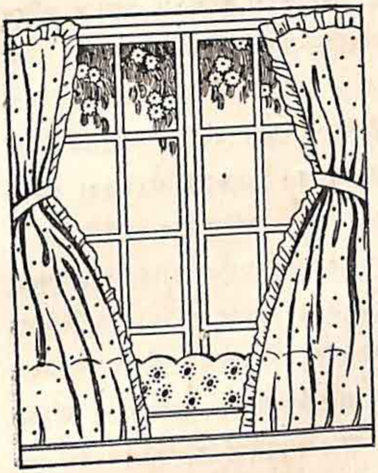
সবুজ বা নীল হওয়া উচিত নয়; আলোর স্পর্শে উজ্জল হয়ে উঠে যে সকল রঙ, যেমন কমলা, হলদে, বা গোলাপী প্রভৃতি রঙই তার পক্ষে প্রশস্ত।

দেওয়ালে টাঙানো ছবি—আগে বড় বড় বাড়ীর দেওয়ালে ছোট-বড় তৈলচিত্র ও অন্যান্য ছবি এত বেশী টাঙানোর রেওয়াজ ছিল যে, দেওয়ালের অতি অল্প অংশই ফাঁকা থাকতো। আজকাল কিন্তু সেরূপ পছন্দ ও রুচি আর নেই। অতি অল্প-সংখ্যক কয়েকখানা ভাল ভাল ছবি ছাড়া অযথা দেওয়ালকে ভারাক্রান্ত ক'রে তার নিজস্ব সৌন্দর্যকে আড়াল করে না রাখাই উচিত। বৈঠকখানা-ঘরে কোন ভাল চিত্রকরের কয়েকখানা ছবি, খাবার ঘরে কয়েক খানা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি, শয়ন-ঘরে পিতামাতা কিংবা নিকট আত্মীয়দের গোটাকয়েক ছবি, পূজোর ঘরে ঠাকুর-দেবতা কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতির কয়েকখানা ছবি, এবং ছেলে মেয়েদের পঁড়ার ঘরে বীর, মনীষী, শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী প্রভৃতির দুচারখানা ছবি ছাড়া আর কোন ছবি বা ক্যালেণ্ডারের প্রাচুর্য রাখা উচিত নয়। দেওয়ালে ছবি থাকলে, সেগুলিকে এবং ছবির পিছনে দেওয়ালের অংশকেও ঝেড়ে সর্বদাই পরিষ্কার রাখা উচিত, কারণ তা না হলে ধুলো-বালি জমে ও মাকড়সার জালে ও ঝুলে দেওয়ালই শুধু নষ্ট হয় না, স্বাস্থ্যহানিরও আশঙ্কা থাকে। ছবিগুলির ফ্রেমও যত সাদাসিধে হয়, ততই ভাল। কাঠের কিংবা গিল্টিকরা, কিংবা হাতীর দাঁতের বা রূপোর কারুকার্য-খচিত ফ্রেমে ধুলো-বালি প্রচুর আটকে থাকে ব'লে, অনর্থক পয়সা খরচ ক'রে ছবির জন্য ঐরকম ফ্রেমের ব্যবস্থা না করাই ভাল।

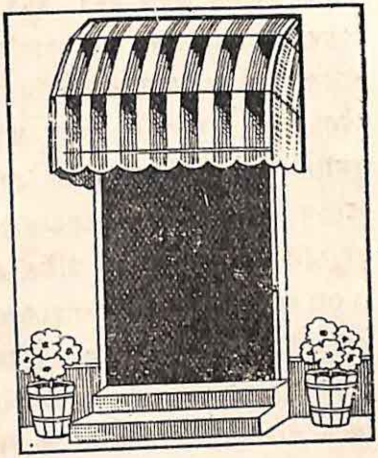
আজকাল ছাদ হ'তে বাতি না ঝুলিয়ে দেওয়ালের গায়েই নানা রকম বাতির ব্যবস্থা করা যায়। পছন্দ ও রুচিসম্মত ভাবে দেওয়ালগুলিতে, ঘরের মেঝে, ছাদ, দরজা-জানালার পরদা ও আসবাব-পত্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নানা রকমের শেডযুক্ত বাতি বসালে, শুধু রাত্রিতেই বাতি-জ্বালানো অবস্থায় ঘরের সৌন্দর্য বাড়ে না, দিনের বেলায়ও দেওয়ালগুলিকে দেখতে বেশ ভাল লাগে। আজকাল আবার অনেকে দেওয়ালের গায়ে নিয়োন-বাতির নল লাগিয়ে, রাত্রিতে ঘরের সৌন্দর্য বাড়াতে চেষ্টা করেন। তাতে সময়ে সময়ে সৌন্দর্য বাড়ে বটে, কিন্তু পড়াশুনা কিংবা কাজকর্মের পক্ষে ঐরূপ আলো মোটেই উপযোগী নয়।

দরজা-জানালার পর্দা—কতকটা আবরু-রক্ষা, কতকটা অতিরিক্ত আলো ও রোদকে বাধা দেওয়া এবং কতকটা অবাঞ্ছিত ও অপ্রিয় দৃশ্য হ'তে নিজের

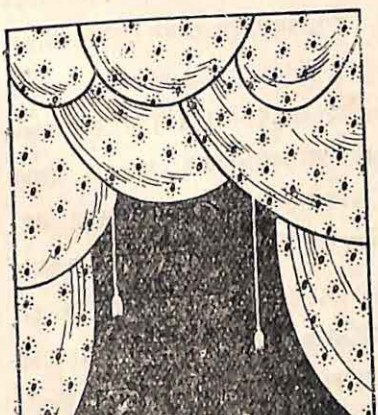
চোখকে বাঁচাবার জন্য আবশ্যক হ'লেও, দরজা-জানালার পর্দাও গৃহসজ্জার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। পর্দার রঙ, আকার, ও চেহারা বা কাটছাট এমন হওয়া উচিত যাতে দেওয়াল, মেঝে, আসবাবপত্র, সব কিছুর সঙ্গেই তার সামঞ্জস্য থাকে, এবং তার ফলে ঘরের পরিবেশ আরো প্রীতিকর ও আরামদায়ক হ'য়ে উঠে। পর্দা সাদাসিধে কাজ-করা, কিংবা জবড়জংও হয়। সাদাসিধে পর্দাকেও উপযুক্ত বিন্যাসের দ্বারা অনেকটা মনোরম করা যায়। ঘরের অন্য সব কিছুর সঙ্গে কারুকার্য-খচিত পর্দার সামঞ্জস্য না থাকলে কখনই ভাল দেখায় না। জবড়জং অর্থাৎ ভারী মলমলের কিংবা অতিশয় কারুকার্যখচিত খুব গাঢ় রঙের কিংবা কাটছাটের ও ভাঁজের আধিক্যে ভারাক্রান্ত হ'লে পর্দা ঘরের সৌন্দর্য না বাড়িয়ে, তাকে অনেকটা খাটোই ক'রে। সুতরাং দরজা-জানালার পর্দা এমন হওয়া উচিত যাতে প্রয়োজনও মিটে এবং সঙ্গে সঙ্গে তা দরজা-জানালাকে অধিকতর সুদৃশ্য করে তোলে। আমাদের দেশে সর্বদা প্রচুর রোদ ও বৃষ্টির ছাট লাগে ব'লে পর্দার রঙ সহজেই ফিকে হয়ে যায় এবং সেজন্য ছিঁড়েও যায় শীগ্‌গির। রোদ ও জলের ছাট হ'তে তাদের বাঁচানো যায়, দরজা-জানালার উপরে ব্র্যাকেট করে, এবং দরজা জানালা হতে খানিকটা তফাতে ঘরের মধ্যেই পর্দা-টাঙানোর ব্যবস্থা করলে। ড্রয়িংরুম, খাবার ঘর, অফিস ঘর, ছেলেমেয়ের পড়ার ঘর, শয়ন ঘর প্রভৃতি সবখানেই পর্দা খাটাবার জন্য এরকম ব্যবস্থা থাকলে খুব ভাল হয়। যে সকল ঘরে, আবরুর জন্য নয়, শুধু সৌন্দর্য্যের জন্য পর্দা ঝুলানো হয়, তাদের দরজা-জানালায় দুদিকে দুভাগে ভাগ করা পর্দাই ভাল। তা দিয়ে ইচ্ছেমত মাঝখানে টেনে দিলে সমস্ত দরজা বা জানালা ঢাকা যেতে পারে, আবার, দু-চৌকাঠ হতে সুতো দিয়ে মাঝখানে বেঁধে দিলেও কতকটা ভাঁজকরা ও কতকটা ঝোলা অবস্থায়ও মন্দ দেখায় না। এরকম পর্দার কাটছাট সাদাসিধে, কাপড় পাতলা ও রঙ ফিকে নীল কি সবুজ হলেই ভাল হয়। শয়নঘরের কিংবা কাপড়-ছাড়ার ঘরের দরজার পরদা ভাগ করা না হওয়াই ভাল, কারণ ঐ পর্দার মূল উদ্দেশ্য আবরুরক্ষা—তাই তা' একটু পুরু কাপড়ের, কিন্তু শয়ন কক্ষের দেওয়ালের রঙের এবং আরবাবপত্রের সঙ্গে মানানসই হওয়া চাই। আবরুরক্ষার জন্য জানালার পর্দাগুলি জানালার মাঝামাঝি দুটি স্প্রীং বা রডের সঙ্গে, এক টুকরো কিংবা দুটুকরো অবস্থায় খাটানো যেতে পারে। পর্দা যদি জানালার চে'য় খানিকটা বেশী চওড়া হয় তাহলে, রডের মাপের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হলে খানিকটা গুটিয়ে এমন ভাবে বসানো যায় যাতে পরপর ভাঁজ পড়ে এবং এভাবেই সাদাসিধে



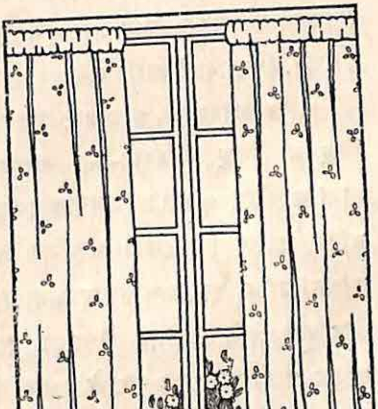
জানালার সুদৃশ্য পর্দা



শেড্-যুক্ত দরজা ও টবসহ ফুলের টব



জবড়জং পর্দা



দুভাগে ভাগ করা জানালার পর্দা

পর্দাও কতকটা স্বদৃশ্য হয়। দুটুকরোর পর্দা হ'লে ইচ্ছেমত দুপাশে গুটিয়ে মাঝখানে খোলা রাখা যায়, আবার প্রয়োজন-মত দুটিকে মাঝখানে টেনে এনেও ইচ্ছেমত আগাগোড়াই ঢাকা যায়। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার কিংবা খেলা-ঘরের পক্ষে এরকম পর্দাই ভাল, কারণ ছেলেমেয়েরা টানাটানি করে ঝুলানো পর্দাকে সহজেই ছিঁড়ে ফেলতে পারে। এভাবে ভাঁজকরা পর্দায় ধুলো-বালি সহজে জমে ব'লে সর্বদা ঝেড়ে তাদের পরিষ্কার রাখা উচিত এবং পর্দাগুলি সর্বদাই দুপ্রস্থ রাখা উচিত, যাতে একপ্রস্থ যখন কাচার জন্য খুলে নেওয়া হয়, তখনই আর এক প্রস্থকে খাটিয়ে দেওয়া চলতে পারে। অতিরিক্ত কাট-ছাটযুক্ত পাকাপাকি ভাবে ভাঁজকরা পর্দা, কী সৌন্দর্য, কী উপযোগিতা কোন হিসেবেই ভাল নয়, কারণ অনাবশ্যক প্রতিটি ভাঁজে যে ধুলো জমে, তাকে ঝেড়ে পরিষ্কার রাখা শক্ত। সাদাসিধে পর্দায় মানানসই বর্ডার থাকলেও মন্দ দেখায় না। শয়নঘরের পর্দা, দেওয়ালের রং ও বেডকভারের রঙের সঙ্গে এবং ড্রয়িংরুমের পর্দা দেওয়ালের রঙ, সোফা ও চেয়ারের ঢাকনির রঙ প্রভৃতির সঙ্গে মানানসই হলেই ভাল হয়। ছেলেমেয়েদের খেলাঘরের পর্দায় গোলাপ ফুল, লতাপাতা কিংবা মিকি-মাউসের ছবিও থাকতে পারে—তাতে তাদের প্রফুল্লতা ও আনন্দ বাড়ে।

আসবাব-পত্র—গৃহের জন্য মুখ্যতঃ দুটি কারণে আসবাব-পত্রের আবশ্যক ; (১) প্রয়োজনীয়—যেমন খাট, আলমারি প্রভৃতি এবং (২) আরামের জন্য—যেমন সোফা, আরাম কেদারা, স্প্রীংএর গদী প্রভৃতি। তা ছাড়া বিলাসিতার উপকরণ-হিসেবেও কোন কোন আসবাব-পত্র ব্যবহৃত হয়, যেমন ড্রেসিং টেবিল, কার্পেট, পিয়ানো ইত্যাদি।

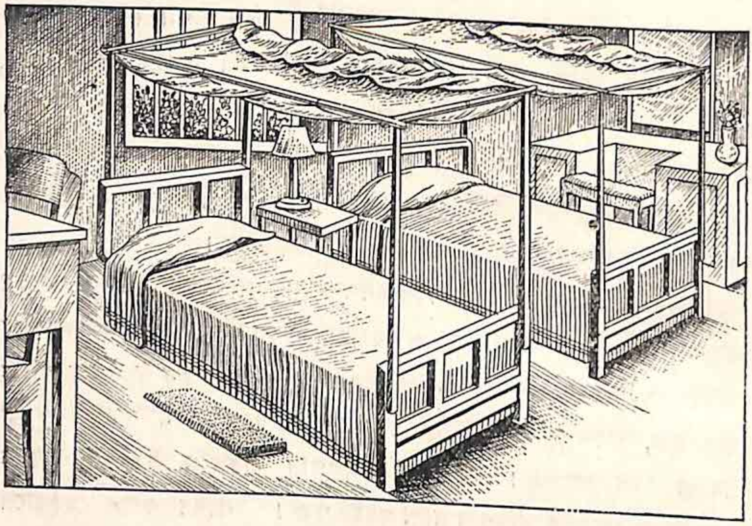
প্রতি কামরায় প্রয়োজন, আরাম এবং সময়ে সময়ে বিলাসের জন্যও কিছু না কিছু আসবাব-পত্র আবশ্যক। আসবাব-পত্রের অভাবে যেমন নানা অসুবিধে ও কষ্ট হয় আবার তেমনি আসবাব-পত্রের বাহুল্যও ভাল নয় ; কারণ তাতে চলা-ফেরা প্রভৃতির অসুবিধে হয়, শিশুদের পক্ষে আহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, ঘরকে পরিষ্কার রাখা কষ্টকর হয়, মুক্তবায়ু-চলনের ব্যাঘাত হয়, এবং ধুলোবালি ও মশার উপদ্রবে স্বাস্থ্যহানিরও আশঙ্কা থাকে। আসবাব-পত্রের প্রয়োজন আছে ব'লেই কতকগুলি যা-তা কাঠকাঠরা কিনে যে ঘর ভরতি ক'রতে হবে এমন নয়, যাতে সেগুলি প্রয়োজনানুরূপ ও আরামপ্রদ হয় এবং উপযুক্ত বিন্যাসের ফলে ঘরের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে, তার প্রতিও নজর রাখা কর্তব্য। পছন্দমত জিনিষপত্র কিনে এনে এক ঘরে জড় না করে, নির্দিষ্ট ঘরে

প্রয়োজন-মত সুশৃঙ্খলভাবে তাদের স্থাপন করা চাই। আর রোজ তাদের ঝেড়ে, মুছে ও পরিষ্কার করে রাখতে হবে এবং যাতে অসতর্ক ব্যবহারে তারা দেখতে খারাপ কিংবা অকেজো না হ'য়ে পড়ে, তারও ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া নড়বড়ে হ'য়ে গেলে কিংবা কোথাও চটা উঠে গেলে কিংবা ছিঁড়ে গেলে বা পালিশ নষ্ট হয়ে গেলে, তৎক্ষণাৎ সেগুলির মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হ'লে ঘরে সেগুলি থাকা সত্ত্বেও, কোন কাজেই লাগবে না, বরং অযথা আবর্জনার সামিল হয়ে অনেকটা দৃষ্টিকটু ভাবে ঘরে বিরাজ করতে থাকবে। সুতরাং তাদের মনোনয়ন, বিন্যাস ও সাজানো সমস্তই নির্ভর করে অনেকটা ক্রেতার আর্থিক সামর্থ্য ও সম্পূর্ণরূপে সুরুচিজ্ঞানের উপর।

বর্তমানে যে সকল ফ্যান্সি বা বিলাসসম্মত আসবাবপত্রের ছড়াছড়ি সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়, তারা যুগ ও কালের উপযোগী হলেও অনেক সময়ে অসুবিধের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। দৃষ্টান্তস্থলে, আগের কালে উঁচু উঁচু খাট-পালঙ্ক ব্যবহৃত হত, তাতে সুবিধে এই ছিল যে খাটের বা পালঙ্কের নীচে ঝাঁট দেওয়া বা মোছা যেত সহজেই। কিন্তু আজকালকার খাটগুলি এত নীচু হয় যে তাদের নীচের মেঝেকে পরিষ্কার রাখা খুবই শক্ত। আগের কালে দেওয়ালে গা-আলমারির খুবই প্রচলন ছিল, তাতে মেঝেতে অনেকটা স্থান বেঁচে যেতো, কিন্তু আজকাল অনেকে তা পছন্দ করেন না ব'লে নানা সুদৃশ্য আলমারির জন্য ঘরের অনেকটা স্থান ছেড়ে দিতে হয়। সুতরাং ফ্যান্সির দিকে সব সময়ে না গিয়ে, আসবাবপত্র-মনোনয়নে সুবিধে-অসুবিধের কথাও ভাবা উচিত।

শয়ন-কক্ষের জন্য অবস্থা ও সামর্থ্য-অনুসারে খাট-পালঙ কিংবা তক্তপোশের আবশ্যক। ঐগুলি খুব হালকা কিংবা খুব ভারী হওয়াও উচিত নয়, কিন্তু মজবুত হওয়া চাই। এক ঘরে কোন অবস্থাতেই স্বাভাবিক আকারের দুখানির চেয়ে বেশি খাট বা তক্তপোশ থাকা উচিত নয়, আর তাও নির্ভর করে ঘরের আকারের উপর। ঐ শয্যাগুলি যাতে ঘরের এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশী স্থান অধিকার না ক'রে, তাই দেখতে হবে। খাটের পক্ষে স্প্রীং-এর গদী আরামপ্রদ হলেও খুব স্বাস্থ্য-সম্মত নয়, কারণ একটু পুরানো হ'য়ে গেলে শরীরের ওজনে তা নেমে পড়ে ব'লে, শায়িত অবস্থায় মেরুদণ্ড ঠিক সোজা থাকে না, তার চেয়ে কাঠে ওপর তুলো কিংবা নারকেলের ছোবড়ার গদী ভাল। পালঙ্ক বা খাটের সঙ্গে মশারি খাটাবার যেমন ছত্রী থাকে, তক্তপোশের জন্যও সেরকম ব্যবস্থা করে নেওয়া ভাল, কারণ তা না হলে

মশারি খাটাবার জন্য দেওয়ালে পেরেক পুঁতে দেওয়ালকে নষ্ট করতে হয়। তা ভিন্ন গোটা-দুই মশারির কোণের দড়িতে ঘরে বেড়াজালের সৃষ্টি ও

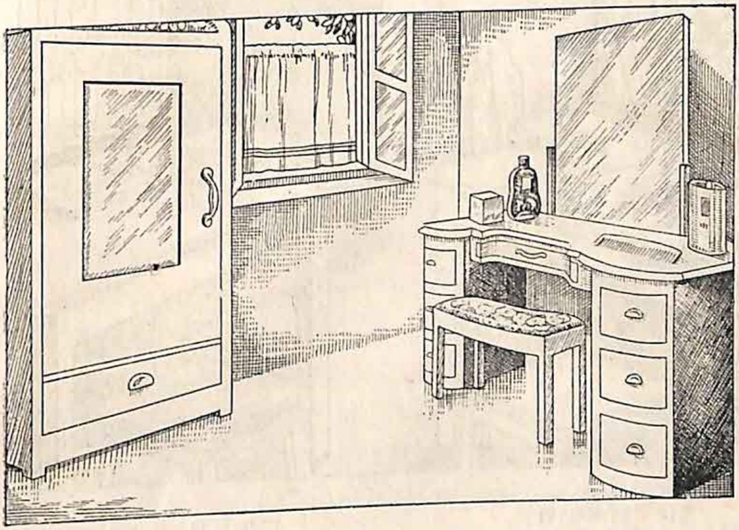


আদর্শ শয়ন ঘর

নানা অসুবিধে হওয়ার আশঙ্কা থাকে। শয়ন-ঘরে একটি আলমারি বা চেষ্ট্‌ অব ড্রয়ারর্স, একটি ড্রেসিং টেবিল ও তার সামনে বসবার আসন এবং ছোট একটি টেবিল ছাড়া আর কোন আসবাব-পত্র রাখা উচিত নয়। সম্ভবপর হলে আলমারি বা চেষ্ট্‌-অব ড্রয়ার্স ও ড্রেসিং টেবিলকে কাপড় ছাড়ার ঘরে রাখলে আরো ভাল হয়। শয়ন-কক্ষে ছেলে-মেয়েদের খাটে এমনভাবে রেলিঙ-এর ব্যবস্থা থাকবে, যাতে তাকে ইচ্ছে-মত একদিকে উঠানো কিংবা নামানো যায়। খাটে রেলিঙ না থাকলে ছেলেমেয়েদের ঘুমন্ত অবস্থায় পড়ে গিয়ে আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। শয়ন-ঘর ছোট হলে দুটি খাটের মাঝখানে একখানা পাখা, কিংবা বড় হ'লে দুটি খাটের উপরে দুখানি পাখারই বন্দোবস্ত থাকা উচিত।

কাপড়-ছাড়ার ঘরে এমন একটি আলমারি থাকবে যাতে একদিকের তাকে পাট করা কাপড়গুলি এবং অপরদিকে হাঙ্গারে ক'রে কোট, পাঞ্জাবী, ব্লাউজ প্রভৃতি ঝুলিয়ে রাখতে পারা যায়। একটি ড্রেসিং টেবিল ও তার সামনে বসবার জন্য একটি টুল কিংবা ছোট চেয়ার থাকবে। সেখানে বসে চুল-বাঁধা, টাই-কলার পরা, স্নো-পাউডার মাখা, প্রভৃতি প্রসাধনের সকল কাজ চলতে পারে।

সেখানেই পাশে থাকবে আলনা, যাতে রোজকার পরনের কাপড়-চোপড়



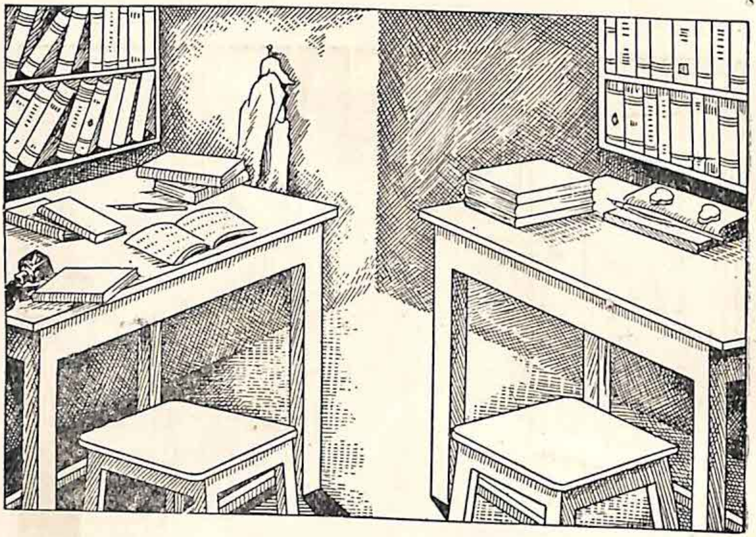
ড্রেসিং রুম

পরিপাটিভাবে সাজানো থাকবে। তার নীচে থাকবে ঢাকনি-দেওয়া জুতোর-বাক্স, যাতে খোলা-অবস্থায় জুতোয় ধুলোবালি পড়ে ময়লা না হতে পারে।

সে ঘরেই থাকবে একটি ময়লা কাপড়ের বাক্স, যাতে ধোবার অপেক্ষায় ময়লা কাপড়গুলিকে যেখানে-সেখানে জড় না করে, তার মধ্যে জড় করে রাখা যায়। কাপড়-ছাড়ার ঘরে একখানা পাখা থাকলেই ভাল হয়, কারণ অনেক সময় কাপড়-চোপড় পরবার কালে গরমে একেবারে গলদ্‌ঘর্ম হতে হয়। পড়বার ঘরে বা অফিস-রুমে থাকবে টেবিল, তার উপর দোয়াত, কলম প্রভৃতি, বসে লেখাপড়া বা অফিসের কাজ করবার জন্য চেয়ার এবং অপর আর একখানি কিংবা দুখানি আসন এবং বই বা কাগজ-পত্রকে সাজিয়ে রাখার জন্য বইএর সেল্‌ফ বা তাক। সে ঘরে বাতিটি থাকবে পেছনে কিংবা বাম পাশে। লেখা-পড়া কিংবা কাজকর্ম করার সময় কখনো বাতির মুখোমুখি বসা উচিত নয়। এখানেও ছাতে একটা পাখা থাকবে।

ছেলেমেয়েদের খেলার ঘরে থাকবে খেলার নানা সাজসরঞ্জাম। ছেলেদের জন্য কাঠের ঘোড়া, খেলার মোটর, ট্রেন, এরোপ্লেন ইত্যাদি, যাতে খেলা-ধূলোর

সঙ্গে সঙ্গে তারা নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারে। আর মেয়েদের জন্য



পড়ার ঘরের অব্যবস্থা পড়ার ঘরের রুচিসম্মত ব্যবস্থা



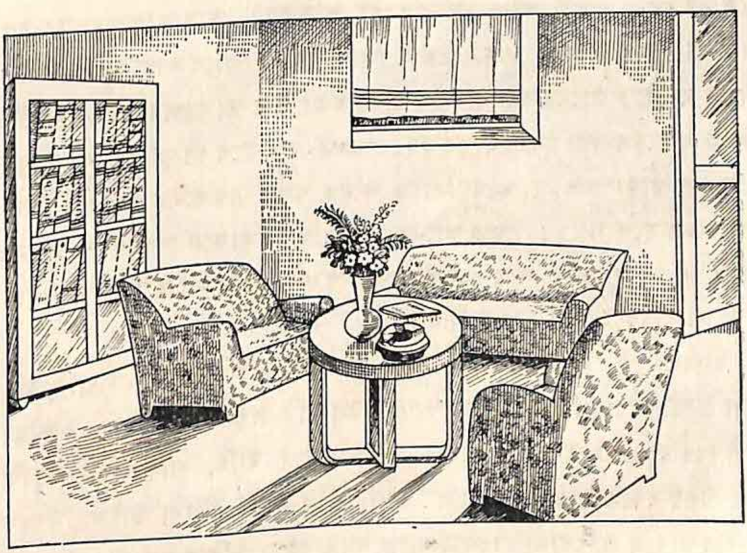
ছেলেমেয়েদের খেলার ঘর

থাকবে পুতুল, পুতুলকে শোয়ানোর জন্য খাট, খাওয়ানোর জন্য রান্না-বান্নার সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি, যাতে তাদের মনের স্বাভাবিক ভাবগুলি ঐ খেলার মধ্য

দিয়েই সূচিত হতে পারে। সেখানে থাকবে তাদের বসবার জন্য ছোট টেবিল-চেয়ার প্রভৃতিও। খেলাঘরের আসবাব-পত্র শুধু খেলার উদ্দেশ্যেই থাকবে না, তা হবে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতীক।

আধুনিক প্রথায় খাবার ঘরে থাকবে খাবার জন্য গোল বা ডিমের মত আকারের টেবিল ও চেয়ার-সমূহ, আর থাকবে বাসন-কোসন সাজিয়ে রাখার জন্য আলমারি ও মিটসেফ বা জালের আলমারি, যার মধ্যে খাবার রাখলে মশা-মাছির দ্বারা তা দূষিত হবে না। কিন্তু যে সকল বাড়ীতে মেঝেতে আসন পেতে খাওয়ার ব্যবস্থা, সে মেঝেতে জোড় যত কম থাকে, ততই ভাল। প্রত্যেক লোকের জন্য আসন পেতে, গেলাসে জল দিয়ে ধোওয়া থালা উপুড় করে তা ঢেকে রাখতে হবে, যাতে জলে কিংবা থালাতে ধুলোবালি না পড়ে। খাবার এরকম ব্যবস্থা যেখানে, সেখানে কেবল খাবার-রাখার জন্য জালের আলমারি ছাড়া আর কোন আসবাবপত্র রাখা উচিত নয়। কেননা, খাওয়া হয়ে গেলে এঁটো-কাঁটাসহ বাসনগুলি উঠিয়ে নিয়ে যখন মেঝেকে ভাল করে ধুয়ে দিতে হয়, তখন অন্যান্য আসবাবপত্র থাকলে জলের ছিটে লেগে সেগুলি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

বৈঠকখানা বা ড্রয়িংরুমে থাকবে আরাম করে বসবার জন্য গদীআঁটা চেয়ার,



ড্রয়িং রুম

সোফা প্রভৃতি, তাদের পাশে থাকবে ছোট ছোট কয়েকটি টেবিল, তার উপরে থাকবে "অ্যাশট্রে"—যাতে সিগারেট বা সিগারের ছাইতে ঘরের মেঝে বা

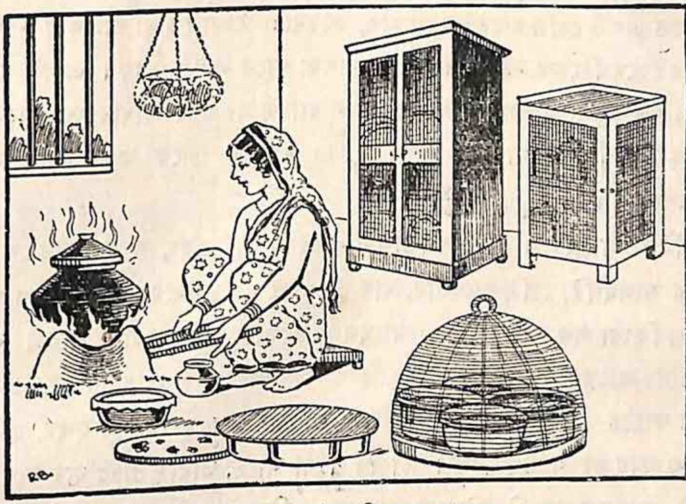
কার্পেট নষ্ট না হয়। ঘরের মাঝখানে থাকবে একটি মাঝারি নীচু গোল টেবিল। তার উপর ফুলের 'ভাস'। বৈঠকখানা ঘর বড় হলে ঐসঙ্গে কিংবা সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকের বসবার ঘরে থাকবে একটি তক্তপোশের উপর গদী ও পরিষ্কার চাদরে ফরাস পাতা এবং তার উপরে দুতিনটি তাকিয়া এবং প্রয়োজন-মত কয়েকখানি চেয়ার ও ছোট টেবিল। একটা 'শো-কেস' কিংবা সাজানো বইএর আলমারিও থাকতে পারে। মেঝেতে পারস্যদেশীয় বা কাশ্মীরী কার্পেট, এবং অর্গ্যান, পিয়ানো প্রভৃতিও বড়লোকদের বৈঠকখানায় স্থান পায়।

স্নানের ঘরেও কিছু কিছু আসবাব আবশ্যক। মুখ-ধোয়ার জন্য একটি চীনেমাটির বেসিন থাকা ভাল, তা না হলে জলের ছিটেয় কাপড়-চোপড় নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। দাঁড়িয়ে বা বসে স্নান করার জন্য একটা কাঠের পিঁড়ি থাকলে ভাল হয়, যার মধ্যে চৌকো চৌকো ফাঁক থাকবে, আর তা দিয়ে জল গড়িয়ে নরদমায় চলে যাবে। দাড়ি-কামানোর জন্য দেওয়ালে একখানি ছোট আয়না থাকা ভাল, আর তার নীচে একটি কাচ বা অন্য কিছুর তাক থাকবে, সাবান, বুরুশ প্রভৃতি রাখার জন্য। কাচ জলে বা সাবান-জলে নষ্ট হয় না বলেই, তাক কাচের হলেই ভাল হয়। আর কাপড় রাখার জন্য খানিকটা দূরে থাকবে একটি ছোট আলনা বা দেওয়ালে লাগানো ব্র্যাকেট। অনেক বাড়ীতে স্নানের জন্য বাথ-টব ব্যবহৃত হয় এবং তা সাধারণতঃ চীনেমাটির কিংবা এনামেল করা কোন ধাতুর হয়। একই বাথ-টবে গা ডুবিয়ে বহুলোকের স্নান করা স্বাস্থ্যসম্মত নয়, কারণ তাতে অনেক সময়ে একজনের চর্মরোগ আর এক জনের হতে পারে। আর স্নানের ঘরে বাথ-টব থাকলে অবশ্যই তা স্নানের আগে ও পরে ভাল করে ধুয়ে রাখতে হবে এবং মাঝে মাঝে 'ভিম' বা সোডা দিয়ে তা পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত।

রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘরে থাকবে কয়েকটি জালতি-ঢাকা আলমারি, যার মধ্যে তৈরী খাবার কিংবা টাটকা ফলমূল, তরকারি প্রভৃতি রাখা যায়। কারণ রান্না হয়ে যাওয়া-মাত্র তাতে খাবার ভরে রাখলে মাছি, আরশোলা প্রভৃতি তার উপর বসতে পারবে না, এবং তাজা শাক-সবজি কিংবা টাটকা ফলমূল এভাবে রাখলে তা খোলা হাওয়ায় থাকে ব'লে সহজে শুকিয়ে যায় না।

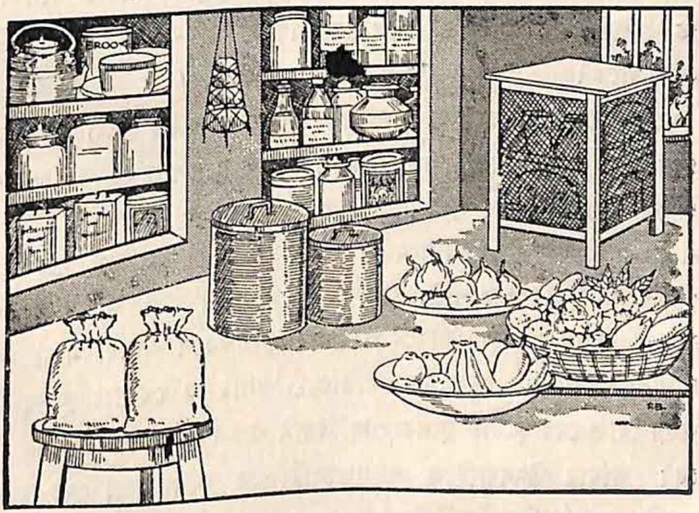
তা ছাড়া সামর্থ্যে কুলিয়ে উঠলে বাড়ীতে একটি রেফ্রিজারেটার থাকলে মন্দ হয় না। গরমের সময় তাহতে সর্বদাই বরফ ও ঠাণ্ডা জল পাওয়া যেতে পারে। বাজারের বরফ কখনই খাওয়া উচিত নয়, কারণ অনেক সময়ে তা

খেলে টাইফয়েড, আমাশয়, কলেরা প্রভৃতি হতে পারে। সেজন্যই



জালতি-ঢাকা আলমারি-সমেত রান্নাঘর

রেফ্রিজারেটারে বিশুদ্ধ জল জমিয়ে খেলে আর তেমনি কোন রোগের আশঙ্কা



জালতি-ঢাকা আলমারি-সমেত গোছানো ভাঁড়ার ঘর

থাকে না। তা ছাড়া আমাদের এ গরম দেশে মাছ, মাংস, ডিম, মাখন, দুধ, ফলমূল প্রভৃতি অতি সহজেই নষ্ট হয়ে যায় এবং খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে,

এমনকি রান্নাকরা ডাল, তরকারি প্রভৃতিও সময়ে সময়ে গরমে টকে যায় বাড়ীতে একটি রেফ্রিজারেটার থাকলে, তারমধ্যে তাজা কিংবা রান্নাকরা খাবার-দাবার রেখে দিলেও নষ্ট হবার কোন আশঙ্কা থাকে না। এরকম একটি যন্ত্রের দাম কিন্তু প্রচুর, সুতরাং সর্বসাধারণের সাধ্যায়ত্ত নয় এবং সাধারণতঃ বাড়ীতে ইলেকট্রিক কিংবা গ্যাসের বন্দোবস্ত না থাকলে তাকে কাজে লাগানোও সম্ভবপর নয়।

নিত্য-ব্যবহার্য আসবাব-পত্রগুলি সাধারণতঃ কাঠের হয়, অবশ্য কোন কোনটি যেমন আলমারি, রেফ্রিজারেটার, বাথ-টব, এবং সময়ে সময়ে চেয়ার-টেবিল পর্যন্ত লোহা কিংবা অন্য ধাতুর উপর এনামেল বা ইলেক্ট্রোপ্লেট করাও পাওয়া যায়। সেগুলি কাজের হলেও আরাম কিংবা সৌন্দর্যের দিক্ হতে খুব উপযুক্ত নয়। ভাল কাঠের (যেমন মেহগনি প্রভৃতির) আসবাব-পত্র দেখতে খুব সুন্দর, সুতরাং দামও তার হয় অত্যন্ত বেশী। যাঁদের পয়সা আছে, তাঁরাই প্রচুর ব্যয় করে এত দামী আসবাব-পত্রাদি কিনতে পারেন। কিন্তু স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত যাঁরা, তাঁদের পক্ষে এমন আসবাব-পত্র কেনা উচিত যা তাদের গৃহের পরিবেশের পক্ষে উপযুক্ত, খুব দামী নয়, অথচ আরামদায়ক এবং দেখতেও ভাল। খুব দামী আসবাব-পত্রও অযত্নে শীঘ্রই বিশ্রী ও অকেজো হয়ে পড়ে। আবার অপেকাকৃত সুলভ যেগুলি, যত্ন করে ও দেখে শুনে রাখলে, বহুদিন পর্যন্ত সেগুলি সুশ্রী ও ব্যবহার্য থাকে।

গৃহে ফুলের ব্যবহার ও বিন্যাস—ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে ফুল একটি অপরূপ বস্তু। ফুল দেখে খুসী হয়না কিংবা তার সুবাসে তৃপ্ত হয় না এমন লোক খুবই কম আছে। কথায় বলে 'ফুলের মত সুন্দর,' 'ফুলের মত পবিত্র' ইত্যাদি। নানা রঙ-বেরঙের ফুল শুধু বাগানেরই সৌন্দর্য বাড়ায় না, সংক্ষেপে গৃহেও এক অপূর্ব সৌন্দর্য ফুটিয়ে তার পরিবেশকে সজীব, আনন্দ-মুখর ও আমোদিত করে তোলে। সেজন্য দৈনন্দিন জীবনে আনন্দের প্রতীকরূপে আমরা নানা কাজে ফুল ব্যবহার করি। পূজো, ঘর-সাজানো, গলায় ও খোঁপায় ফুলের মালা, কোটের বোতামের ফুটোয় ফুলের গুচ্ছ, এমনি কত কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আবার উৎসবাদিতে ও সভাসমিতিতে ফুলের সজ্জা এবং বর-কনে, সভাপতি ও সম্মানিত অতিথির গলায় ফুলের মালা হতে আরম্ভ করে সমাধিস্থানে পর্যন্ত ফুলের অর্ঘ্য—অর্থাৎ ফুল একাধারে সৌন্দর্যের উপাদান, পূজার উপচার, ভালবাসা ও সম্মানের প্রতীক এবং শ্রদ্ধার অর্ঘ্য। আবার এই ফুলই গৃহসজ্জার একটি প্রধান অংশ বল্‌লেও চলে। বাড়ীতে বাগান

থাকলে বা না থাকলেও সিঁড়িতে আমরা বসাই ফুলের টব, এবং ছাতেও ফুলের টবে ফুল ফুটিয়ে আমরা বাগানের আকাঙ্ক্ষা মেটাই। আবার ডাঁটাশুদ্ধ ফুল তুলে এনে তাকে উপযুক্ত পাত্র বা আধারে রেখে আমরা পূজোর ঘর, বৈঠকখানা ঘর, শোয়ার ঘর ও খাবার ঘরে যথাস্থানে স্থাপন করে যে কোন ঘরের সাজসজ্জাকে অনেকটা বাড়িয়ে তুলতে পারি। নিত্য-প্রয়োজন ও ব্যবহারের পক্ষে দুভাবে ঘরের মধ্যে ফুলকে রাখা চলে। (১) উপযুক্ত আধার বা ভাসে জলদিয়ে ডাঁটা ও পাতাশুদ্ধ ফুলকে তার মধ্যে সাজিয়ে, পূজোর ঘরে ঠাকুরের সামনে, উপাসনার বেদীতে, বৈঠকখানা ঘরে টেবিল কিংবা তাকের উপর, খাবার ঘরে টেবিলের উপর এবং শোয়ার ঘরেও টেবিল বা তাকের উপর রাখা যায় কিংবা (২) ফোটাফুল-শুদ্ধ টবের গাছকে, একটি পিতলের পাত্রে রেখে, তাকে ঘরের কোণে, সিঁড়ির দুপাশে কিংবা অন্য কোন উপযুক্ত স্থানেও রাখা যায়। প্রথম উপায়টি সহজ, কিন্তু নিত্যনতুন ফুল এনে বাসিগুলোকে সরিয়ে দিয়ে আধারের জল বদলে তার মধ্যে ফুলকে বসাতে হয়, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে টবের গাছেই ফুল ফুটতে থাকে বলে রোজ বদলাবার পরিশ্রম-টুকু নেই বটে, কিন্তু তাহলেও টবের গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে নিয়মিত জল দেওয়া ও মাঝে মাঝে তাকে রোদে ও হাওয়ায় বের করে রাখার বন্দোবস্ত থাকা চাই; তাছাড়া তার জন্য উপযুক্ত পিতলের আধার, তাকে পরিষ্কার করার শ্রম, এবং টবশুদ্ধ গাছকে বসানোর জন্য উপযুক্ত আসনেরও পাকা বন্দোবস্ত চাই। প্রথম উপায়ে গৃহের সৌন্দর্য বাড়াতে সকলেই পারে, তার জন্য শুধু চাই সামান্য পরিশ্রম ও সৌন্দর্যজ্ঞান; এটুকু থাকলেই কী কুড়েঘর কী অট্টালিকা, সবস্থানেই অনায়াসে সাময়িকভাবে ফুলের সাহায্যে অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়ে তোলা যায়। দ্বিতীয় উপায়টি শুধু বিত্তশালী লোকের পক্ষেই সম্ভবপর; উপযুক্ত টেবিল চাই, উপযুক্ত পিতলের আধার চাই, উপযুক্ত ফুলফোটা অবস্থায় টবের গাছ চাই এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য উপযুক্ত লোকও চাই।

ফুলের আধার বা 'ভাস' গুলি নানা উপাদানে তৈরী হতে পারে। তা কাটগ্লাসে তৈরী হলে অতি দামী, রূপো, পিতল কিংবা সাধারণ কাচে তৈরী হলে অপেক্ষাকৃত কমদামী কিংবা মাটিতে তৈরী হলে অতি সস্তা জিনিসও হতে পারে। কাচের ভাসগুলি সহজেই পরিষ্কার থাকে, কিন্তু অসতর্ক ব্যবহারে পড়ে গিয়ে ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা খুবই। রূপো কিংবা পিতলের ভাসকে 'সিলভো' কিংবা 'ব্রাসো দিয়ে ঘসে সর্বদা পরিষ্কার ও চক্‌চকে রাখতে হয়, তা না হলে

জল ও বাতাস লেগে সেগুলি যখন ময়লা হয়ে যায়, তখন আর তাদের কোন সৌন্দর্যই থাকে না। মাটির পাত্রগুলি অনেক সময়ে মসৃণ ও চকচকেই (glazed) কিনতে পাওয়া যায়; তাছাড়া সাধারণ মাটির পাত্রগুলির উপর রঙ ও তুলি দিয়ে পছন্দমত নক্সা করে নিলে দেখতেও মন্দ হয় না। মাটির ভাস্‌গুলি ভঙ্গুর হলেও তাদের দাম বেশী নয় ব'লে ভেঙ্গে গেলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না।

পরিষ্কার ও চকচকে ভাসগুলির মধ্যে পরিমাণ-মত জল ঢেলে, পাতা শুদ্ধ তুলে আনা কিংবা কিনে আনা ফুলসহ ডাঁটাগুলিকে কাঁচি দিয়ে ভাল করে ছেঁটে এমনভাবে একটি-একটি ক'রে ঐ জলে বসিয়ে দিতে হয়, যাতে ডাঁটাগুলির বেশ খানিকটে অংশ জলে ডুবে থাকে এবং কয়েকটি পাতাশুদ্ধ ফুলটি পাত্রের খানিকটা উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। এভাবে নানা রঙ-বেরঙের ফুলের সাহায্যে ভাসের মধ্যে ফুল-সাজানো খুব সহজ নয়, কারণ তার জন্য চাই উপযুক্ত সৌন্দর্যজ্ঞান, কোন রঙের পাশে কোন রঙ মানানসই হবে তার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা এবং কতকটা ধৈর্য। যেকোন প্রকারে ডাঁটাশুদ্ধ কতকগুলি ফুলকে ভাসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেই হয়না, কতগুলি ফুল পাশাপাশি একে অন্যের উপর চাপ না দিয়ে বসবে কিংবা চাপ কম থাকাতে এদিকে সেদিকে হেলে না প'ড়ে উপযুক্ত সৌন্দর্যের সৃষ্টি করবে, সে অনুযায়ী শিল্পীমন ও মাত্রাজ্ঞান থাকা চাই, তা না হলে যত দামী ফুলই হোক না কেন, তার দ্বারা উপযুক্ত ও আকাঙ্ক্ষিত প্রভাব ও পরিবেশের সৃষ্টি কখনই সম্ভবপর হবেনা। লাল কিংবা গোলাপী ফুলের পাশে সবুজ পাতা, কমলা রঙের কিংবা হল্‌দে ফুলের কাছে নীল ফুল, এম্নি একে অন্যের অনুপূরক রঙের (Complimentary Colours) পাশাপাশি অবস্থানে বিশেষ বিশেষ রঙের উজ্জ্বলতা কী ভাবে আরো বেশী করে ফুটে উঠতে পারে, তা শুধু জানেন তাঁরাই যাঁরা চিত্রকর বা শিল্পী, কিংবা যাদের মনে বিভিন্ন রঙের প্রভাব-সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা আছে। কাজেই অন্যান্য শিল্পের মতই ফুলের বিন্যাস বা স্তবক-সৃষ্টিকে একটি শিল্প বলে ধরে নিলে এর জন্যও উপযুক্ত সাধনা ও অভ্যেস থাকা আবশ্যক। আবার ফুলের তোড়ার রঙও ঘরের দেওয়াল, আসবাবপত্র ও দরজা-জানালার পর্দার সঙ্গে মানানসই হওয়া চাই। দেওয়ালের রঙ, পর্দার রঙ, কিংবা আসবাবপত্রের ঢাকনি বা কার্পেটের রঙ এবং ফুলের রঙ এক হলে ঘরে সে রকম বাহার হয়না, কিন্তু যদি ঘরে সবুজ পর্দা থাকে কিংবা দেওয়ালের রঙ সবুজ হয়, তাহলে লালফুলের তোড়া সে ঘরের সৌন্দর্য অনেকটা বাড়াবেই। একইভাবে পর্দার বা দেওয়ালের রঙ নীল হলে, কমলা রঙের বা হল্‌দে ফুলে যেমন ঘরের সৌন্দর্য বাড়ে, আবার তেমনি

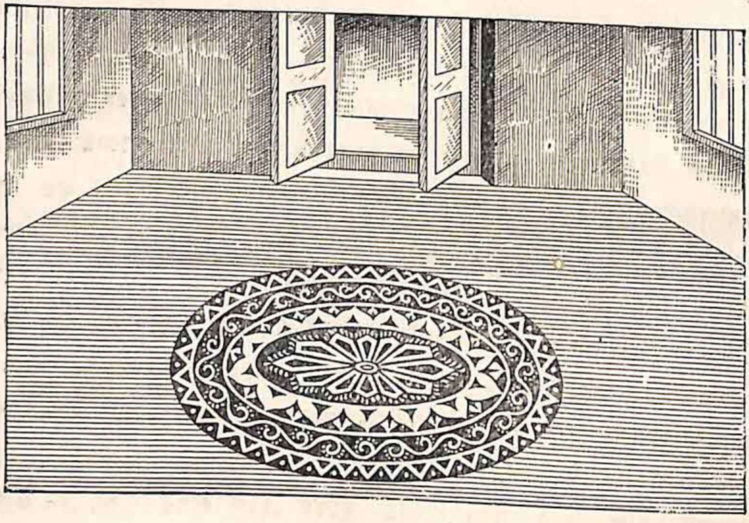
দেওয়ালের রঙ হলদে হলে নীল ফুলই সে ঘরে মানাবে ভাল। শুধু রঙের জন্যই নয়, ঘরে এমন ফুলই রাখা উচিত যাদের সুবাসে ঘরের আবহাওয়াও সুবাসিত হয়ে উঠে। এজন্যই নানা রঙের গোলাপ, গন্ধরাজ, চাঁপা, বেল, জুঁই, রজনীগন্ধা প্রভৃতি ফুল, বিশেষতঃ শয়নঘরে ফুলের ভাসের মধ্যে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সভা-সমিতি বা উৎসব-উপলক্ষে রঙবেরঙের ফুল দিয়ে ঘরের খুঁটি, স্তম্ভ, কিংবা দরজা-জানালার চৌকাট এবং বরের গাড়ীও অতি সুন্দরভাবে সাজানো যেতে পারে।

স্থান ও সময়বিশেষে বিভিন্ন রঙের ফুলের ব্যবহারই সঙ্গত ও সুরুচির পরিচায়ক। এজন্যই বোধ হয় বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজায়ও বিভিন্ন রঙের ফুলের ব্যবস্থা। নারায়ণ ও শিবের পূজায় সাদা কিংবা সোনালী ফুলই প্রশস্ত, কিন্তু শক্তি-পূজোয় রক্তের মত রাঙাফুল বাঞ্ছনীয়, দুর্গাপূজায় অপরাজিতা প্রভৃতি নীলফুল এবং নানারঙের পদ্মফুলই প্রকৃষ্ট। শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে, মৃতের শবাধারে কিংবা সমাধিস্থলে অর্ঘ্যরূপে সাদাফুলের ব্যবহারই যুক্তিসঙ্গত। অন্যান্য উৎসবাদিতে, নানা রঙের ফুলের সাহায্যে উৎসব-স্থানের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য-বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত। বরকনের মালা-বদলের জন্য মালা, প্রসাধনের জন্য খোঁপা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত মালা, কিংবা ফুলশয্যায় ব্যবহৃত ফুলগুলি সুবাসিত ও সাদা রঙের হলেই ভাল হয়। কোটের বোতামের ফুটোয় পরবার ফুলের স্তবক, সাধারণতঃ সরু ও চিকণ পাতার সঙ্গে লাল ফুল দিয়েই তৈরী হয়। কোটের রঙের সঙ্গে মানানসই ফুলের রঙ হলেই দেখতে ভাল হয়।

আলপনা—পূজা ও উৎসবাদিতে গৃহসজ্জার আর একটি বিশেষ অঙ্গ, হাতের সাহায্যে কারুশিল্প বা আলপনা। কুড়ে ঘরের গোবর-মাটি নিকানো মেঝেই হোক, আর পাকা বাড়ীর মেঝেই হোক বিশেষ বিশেষ দিন ও ক্ষণে মেঝেতে আলপনার সাহায্যে গৃহের সৌন্দর্যকে অনেকটা বাড়িয়ে তোলা যায়। কোন কোন সময়ে কুড়ে ঘরের মেটে দেওয়ালেও উপযুক্ত আলপনা দেওয়া হয়, কিন্তু মেঝের আলপনা হতে তা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আলপনার সাহায্যে ঘরের রূপসজ্জা বাড়াতে হলে নানাবিষয়ে মাত্রাজ্ঞান ও কতকটা সৌন্দর্যজ্ঞানও আবশ্যক। ঘরের মেঝের কিংবা দেওয়ালের আকার ও প্রকারের সঙ্গে আলপনার নক্সার আকার ও প্রকারের অনুপাত ঠিক না হলে, ঠিক মানানসই হয় না। তা ছাড়া পূজো-পার্বণে ও অন্যান্য উৎসবভেদেও আলপনার নক্সারও পরিবর্তন করতে হয়। সূচীকার্য, ছবি-আঁকা প্রভৃতি কারুকার্যের মতই আলপনার বেলাও বাইরের আকার ও ভিতরের শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি থাকা চাই। ছন্দের

তালে তালে হয় যে রূপের সৃষ্টি, যে কোনো কারুশিল্পের তাই প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং চিত্রশিল্পীর হাতের তুলিকায় রঙের ছন্দায়িত হিল্লোলে যেমন অরূপের স্থানে হয় রূপের সৃষ্টি, তেমনি অতি সাদাসিধে মেঝেতেও শিল্পীর দক্ষ আঙ্গুল-ক'টি মনের ছন্দকে যদি উপযুক্ত ভাবে রেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারে, তবেই হয় সার্থক তার রূপসৃষ্টির প্রয়াস। সুতরাং আলপনা-শিল্পে সাফল্যের জন্য উপযুক্ত সাধনা, একাগ্রতা, ও শিল্পীমনের সৌন্দর্যজ্ঞান একান্ত আবশ্যক

উপযুক্ত পরিমাণ জলে খড়ি বা পিটুলি গুলে তাতে আঙ্গুল ডুবিয়ে, আঙ্গুলের ফাঁকে অল্প তুলো কিংবা ছোট এক টুকরো ন্যাকড়া ঐ সাদা রঙে ভিজিয়ে নিয়ে বুড়ো আঙ্গুল ও কড়ে আঙ্গুল ছাড়া অপর তিনটি আঙ্গুলের সাহায্যে আলপনা

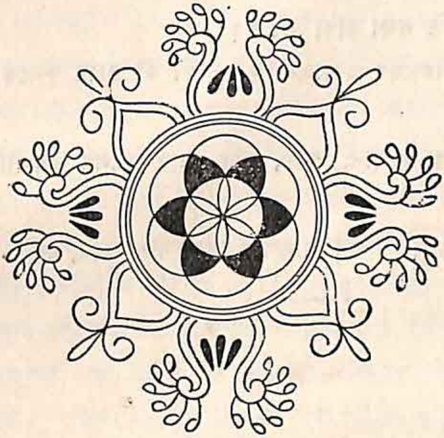


ঘরের মেঝেতে আলপনা

দিতে হয়। প্রথমেই আলপনার স্থানটিকে ভাল করে ঝাঁট দিয়ে নিতে হয়। আলপনা দেওয়ার আগে জল দিয়ে মোছা উচিত নয়। তারপর উৎসবের উপযোগী মনোমত একটা নক্সার আবছা আভাষ এঁকে নিতে হয় চক বা এম্নি কিছু দিয়ে মেঝের উপর, এবং তারপরে আঙ্গুলের ডগায় পিটুলী কিংবা খড়ি-গোলা জল নিয়ে ঐ আবছা দাগগুলির উপর সোজাসুজি সাদারঙ বুলিয়ে যেতে হয়। তার মধ্যে লতার সঙ্গে পাতার, পাতার সঙ্গে ফুলের সব কিছুরই আকৃতি ও প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য থাকা চাই এবং প্রত্যেকটি সরল ও বাঁকা রেখাও সমান চওড়া এবং তরঙ্গায়িত বাঁকারেখার তরঙ্গগুলিও সমান হওয়া চাই। প্রথমে,

যতক্ষণ সাদা রঙ ভাল করে শুকিয়ে না যায়, ততক্ষণ আলপনাটি ভালভাবে ফুটে উঠে না ; আলপনার প্রকৃত রূপ ও সৌন্দর্য সুষ্ঠুভাবে ফুটে উঠে, যখন সাদা রঙটি ভালভাবে শুকিয়ে যায়, তখনই।

আলপনা শিল্প বাংলাদেশের একটি অতি প্রাচীন শিল্প, কারণ মুসলমান-যুগে লেখা বইগুলিতেও তার উল্লেখ আছে। মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশেও





আলপনার নমুনা

(পার্শিসমাজে) অন্যভাবে আলপনার প্রচলন আছে। উপযুক্ত ছাপের সাহায্যে অসংখ্য ফুটোর দ্বারা নক্সা করা একটা টিনের উপরে চকের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে সচ্ছিদ্র টিনের টুকরোকে সরিয়ে নিলে, ঐ নক্সানুযায়ী সাদা গুঁড়োর সাহায্যে যে ছাপ পড়ে, তাও দেখতে অনেকটা আলপনার মতই। তবে তার জন্য হাতে আঁকা আলপনার মত মোটেই পরিশ্রম করতে হয়না, আলপণার এরূপ বিকল্পে গৃহকর্ত্রীর এ শিল্পে কুশলতার কথাও প্রকাশ পায় না। চর্চার অভাবে বাংলাদেশেও এ শিল্পের অনেকটা অবনতি ঘটে তা প্রায় লোপ পেতে বসেছিল, কিন্তু সুখের বিষয় এই যে বর্তমানে 'বিশ্বভারতী'র চেষ্টায় ও কল্যাণে এ লুপ্ত-প্রায় শিল্পকলার অনেকটা পুনরুদ্ধার সম্ভবপর হয়েছে।

স্থান ও কালোপযোগী কতকগুলি আলপনার নক্সা, এই সঙ্গে দেওয়া গেল। এগুলি নমুনামাত্র ; আদর্শ শিল্পী যিনি তিনি নিজের মন হতেই চেষ্টা ও সাধনার ফলে, এর চেয়ে অনেক ভাল রূপ ও রস সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন

১। গৃহসজ্জা বলতে কী বুঝায়? স্বাস্থ্যসম্মত ও রুচিসম্মত সহজ গৃহ-সজ্জার উপায় কি?

২। জানালা-দরজার উপর পর্দার আবশ্যকতা কি? নানারকম পর্দার সুবিধে-অসুবিধের তুলনা কর।

৩। গৃহের আসবাবপত্র কী রকম হওয়া উচিত? তাদের মনোনয়নে ও সংস্থানে কী কী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত?

৪। গৃহসজ্জায় ফুল-ব্যবহারের প্রয়োজন কি? কী কী ভাবে ফুলকে গৃহ-সজ্জায় ব্যবহার করা যায়?

৫। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও স্থান, কাল, পাত্র-ভেদে ফুলের রকমারিত্বার আবশ্যকতা কি?

৬। আলপনা কাকে বলে? সুষ্ঠু আলপনা সম্বন্ধে যাহা জান, বল।

তৃতীয় অধ্যায়

গৃহস্থালি-পরিচালনা

গৃহস্থালি অনেকটা ছোট-খাটো রাজত্বের মতই কিন্তু এখানে রাজত্ব করেন গৃহলক্ষ্মী যিনি, তিনি। রাজ্যশাসনে যেমন প্রজাপালন, রাজস্ব-বিভাগ, আয়-ব্যয়-বরাদ্দ-বিভাগ, শ্রমবিভাগ, খাদ্যবিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, প্রভৃতি নানা বিভাগের কার্য সুশৃঙ্খলার সঙ্গে চালাতে হয়, ছোট-খাটো গৃহেও এরকম অনেক বিভাগেরই কাজকর্ম দেখা-শোনা ও তার সুষ্ঠু পরিচালনা করতে হয় গৃহ-কর্ত্রীকে। আয়ব্যয়ের হিসেব রাখা, ছেলে-পুলে মানুষ করা, তাদের শিক্ষা, পরিবারের সকলের খাওয়া-দাওয়া, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত, রোগীর পরিচর্যা, বাড়ীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, ময়লা কাপড়-কাচার বন্দোবস্ত, ধোবার কাপড়ের হিসেব, চাকর-বাকরকে চালানো, অতিথি-অভ্যাগতের আপ্যায়ন, সামাজিকতা-রক্ষা, এমনি কত কিছু, গৃহ যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তার কর্তব্যের অন্তর্গত। সুতরাং একাকী কারো পক্ষে নিজের হাতে এতগুলি গুরুদায়িত্ব-ভার বয়ে যাওয়া শুধু কষ্টকরই নয়, দুঃসাধ্য বল্লেও চলে। অতএব অনেক সময়েই গৃহকর্ত্রীকে অবস্থা-অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে হয়, অর্থাৎ পয়সা থাকলে চাকর-দাসী, সরকার-গোমস্তা রেখে, কিংবা তা না থাকলে পরিবারেরই অন্য কেউ, যেমন জা, ননদ কিংবা মেয়ের উপর ভিন্ন ভিন্ন কাজের ভার দিয়ে, কাজ-চালানোর ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু তাদের উপর ভার দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকলে চলে না; তাদের উপযুক্ত নির্দেশ দিতে হয় এবং সব সময়েই সব কিছুর প্রতিই সতর্ক দৃষ্টি না থাকলে অপরের কুড়েমি, গাফিলতি বা বুঝবার ভুলেও নানা কাজ পণ্ড হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সুগৃহিণীর কর্তব্য সকল কাজেরই তদারক ক'রে যাতে সেগুলি সুসম্পন্ন হয়, তার ব্যবস্থা করা। বড় ঘরের ঘরণীর ডাইনে বামে হামেহাল লোকজন থাকাতে নিজের হাতে কিছু না করলেও চলে, কিন্তু মধ্যবিত্ত ঘরে অনেক কিছুই এবং গরীবের ঘরে প্রায় সবটুকুই মেয়েদের নিজের হাতে করতে হয় ব'লে দেহ ও মনের পক্ষে অবসর-লাভের সৌভাগ্য কদাচিৎ ঘটে। কিন্তু মানুষ ত আর যন্ত্র নয় যে সারাদিন-রাত একটানা কাজ চালিয়ে যেতে পারে; রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের ভঙ্গুর দেহের পক্ষে অবসর ও বিশ্রাম দুইই একান্ত আবশ্যক। সুতরাং নিত্য নৈমিত্তিক গৃহকর্মের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা একান্ত

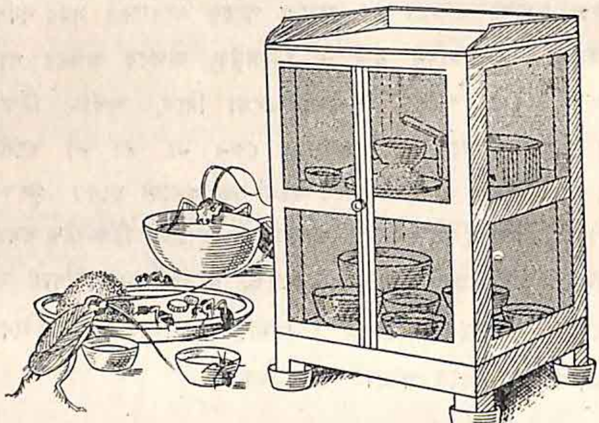
আবশ্যক। সে পরিকল্পনায় ঘড়ীর কাঁটার মতই সংসারের সব কিছু কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রতি কর্তব্য অর্থাৎ নিজের খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি যত্ন, এ সব কিছুর জন্যও কিছু না কিছু সময়েরও ব্যবস্থা ও বরাদ্দ থাকবে। এ ভাবে পরিকল্পনা-মত কাজ করে গেলে ক্লান্তির পর বিশ্রাম, সময় মত স্নানকরা ও খাওয়া প্রভৃতির ফলে যদি স্বাস্থ্য ভাল থাকে তাহলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, গৃহস্থালির কাজ যতই দুরূহ, কষ্টসাধ্য বা একঘেয়ে হোক না কেন, তা চালিয়ে যেতে বিশেষ কষ্ট হবে না। কিন্তু এরূপ কোন পরিকল্পনা না থাকলে, রান্না করতে করতে যদি কোলের ছেলেকে স্নান করাতে হয়, কিংবা খেতে বসে মুখে দুগ্রাস তুলতে না তুলতে যদি অতিথি-অভ্যাগতকে আপ্যায়নের জন্য ছুটে যেতে হয়, কিংবা ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে খাওয়াতে ধোবার হিসেব লিখতে ছুটতে হয়, তাহলে গৃহপরিচালনায় কোন সুশৃঙ্খলা থাকতে পারে না। সুতরাং ভোরবেলা হতে আরম্ভ করে রাত্রিতে শুতে যাওয়া পর্যন্ত কখন কী ভাবে কি কি করতে হবে, আর কে তা করবে, এরকম একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। কখন উনন-ধরানো হবে, কখন গয়লা দুধ দিতে আসবে, কখন চাকর বাজারে যাবে, কখন ছেলেমেয়েদের বা বড়দের ইস্কুল-কলেজের বা অফিসের ভাঁত দিতে হবে, কখন ঘর ঝাড়া-মোছা হবে, কখন কাপড়-কাচা হবে, কখন ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের স্নান করিয়ে খাওয়াতে ও ঘুমপাড়াতে হবে, কখন নিজের খাওয়া-দাওয়া হবে ও চাকর-বাকর হেঁসেল চুকিয়ে খাওয়া-দাওয়া করবে, কতক্ষণ দুপুরে বিশ্রাম নিতে হবে, কখন জলখাবার হবে, কখন গা ধোওয়া ও চুলবাঁধা হবে, কতক্ষণ দেখা সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে, কখন রাত্রির জন্য রান্না হবে, কত রাত্রিতে সকলের খাওয়া হয়ে গেলে আবার হেঁসেল চুকবে, এমনি সব কিছু যদি যথানির্দিষ্ট সময়ে ঘড়ীর কাঁটার মত চালিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে সংসারে কখনই এবেলার কাজ ওবেলা পর্যন্ত পড়ে থাকবে না, বা সংসারে কোন বিশৃঙ্খলা বা অশান্তিও দেখা দিতে পারবে না। তিন বেলা কিংবা চার বেলা খাওয়ার সময় নির্দিষ্ট থাকা চাই। সকাল বেলা একটা নির্দিষ্ট সময়ে যদি চায়ের পাট শেষ না হয়, তা'হলে তার জের গিয়ে পড়ে সকালবেলার অসংখ্য কাজের মধ্যে, আর দুপুরবেলার খাওয়া যদি বিকেল বেলা পর্যন্ত গড়িয়ে চলে, তাহলে বিশ্রাম ত হয়ই না, তারপর জল-খাবারের সময় হয়ত খিদেই হয় না, না হয় ক্লান্তি বোধ হতে থাকে। আবার রাত্রিতেও যদি একটা নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া-দাওয়া না চুকে যায় তাহলেও রাত্রিতে নিদ্রা ও বিশ্রামের অভাব হয়। অনেক বাড়ীতেই

ভোর চারটা হতে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত 'রাবণের চিতে' যদি জ্বলতে থাকে, তা'হলে ঐ সঙ্গে বাড়ীর গিন্নী বা রাঁধুনীর স্বাস্থ্যও তুলে দিতে হয় ঐ চির-বহ্নিমান চিতেয়। বাড়ীতে একজন-একজন করে যদি দুপুরে খেতে আসে, খাবার-সময় তাহলে বিকেলবেলা পর্যন্ত বিলম্বিত হয়। আর সকালে চায়ের এবং বিকেলের জলখাবারের পাট যদি চলতেই থাকে, এবং একই ভাবে রাত্রিতেও যদি পরিবারের লোকেরা যে যার খুসীমত এসে খেতে বসে তাহলে কোন সংসারই শৃঙ্খলা ও শান্তির সঙ্গে চলতে পারে না। সুতরাং পরিবারের সকলের প্রতি কড়া নির্দেশ থাকা চাই। যেকোন অবস্থাতেই যদি খাবারের নির্দিষ্ট সময় চলে যায় তাহলে ঐ সময়ের খাবার আর কারো জন্য তোলা থাকবে না, তাকে পরের খাবারের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কয়েকদিন যদি এ নিয়মটুকু অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়, তাহলে সংসারে আপনি শৃঙ্খলা দেখা দিবে, অর্থাৎ ঠিক খাবার সময়ে যে যেখানে আছে, ছুটে আসবে, কেন না তা না হলে তাকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় খিদের জ্বালা সহ্য করতে হবে। গৃহকর্ত্রী যদি একটু কঠোর ভাবে কিছুদিন পরিকল্পনা-মত কাজের ঠিক-ঠিক সময় রাখতে চেষ্টা করেন, কিছুটা অসুবিধে স্বীকার করেও, কয়েকদিনের মধ্যেই যখন তা অভ্যস্ত হয়ে যাবে তখন আর ঐ যৎসামান্য অসুবিধেকে অসুবিধে বলেই মনে হবে না, বরং মনে হবে যে তাই স্বাভাবিক।

পোকামাকড়ের উপদ্রব ও তার প্রতিকার

আমাদের গরম দেশে সর্বত্রই মশামাছি ও পোকামাকড়ের উপদ্রব দেখা যায়। বাড়ী বা পাড়া অপরিষ্কার কিংবা নোংরা হলে ত কথাই নেই আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলেও নানাকারণে, বিশেষতঃ বর্ষাকালে এদের উপদ্রব বাড়ে। ভাঁড়ার ঘরে ও রান্নাঘরে সর্বদাই চাল, ডাল, তেল, ঘি, নুন, তরি-তরকারি, ফলমূল, চিনি, গুড় প্রভৃতি থাকে বলে ইঁদুর, আরশোলা, পিঁপড়ে, মাছি প্রভৃতির খুবই উপদ্রব হয়। এজন্য ওগুলি কাঁচাই হোক আর রান্নাকরা অবস্থায়ই হোক,

সর্বদাই ঢাকা অবস্থায় রাখা উচিত, কারণ ওগুলি খাবারকেই যে শুধু দূষিত করে এমন নয়, অনেক কিছুর অপচয়ও ঘটায়। এজন্য রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘরকে সর্বদাই ঝেড়ে, ও ধুয়ে পরিষ্কার রাখা উচিত, এবং যাতে তাদের মধ্যে প্রচুর রোদ ও হাওয়া ঢুকতে পারে তারও ব্যবস্থা থাকা উচিত। খাবার-দাবারকে জীবাণুমুক্ত ও টাটকা রাখবার জন্য জালের আলমারির কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পিঁপড়ের অত্যাচার চলতে থাকে, এজন্য জালের আলমারি-গুলির পাগুলিকে জলপূর্ণ কোন পাথরের পাত্রের উপর বসিয়ে রাখতে পারলে পিঁপড়ের উপদ্রব হতে রেহাই পাওয়া যায়।

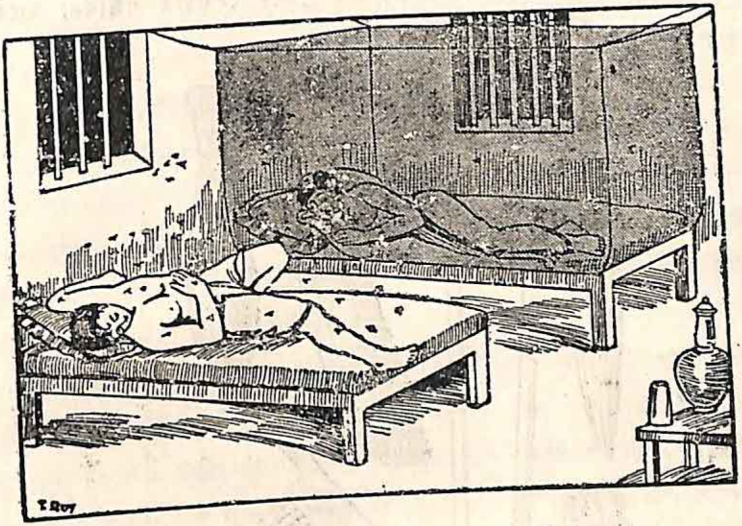


জলপূর্ণ পাত্রের উপর বসান জালে-ঢাকা আলমারি

খাবার ঘরেও প্রায়ই মাছির উপদ্রব হয়, বিশেষতঃ আম-কাঁঠালের সময়ে। সুতরাং যতদূর সম্ভব রান্নাঘরকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং যাতে তাতেও রোদ ও প্রচুর মুক্তবায়ুর চলাচল থাকে তার বন্দোবস্ত রাখা কর্তব্য। এখানেও খাবার-দাবার ঢাকা রাখার জন্য জালের আলমারির ব্যবস্থা করা উচিত।

বাড়ীর আশে-পাশে ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল, এঁদোপুকুর, গোয়ালঘর প্রভৃতি থাকলে কিংবা টিন, হাঁড়ি বা কলসীর মধ্যে জল জমে থাকলে বর্ষাকালে মশার উপদ্রব খুব বাড়ে। আর ঐ মশাগুলি ঘরের অন্ধকার কোণে, কাপড়-চোপড় বাক্স-তোরঙ্গের আড়ালে দিনের বেলা লুকিয়ে থাকে, এবং রাত্রিতে শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে, মশারি না খাটালে, যাকে পায় তাকেই কামড়ায়। সুতরাং

মশার জন্ম হয় এরূপ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, যাতে বাড়ীর মধ্যে কিংবা নিকটে না থাকে তার জন্য চেষ্টা করা উচিত। আর ঘরের মধ্যেও কোণে বা কিছুর আড়ালে মশা লুকিয়ে থাকতে পারে, তার জন্য প্রতি ঘরে যাতে আসবাবপত্র



মশারি খাটিয়ে না শুলে মশার কামড়ের হাত হতে নিস্তার নেই

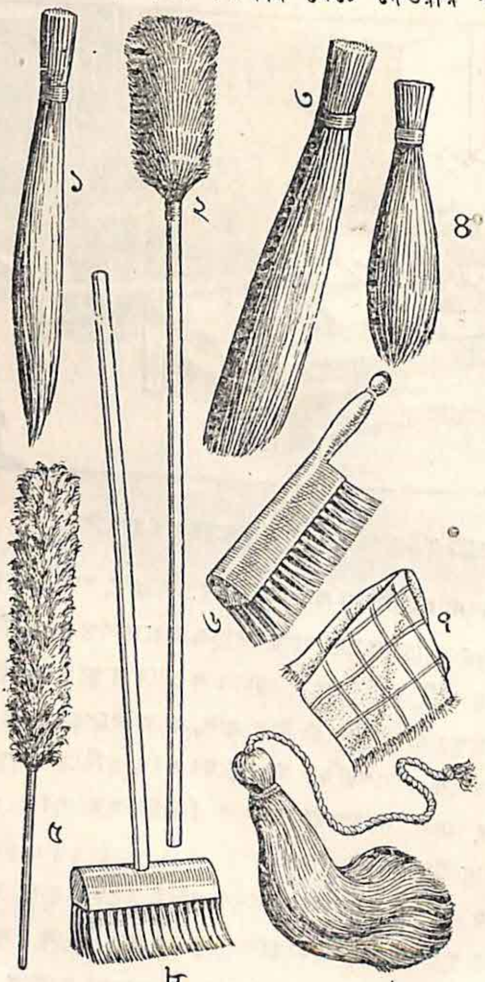
প্রয়োজনাতিরিক্ত না হয় কিংবা জড় হয়ে না থাকে, এবং সর্বদা যাতে ঘরে প্রচুর রোদ ও মুক্ত বায়ুর চলাচল হ'তে পারে, তারও সুবন্দোবস্ত থাকা উচিত।

অনেক সময়ে পাটি, খাট, পালঙ, চেয়ার ও সোফায় ছারপোকার উপদ্রব হয়। প্রায়শঃ ঐগুলি অপর বাড়ী, কিংবা ট্রাম, বাস, বা অফিসের আসন হতে কাপড়ে লেগে বাড়ীতে আসে ও বংশবৃদ্ধির ফলে গৃহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে, এবং কাপড়-চোপড় ও বিছানা-পত্র সর্বদা রোদে শুকিয়ে নিলে ছারপোকার উপদ্রব কম হয়।

স্যাঁতসেঁতে এবং অন্ধকার ঘরে অনেক সময়ে কাঠের বাক্স, আলমারি, খাট প্রভৃতি আসবাব-পত্র উইপোকাতে একেবারে নষ্ট করে ফেলে। সর্বদা ঝাড়পোছ করলে ও ঘরে প্রচুর রোদ ও মুক্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকলে উই পোকার উপদ্রব থাকে না বল্‌লেও চলে।

গরম কাপড়-চোপড় ও সিল্কের কাপড়-চোপড়েও বিশেষতঃ বর্ষাকালে এক রকম কাল কাল পোকা হয়, এবং তারা দামী দামী পোষাক-পরিচ্ছদকে কেটে তচনচ ও ব্যবহারের অযোগ্য করে ফেলে। সে জন্য মাঝে মাঝে ওগুলিকে বের করে খানিকক্ষণ হাওয়ায় রেখে ঝেড়ে ও বুরুশ করে আবার পাট করে রাখতে

হয়। পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে থাকলে এরকম পোকায় কাটে না। কিন্তু আমাদের দেশে শুধু শীতকালের কয়েকটি মাসই গরম কাপড়ের আবশ্যক হয়, বাকী প্রায় সারা বছরই সেগুলি পাট করা অবস্থায় আলমারি কিংবা স্যুটকেশে তুলে রাখা হয় ব'লে পোকায় কেটে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।



বিভিন্ন প্রকারের ঝাড়ু

১—ফুল ঝাড়ু, ২—লম্বা বাঁশের ঝুলঝাড়া, ৩—ঝাঁটা, ৪—খেজুর পাতার ঝাড়ু, ৫—পালকের ঝুল-ঝাড়া, ৬—ধুলো-ঝাড়া বুরুশ, ৭—ঝাড়ন, ৮—নরদমা-পরিষ্কারের বুরুশ, ৯—ঘর-মোছা দড়ির ন্যাতা

একইভাবে আর এক রকমের পোকা বইগুলিকেও কেটে নষ্ট করে। সে জন্য সেগুলোও মাঝে মাঝে রোদে দিয়ে ঝেড়ে মুছে রাখতে হয়।

দরজা-জানালা, চৌকাট, কাঠের কড়ি-বরগা প্রভৃতিতেও সময়ে সময়ে ঘুণ পোকা, কিংবা উইপোকা ধরে তাদের একেবারে ঝাঁঝরা করে ফেলে কিন্তু মাঝে মাঝে তিসির তেলে রঙ করে নিলে বা স্পিরিট ও গালাতে পালিশ করে রাখলে কাঠের পোকার উপদ্রব কম হয়। ঘরের কোণে মাকড়সার জালে ঝুল জমে দেওয়াল ও ছাদ নোংরা করে ফেলে, তাই সর্বদা ঝুল-ঝাড়া দিয়ে ওগুলিকে পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত।

বর্ষাকালে ফুলগাছ ও বাগানের লতাপাতায় শোঁয়া পোকা ও অন্যান্য পোকা খুব হয় এবং গাছের পাতা ও ফুলের কুঁড়িকে তারা নষ্ট করে ফেলে। আবার শোঁয়া পোকার রোঁয়া গায়ে লাগলেও যন্ত্রণা হতে থাকে। সে জন্য ড়ি ডি. টি, পাইরিথ্রাম-দ্রব কিংবা হুঁকোর জল পাতার উপর পিচকারি দিয়ে ছড়িয়ে দিলেও এরূপ পোকার উপদ্রব কম হয়।

সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকলে, কিংবা কুকুর, বেরালের সংস্পর্শেও মানুষের গায়ে এঁটুলি, উকুন প্রভৃতি হতে পারে। সে জন্য বাড়ীতে পোষা কুকুর-বেরাল থাকলে সর্বদা তাদের ধুইয়ে ও তাদের লোম আঁচড়ে পরিষ্কার রাখা যেমন কর্তব্য, আবার তেমনি নিজের শারীরিক পরিচ্ছন্নতার প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

যদি উল্লিখিত প্রতিষেধের ব্যবস্থা-সত্বেও কোন কারণে পোকা-মাকড়ের অত্যাচার আরম্ভ হয়, তা হলে বিভিন্ন কীট-পতঙ্গের জন্য নানারকম কীটঘ্ন ঔষধের ব্যবহারে তাদের সমূলে বিনাশ করা কর্তব্য। তবে মনে রাখা উচিত যে—কীটঘ্ন ঔষধগুলি বিষ বলেই কীট পতঙ্গকে নষ্ট করে; সুতরাং এমন সতর্ক ভাবে তাদের ব্যবহার করা উচিত যাতে সেগুলি খাবার কিংবা শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশ যেমন চোখ, নাক, মুখ প্রভৃতির সংস্পর্শে না আসে। যদি দৈবাৎ শরীরের কোন অংশে, হাত পা প্রভৃতিতে লাগে, তা হলে তৎক্ষণাৎ ভাল করে সাবান জলে তা ধুয়ে নেওয়া কর্তব্য। তা না হলে অনবধানতা বশতঃ চোখে-মুখে লেগে স্বাস্থ্যহানি কিংবা মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

ডি. ডি. টি-দ্রব, ফ্লিট, বা গ্যামাক্সিন দ্রব ছড়িয়ে দিলে প্রায় সব রকমের পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গই মরে যায়। পিঁপড়ে, ছারপোকা, মশা, মাছি, উই, আরশোলা, ঘুণ, শোঁয়াপোকা প্রভৃতি সবই এগুলি ছড়িয়ে দিলে মারা পড়ে। কিন্তু অসুবিধে এই যে খাবার-দাবারের উপর এগুলি ছড়িয়ে দেওয়া কখনই উচিত নয়, কারণ এগুলির প্রত্যেকটিই মারাত্মক বিষ। বরং প্রায়

শতকরা ৮০ ভাগ কেরোসিন তেলের সঙ্গে কুড়ি ভাগ সাবান-গোলা গরম জল মিশিয়ে, আগুনে ফুটিয়ে নিয়ে পিচকারির সাহায্যে কীটপতঙ্গের উপর ছড়িয়ে দিলে, পোকা-মাকড় প্রভৃতির উপদ্রবও কম হয় এবং মানুষের পক্ষে তা তত মারাত্মক হয় না।

মশা-মাছি—নালা, নরদমা, আঁস্তাকুড়, ডোবা, ঝোপ-ঝাড় প্রভৃতি পরিষ্কার করে সেখানে ডি. ডি. টি-দ্রব, ফ্লিট কিংবা কেরোসিন ছড়িয়ে দিলেও মশামাছির উপদ্রব কম হয়। রোগীর মল, মূত্র, কফ, থুথু প্রভৃতি পুড়িয়ে কিংবা বাড়ীর অনেকদূরে গভীর গর্ত করে পুঁতে ফেলাই ভাল, কারণ তা না হলে মশা-মাছি তাদের উপর বসে রোগের জীবাণু ছড়াতে পারে।

ছারপোকা—মশার মত ছারপোকাও রক্তাশী প্রাণী ; প্রায়ই খাট-চৌকীর ফাঁকে, দেওয়ালের গর্তে বা ফাটলে, চেয়ার, টেবিল, সোফায়, এবং বিছানার লেপ-তোষকেও থাকে। সুতরাং বিছানা-পত্র সর্বদা কড়া রোদে শুকিয়ে নিলে, এবং সম্ভব হলে খাট-চৌকীর ফাঁকে ফাঁকে ফুটন্ত গরম জল ঢেলে কয়েকদিন রোদে ফেলে রাখলে, ছারপোকা মরে যায়। আর তা সম্ভব না হলে গ্যামাক্সিন, ডি. ডি. টি-দ্রব কিংবা ফ্লিট্ বারবার পিচকারির সাহায্যে আসবাব-পত্র কিংবা দেওয়ালের ফাঁকে ও গর্তে দিলেও ছারপোকার উপদ্রব দূর হয়। দেওয়ালের ফাটল ও গর্ত ভাল করে বুজিয়ে ফেলাই উচিত।

আরশোলা—সাধারণতঃ নানা জীবাণু ও অ্যামিবার বাহক আরশোলা। সুতরাং সর্বদা ঘর, বিশেষতঃ রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘর পরিষ্কার রাখা কর্তব্য। গন্ধক ও পাইরিথ্রামের ধোঁয়া, কিংবা ফ্লিট্ বা গ্যামাক্সিন ছড়িয়ে দিলেও আরশোলা মরে কিংবা পালিয়ে যায়।

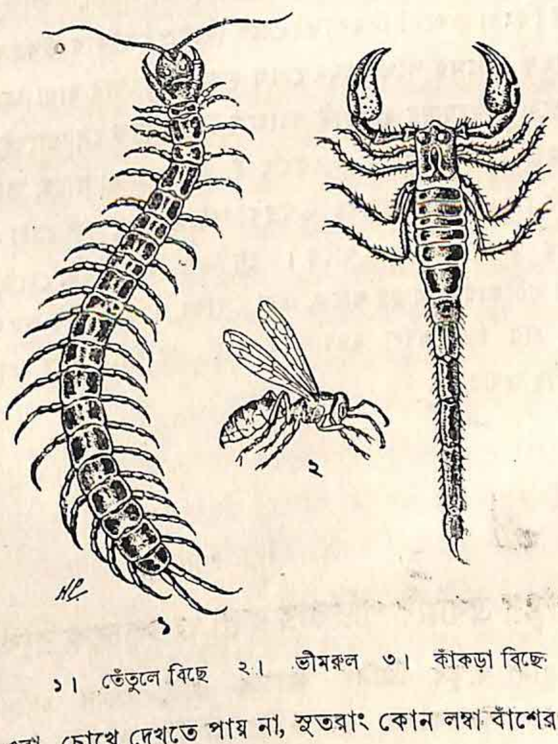
মাকড়সা—সাধারণতঃ মাকড়সা হেথায়-হোথায় জাল বুনে বাড়ীর ছাদ, দেওয়াল প্রভৃতিতে ঝুলের সৃষ্টি করে। কোন কোন জাতীয় মাকড়সা কামড়ালে শরীরে ঘা ও অন্যান্য বিষক্রিয়া দেখা যায়। সুতরাং সর্বদাই মাকড়সার জালকে ছিন্ন করে দেওয়াল, ছাদ প্রভৃতিকে পরিষ্কার রাখা কর্তব্য। ডি. ডি. টি, গ্যামাক্সিন কিংবা ফ্লিট্ ছড়িয়ে দিলেও মাকড়সা মরে যায়।

উইপোকা—মাটিতে উইয়ের ঢিপি কিংবা আসবাব-পত্র, দেওয়াল, চৌকাট বা কড়িকাঠে রেখার মত উইয়ের বাসা হলে, তৎক্ষণাৎ তা ভাল করে ভেঙে তার উপর ফিনাইল, কেরোসিন, ডি. ডি. টি কিংবা গ্যামাক্সিন ঢেলে দিলে উই আর বাঁচতে পারে না। ক্রিয়োজোটও উইয়ের পক্ষে মারাত্মক।

ঘুণ-পোকা—কাঠের উপর ভাল করে তিসির তেলের রঙ, কিংবা গালাশুদ্ধ স্পিরিটের পালিশ বা বার্ণিশ সর্বদা লাগালেও ঘুণ ধরতে পারে না। ঘুণ-পোকার গর্তের মধ্যে গ্যামাক্সিন বা ডি, ডি, টি, ঢেলে দিলেও কাজ হয়।

শুঁয়াপোকা ও বিছে—ফুল ও অন্যান্য গাছে যখন শুঁয়া পোকা দেখা দেয়, তখন তার উপর পাইরিথ্রাম-দ্রব, ডি, ডি, টি-দ্রব, কেরোসিন-সহ সাবান জল কিংবা হুঁকোর জলও পিচকারির সাহায্যে ছড়িয়ে দিলে তা মরে যায়। তা ছাড়া নানা রকমের বিছেও সময়ে সময়ে আলো-বাতাসহীন স্যাঁৎসেতে ঘরে,—ইটের বা আসবাব-পত্রের বা লেপ-তোষকের নীচেও থাকে। সুতরাং সকল সময়ে যেমন ঐ সকল স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত—আবার তেমনি কোন কীটঘ্ন ঔষধের সাহায্যে তাদের দেখতে পেলেই মেরে ফেলা উচিত, কারণ কাঁকড়া বা অন্যান্য বিষাক্ত বিছের কামড়ে অতিশয় যন্ত্রণা হয়; এমনকি জ্বর পর্য্যন্তও হতে পারে।

ভীমরুল, বোলতা, মৌমাছি প্রভৃতি—প্রায়ই কোন না কোন গাছে বাসা বাঁধে। শরীরে যখন তারা হুল ফুটিয়ে দেয়, তখন অত্যন্ত যাতনা হয়।



১। তেঁতুলে বিছে ২। ভীমরুল ৩। কাঁকড়া বিছে

রাত্রিতে এরা চোখে দেখতে পায় না, সুতরাং কোন লম্বা বাঁশের মাথায় কাপড়

জড়িয়ে তার উপর কেরোসিন বা পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে রাত্রিতে তাদের গুড়িয়ে ফেলাই উচিত।

পিঁপড়ে—ফ্লিট্, গ্যামাক্সিন, ডি. ডি. টি প্রভৃতি কীটঘ্ন ঔষধ ছড়িয়ে দিলে পিঁপড়ের উপদ্রব আর থাকে না!

ইঁদুর—ইঁদুরও অত্যন্ত অনিষ্টকারী প্রাণী। কাঠ, বই, কাপড়-চোপড়, ফলমূল যা পায় ইঁদুর তাই কেটে ছারখার ও নষ্ট করে। ভাঁড়ার এবং রান্না ঘরেই ইঁদুরের উপদ্রব বেশি হয়। ইঁদুরের দ্বারা প্লেগরোগের প্রসার ঘটে, এবং অন্যান্য রোগের জীবাণুও বাহিত হতে পারে। এ জন্য কল বা ছাটের সাহায্যে ইঁদুরকে ধরে মেরে ফেলাই উচিত। সেঁকো বিষ কোন খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে ভাঁড়ার বা রান্না ঘরে রেখে দিলে ইঁদুর মারা সম্ভব হলেও, তা করা সমীচীন নয়; কারণ ঐটি অতি মারাত্মক বিষ, এবং অসাবধানতা বশতঃ কোন খাবার-দাবারে লাগলে মানুষের পর্যন্ত প্রাণহানি ঘটতে পারে।

গরম কাপড়, বই প্রভৃতির পোকা—নানা রকম পোকা দামী দামী জামা-কাপড় এবং বই কেটে নষ্ট করে। সুতরাং ঐ গুলিকে মাঝে মাঝে হাওয়ায় শুকিয়ে, তার মধ্যে গ্যামাক্সিন-গুঁড়ো, ন্যাপ্থেলিন-গুঁড়ো, ডি. ডি. টি কিংবা শুকনো নিমপাতা রেখে দিলেও পোকার উপদ্রব থাকে না।

সংক্রামক রোগের পক্ষে যেমন রোগ হলে চিকিৎসার দ্বারা তার নিরাময়ের ব্যবস্থার চেয়ে প্রতিষেধের ব্যবস্থাই সর্বাংশে শ্রেয়ঃ, ঠিক সে ভাবেই কীট, পতঙ্গ, পোকা-মাকড় ইত্যাদি যাতে একেবারেই জন্মাতে না পারে, তারই জন্য চেষ্টা করা উচিত। একবার তাদের উপদ্রব আরম্ভ হলে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও বহুদিন ধরে তাদের উপদ্রব চলতে থাকে। সে জন্য বাড়ী, ঘর, দোর, আসবাবপত্র যাতে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, এবং পোকা, মাকড়, কীট-পতঙ্গ একেবারেই না জন্মায় তার জন্য সর্বদা যত্নবান হওয়াই, জন্মানোর পরে তাদের নাশের চেয়ে বাঞ্ছনীয় সুব্যবস্থা।

ধাতুর দ্রব্যাদি পরিষ্কার করা ও চকচকে রাখা

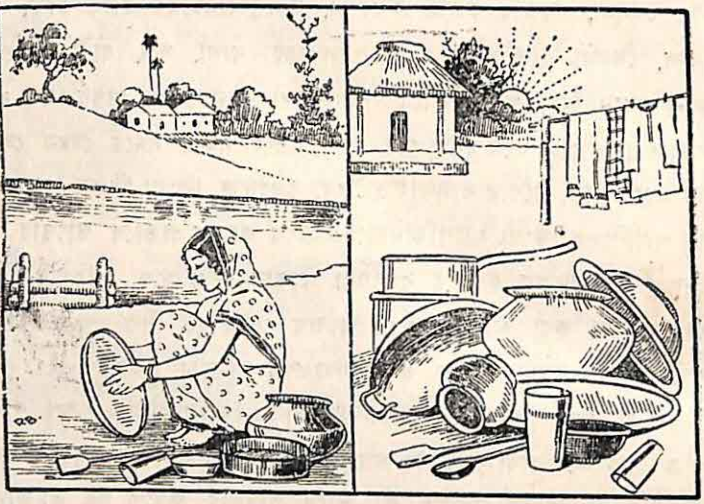
আমরা নানা ধাতুর জিনিস ব্যবহার করি, যেমন সোনার গয়না, রূপোর গয়না, বাসন-কোসন, ফুলের-ভাস প্রভৃতি, তামার পূজোর বাসন

ও কখনো কখনো হাঁড়ি-কুঁড়ি, পিতলের বাসন-কোসন, দরজার হাতল, কড়া, অ্যাস-ট্রে প্রভৃতি, লোহার কড়াই, হাতা, বেড়ি, খুন্তি, দরজার কব্জি, ইস্ত্রির যন্ত্র, দা, কাটারি, বাঁতি, ছুরি প্রভৃতি, ব্রোন্‌জের-বাসন-কোসন, কাগজ চাপা, খেলনা, দরজার হাতল ইত্যাদি, অ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি-কুঁড়ি, থালা, গেলাস, খেলনা প্রভৃতি আর এনামেল করা থালা, ঘটি, বাটি, গেলাস ও কখনো কখনো হাঁড়ি-কুঁড়িও বটে। সাধারণতঃ সোনা ছাড়া অপর সব ধাতুই অনবরত ব্যবহারের ফলে ময়লা হয়ে পড়ে, এবং সময়ে সময়ে যেমন লোহার উপর মরচে পড়ে, রূপোর সাল্‌ফাইড তৈরী হওয়াতে, কিংবা পিতল বা তামার উপর অ্যাসিডের কিংবা অ্যালুমিনিয়ামের উপর ক্ষারের প্রভাবে স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর বস্তু উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় সেগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। আবার সৌন্দর্যের দিক হতেও ময়লা হয়ে যাওয়া ধাতুর বাসন-কোসন ও আসবাবপত্র অত্যন্ত দৃষ্টিকটু এবং তাদের স্থায়িত্বও হয় কম। সুতরাং প্রত্যেক গৃহে ধাতুর জিনিসগুলিকে সর্বদা পরিষ্কার করে চকচকে করে রাখা গৃহকর্মের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক ধাতুর বস্তুকে আলাদা আলাদা ভাবে বিভিন্ন উপায়ে কী ভাবে পরিষ্কার করতে হয়, তা জানা না থাকলে কখনও তাদের চক্‌চকে রাখা সম্ভব হয় না। সে জন্য নিত্য-ব্যবহৃত ধাতুগুলিকে পরিষ্কার করে ময়লা দূর করার কতকগুলি সহজ উপায় নীচে দেওয়া গেল।

তামা—পূজোর বাসন-কোসন ছাড়া সাধারণতঃ আমরা রান্না-বান্নার জন্য তামার বাসন-কোসন, কলাই না করে ব্যবহার করি না, কারণ, সাধারণতঃ তামাধাতুর সহযোগে যে সকল লবণ প্রস্তুত হয়, তারা স্বাস্থ্যের হানি ঘটায়। এজন্য কলাই করা তামার হাঁড়ি-কুঁড়িও ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ কোন কারণে কলাই নষ্ট হয়ে গেলে, তা বিপত্তির কারণ হতে পারে। কিন্তু পিতল, ব্রোঞ্জ, কাঁসা প্রভৃতিতে দস্তা বা অন্য ধাতুর সঙ্গে তামার মিশ্রণ থাকলেও এবং সেগুলি অত সহজে অম্লের দ্বারা প্রভাবিত না হলেও একেবারে যে হয় না এমন নয়, সুতরাং কখনই ঐ সকল বাসনে ঘি, মাখন, তেল, টক্ অম্বল বা চাটনী বহুক্ষণ ধরে রাখা উচিত নয়। লবণ ও ভিনিগার দিয়ে ঘষলে তামার ময়লা কেটে যায়, আবার বিশেষ মেটাল পালিশ লাগিয়ে ঘসে তার পর হোয়াইটিং বা খড়ির গুঁড়ো দিয়ে মেজে নিলে তামার স্বাভাবিক লালচে রঙ ফিরে আসে ও চক্‌চকে হয়।

পিতল—ঐভাবে লবণ ও ভিনিগারের সাহায্যে কিংবা তেঁতুল লাগিয়ে

ছাই দিয়ে মেজে নিলে পিতলের বাসন-কোসন বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়। দরজার পিতলের হাতল, কব্জি, অ্যাস-ট্রে, ঘণ্টা প্রভৃতি 'ব্রাসো' লাগিয়ে ন্যাকড়া দিয়ে খানিকক্ষণ রগড়ে নিলেই চক্‌চক্‌ করতে থাকে। দু একদিনের



বাসন মাজা

মধ্যেই আবার তা ময়লা হতে আরম্ভ হয় বলে, দু' একদিন পরে পরেই এরকম পরিষ্কার করে নিতে হয়। পালিশ লাগিয়ে খড়ির গুঁড়ো দিয়ে ঘসে নিলেও পিতল চক্‌চক্‌ করতে থাকে।

কাঁসা—অনেকটা তামার সঙ্গে দস্তা ও টিন মিশিয়ে কাঁসা তৈরী হয়। সুতরাং কাঁসার বাসনেও টক্‌, অম্বল, চাটনি প্রভৃতি রাখা উচিত নয়। কাঁসা পরিষ্কার করা অনেকটা সহজ। উননের ছাই দিয়ে ভাল করে মেজে ধুয়ে নিলেও কাঁসার থালা, ঘটি, বাটি ও গেলাস বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়।

ব্রোঞ্জ—এটিও কাঁসার মতই ভিন্ন অনুপাতে তামা, দস্তা ও টিনের একত্র সংযোগে গঠিত একটি মিশ্র ধাতু। একে পরিষ্কার ও চক্‌চকে করার প্রণালী অনেকটা তামা ও পিতলের মতই।

রূপো—হাওয়াতে সর্বদাই কতকটা সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন থাকাতে রূপোর উপর তার প্রভাবে সিলভার সালফাইড তৈরী হয় বলেই রূপো কালচে হয়ে যায়। আবার রূপোর বাসনে কোন টক্‌ বা অম্ল বস্তু রাখলেও অতি সহজেই রূপো-ঘটিত লবণ তৈরী হয় ব'লে রূপোর বাসনও খাওয়া-দাওয়ার পক্ষে ভাল নয়। রূপোর জিনিসকে পরিষ্কার করতে হলে 'সিলভো' লাগিয়ে চকের

গুঁড়ো দিয়ে ভাল করে ঘসে নিলেই চক্‌চক্‌ করে। কোন বিলাসিতার বস্তু হলে ভাল সাবান-জলে ধুয়ে স্পিরিট বা এ্যালকোহলসহ হোয়াইটিং লাগিয়ে শ্যাময় চামড়া দিয়ে ভাল করে ঘসে নিলেই তা নতুনের মত চক্‌চক্‌ করতে থাকে।

অ্যালুমিনিয়াম—আমরা সাধারণতঃ রান্নার জন্য অ্যালুমিনিয়ামের বাসন-কোসন ব্যবহার করি, কারণ কতকটা সস্তা বলে সকলেই তা কিনতে পারে, এবং পাতলা বলে তা যেমন সহজে গরম হয়, আবার সে তাপও অনেকক্ষণ থাকে। ফল বা তরকারির অম্লত্বেও সহজে অ্যালুমিনিয়াম প্রভাবিত হয় না। স্থতরাং বাসন-কোসন হিসেবে তামা বা পিতলের চেয়ে অ্যালুমিনিয়ামই নানা কারণে স্থবিধেজনক। কিন্তু ক্ষার সহযোগে অ্যালুমিনিয়াম ময়লা হয়ে যায়। সে জন্য সোডা দিয়ে কিছু রান্না করতে হলে কখনই অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে তা করা উচিত নয়। ঐ একই কারণে কাপড়-কাচার সোডা দিয়েও অ্যালুমিনিয়ামের বাসন-কোসন ধোওয়া বা পরিষ্কার করা উচিত নয়, কারণ তাতে অ্যালুমিনিয়াম কালো হয়ে যায়। খুব ভাল সাবান জলে (অর্থাৎ যাতে ক্ষার নেই) অ্যালুমিনিয়াম ধুলে ততটা ক্ষতি হয় না। খুব পাতলা ছাই দিয়ে মেজে ধুয়ে ভাল করে কাপড় দিয়ে মুছে শুকিয়ে নিলে অ্যালুমিনিয়াম পরিষ্কার থাকে। ধোয়ার পর যদি অ্যালুমিনিয়ামের গায়ে জল লেগে থাকে, তাহলেও খুব ভাল পরিষ্কার দেখায় না।

লোহা—আমরা সাধারণতঃ পেটা বা ঢালাই লোহার কড়াই ও হাতা, খুন্তি, বেড়ি, চাটু প্রভৃতি ব্যবহার করি। সাধারণতঃ এগুলি ব্যবহারের পর সোডা কিংবা সাবান-জলে ন্যাকড়ার সাহায্যে ঘসে ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখা হয়। তেল-কালি ছাড়াতে হলে ঝামা দিয়ে ঘসে তা ছাড়িয়ে ছাই দিয়ে মেজে নিলে অনেকটা রূপোর মত ঝকঝকে হয়। মাজা ও ধোয়ার পর শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নিতে হয়, তা না হলে ভিজে অবস্থায় বাতাসের অক্সিজেন লেগে মরচে পড়ে। লোহার বাসন তেলচিটে বা সামান্য কালি মাখানো থাকলে, কাগজ অথবা খস্‌খসে ন্যাকড়া বা চটের সাহায্যে খানিকটা কালি উঠিয়ে গরম জলে সোডা ও সাবান গুলে, ঝামা কিংবা খস্‌খসে ন্যাকড়া বা চট দিয়ে ঘসে নিলে যখন কালি উঠে যায় তখন পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নিলে চক্‌চক্‌ করতে থাকে। ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি কখনো ভিজে অবস্থায় রাখতে নেই; তার কারণ তাতে মরচে পড়ে ওগুলি অকেজো হয়ে পড়ে। সেজন্য আর্দ্র বাতাসে যাতে মরচে না পড়ে, তার জন্য যখন ব্যবহার করা হয় না, তখন ভাল করে মুছে ভ্যাসেলিন বা তেল লাগিয়ে রাখলে আর তাতে মরচে পড়ে না।

লোহার বাসনে অম্ল ও ক্ষার দুই বস্তুই রান্না করা যায়। ভিতরে কলাই করা (galvanized) বাসন কিন্তু রান্না-বান্নার পক্ষে খুব উপযোগী নয়।

এনামেল বা কলাই করা বাসন-কোসন—এগুলি সাধারণতঃ সস্তা, মজবুত, দেখতে পরিষ্কার এবং অম্ল বা ক্ষারের দ্বারা প্রভাবিত হয় না বলেই আমরা এনামেলের থালা, ঘটি, গেলাস প্রভৃতি অনেক কিছু সর্বদা ব্যবহার করি। আসলে তারা লোহা, সীসে, টিন বা এই রকম কোন ধাতুর উপর প্রলেপ দেওয়া বা এনামেল করা উপাদান মাত্র। যতক্ষণ ঐ প্রলেপ বা এনামেল অক্ষত থাকে, ওগুলির ব্যবহারে কোন অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু ফেটে গেলে বা চটা উঠে গেলে তারা দেখতে অত্যন্ত খারাপ হয়, এবং ভিতরের ধাতুর সঙ্গে অম্ল প্রভৃতি সংযোগে যে লবণ প্রস্তুত হয়, তা স্বাস্থ্যের পক্ষেও হানিকর। সুতরাং ঐ রকম ফেটে যাওয়া কিংবা চটা উঠা অবস্থায় কখনই রান্না-বান্নার জন্য এনামেলের বাসন-কোসন ব্যবহার করা উচিত নয়। এগুলি অক্ষত অবস্থায় পরিষ্কার রাখা খুবই সহজ, কারণ সোডা বা সাবান গুলে গরম জলে ধুয়ে পরে ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিলেই তা আবার নতুনের মত দেখায়। চটা-উঠা অবস্থায় কিন্তু তাদের পরিষ্কার করা মোটেই সহজ নয়।

ধাতুর মরচে পড়া ও কালচে দাগ ধরা

লোহার উপর কী ভাবে মরচে পড়ে এবং রূপোর উপর কী ভাবে কাল ছোপ পড়ে তা আগেই বলা হয়েছে। তামা, পিতল, ব্রোঞ্জ্ প্রভৃতি জিনিসেরও গায়ে একই ভাবেই বাতাসে কতকটা গন্ধক-যৌগিক গ্যাস কিংবা কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকাতে, কালচে দাগ ধরে। মরচে পড়লে লোহার গায়ে প্রথমে লালচে দাগ পড়ে, কারণ ভিজে অবস্থায় হাওয়ার অক্সিজেন-সংযোগে লোহাতে লোহার অক্সাইড্ প্রস্তুত হয়। পরে ঐ স্থান ফোস্কার মত ফেঁপে উঠে ও লোহার খানিকটা অংশ চটার আকারে উঠে আসে। ঐ অংশ আর তেমন শক্ত থাকে না, অর্থাৎ একটু চাপ দিলেই তা গুঁড়ো হয়ে যায়। আবার সাল্‌ফিউরেটেড হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রভাবে রূপো, তামা, দস্তা, পিতল, ব্রোঞ্জ প্রভৃতিতে যে সালফাইড-যৌগিক তৈরী হয়, তাদের সব কটিরই রঙ কালো।

আবার জলের মধ্যে সেজন্যই ঐ সকল ধাতু নির্মিত জিনিষপত্রের উপর কালচে ছোপ পড়তে থাকে। সর্বদাই কিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে বলে, লোহা, পিতল, তামা প্রভৃতি ধাতুগঠিত পাত্রকে মেজেয় উপুড় করে না রাখলে, ভিতরের দিকে তলায় যে জল জমা হয়, তা যতই বাতাসে মিশে যেতে থাকে ততই বাসনে চক্রাকারে একটির পর একটি দাগ পড়তে থাকে। এরই নাম **জলীয় চক্রচিহ্ন** (water rings)। কার্বন ডাই-অক্সাইড হতে অক্সিজেন বিমুক্তির ফলে মূল অঙ্গার চক্রাকারে ঐ ভাবে জমা হতে থাকে বলেই ওরকম দাগ পড়ে। লেবুর রস, তেঁতুল-গোলা জল বা লবণ ও ভিনিগার সহযোগে মেজে নিলেই ঐ দাগ আর থাকে না।

মেজে-ধুয়ে পরিষ্কার করা যে কোন ধাতুর বাসনকে ভাল করে মুছে বা উপুড় করে রাখলে আর ঐ জলীয় চক্রগুলির দাগ পড়তে পারে না।

কাপড়-কাচা

প্রত্যেক বাড়ীতেই ধোবার ব্যবস্থা সত্ত্বেও রোজই কিছু না কিছু কাচাকাচির কাজ না করলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা সম্ভবপর হয় না। রুমাল, গেঞ্জি, পাজামা, জাঙ্গিয়া, বডিস, সেমিজ, তোয়ালে-গামছা, বালিশের ওয়াড়, রুমাল, ছেলেপিলের জামা প্রভৃতি এত সহজে ময়লা কিংবা দুর্গন্ধযুক্ত বা তেল-চিটে হয়ে ওঠে যে, প্রত্যহ কিছু না কিছু কাপড় বাড়ীতে কেচে পরিষ্কার না করলে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ত থাকা যায়ই না, বরং ধোবার খরচ এবং অতিরিক্ত কাপড়-জামা রাখার খরচও অত্যন্ত বেড়ে যায়। ভিন্ন ভিন্ন জামা-কাপড় কাচার জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপাদান ব্যবহৃত হয়, অনেকগুলি হাতে কাচলে পরিষ্কারই হয় না, কিংবা পরিষ্কার হলেও হয়তবা এইগুলির তন্তু বা রঙ নষ্ট হয়ে যায় বলে জামা-কাপড়গুলি অকেজো কিংবা ভদ্র-সমাজে অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। সেজন্য কতকগুলি সাধারণ কাপড়-চোপড় কাচার উপাদান-সম্বন্ধে কিছু বিবরণ নীচে দেওয়া গেল।

সাবান—কষ্টিক সোডা নামক তীব্র ক্ষার উপাদানের সঙ্গে কোন চর্বি বা তেল মিশিয়ে আগুনে জাল দিতে দিতে কোন লম্বা হাতা দিয়ে অনবরত নাড়তে থাকলে জলীয় অংশের উপর, ছানা-কাটা দুধের উপর যে ভাবে ছানা ভাসতে থাকে, সে ভাবে যে অংশ ভেসে উঠে তারই নাম সাবান। কষ্টিক সোডার সঙ্গে চর্বির অ্যাসিডের সংযোগ হয় বলে, অপর উপাদান গ্লিসারিন তা হ'তে যখন সরে যায় তখনই প্রথম যৌগিক উপাদানটিকে স্বতন্ত্রভাবে তুলে নিয়ে

চৌকো কিংবা গোল সাবানের আকার দেওয়া হয়। মৃদু জলে ঐ সাবান ঘসলে যে ফেনা হতে থাকে তারই সাহায্যে সাধারণতঃ সুতী কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করা যায়। বাজারে নানা রকমের কাপড়-কাচা সাবান কিনতে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে দেখে শুনে ভাল সাবান কিনে আনতে পারলে যেমন পয়সার সাশ্রয় হয়, আবার তেমনি কাপড় কাচতে পরিশ্রমও কম হয়। সাবানে অনেক সময় রজন, সাবান-পাথরের গুঁড়ো প্রভৃতি মিশিয়ে ওজনে ভারি করার জন্য ভেজাল দেওয়া থাকে। সেজন্য পরীক্ষা করে ভাল সাবান কেনা উচিত। রজন-মেশানো সাবানের রঙ যেমন কতকটা হলদে বা বাদামী হয়, আবার তেমনি তা বেশী চটচটে হয় এবং তার গন্ধও হয় অনেকটা তার্পিন তেলের মত। এ রকম সাবান কাপড়-কাচার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। আবার সাবানে কষ্টিক সোডা বা ক্ষারের অংশ বেশি থাকলে তাতে কাপড়ের যথেষ্ট ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং খানিকটা সাবান জলে গুলে তার সঙ্গে কিছু লেবুর রস মিশিয়ে নিলে যদি বেশ তাড়াতাড়ি বুদবুদ হতে থাকে, তবেই বুঝতে হবে যে সাবানে প্রচুর ক্ষার বর্তমান আছে, সুতরাং কাপড় কাচার পক্ষে মোটেই তা ভাল নয়। আবার সাবানে মাটি, চীনে মাটি বা অন্য গুঁড়ো মেশানো থাকলে জলে সাবান গুলে কিছুক্ষণ রেখে দিলেই যদি ঐ সকল ভেজাল বস্তু থিতিয়ে নীচে পড়তে থাকে, তাহলেই বুঝতে হবে যে সাবান খাঁটি নয়। সুতরাং সে সাবান না কেনাই ভাল।

যে সাবান-তৈরীতে যত ভাল তেল বা চর্বি ব্যবহৃত হয়, সে সাবান তত ভাল হয় গায়ে মাখা এবং দামী কাপড়-চোপড় কাচার পক্ষে।

কাপড়-কাচার অন্যান্য উপাদান-সমূহ

সোডা—এটি সোডিয়াম কার্বোনেট নামে একটি ক্ষার-জাতীয় লবণ-বিশেষ। বিশুদ্ধ অবস্থায় দশ অণু জলের সমন্বয়ে এ উপাদানটি কেলাসের আকারে থাকলেও, যখন বাতাসে খোলা অবস্থায় থাকে তখন প্রায় তার সবটুকু জলই উবে যায় বলে, তা গুঁড়ো-অবস্থায় পরিণত হয়। ঠাণ্ডা জলের চেয়ে কুসুম-কুসুম জলে সোডা অনেক বেশী গুলে কিন্তু ফুটন্ত জলে আবার ঐ গুলে যাওয়ার পরিমাণ শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ কমে যায়। সুতরাং ফুটন্ত জলের পরিবর্তে কুসুম-কুসুম জলেই কাপড় সহজে ভাল কাচা হয়। কিন্তু তেল-চিটে কাপড়-চোপড়কে পরিষ্কার করতে হলে গরম জলে সোডা ঢেলে কতকটা ফুটিয়ে নিতে হয়,

কেন না, তার ফেলে তল অতি সূক্ষ্ম অংশে ভাগ হয়ে উপরে ভেসে উঠে। ক্ষার জলে কাপড় সহজে পরিষ্কার হলেও এভাবে শুধু সোডা দিয়ে সর্বদা কাচলে কাপড়-চোপড় বেশী দিন টেকে না। সেজন্যই জলে কতকটা সোডা ও ভাল সাবান একত্রে গুলে, তাতে কাপড় ফুটিয়ে নিলে কাপড়ের ক্ষতি কম হয়, এবং ভাল পরিষ্কারও হয়।

রিটা—কোন কোন কাপড় কাচার জন্য আমাদের দেশে সাধারণতঃ শুকনো অবস্থায় এ ফলের শাঁসকে জলে ভিজিয়ে সে জলকে ফেনা করে ব্যবহার করা হয়। শুকনো ফলগুলি কেটে ভিতরের কালো গোল বীচিটিকে বাদ দিয়ে শুধু খোসাশুদ্ধ শুকনো শাঁসকে রাত্রিতে গরম জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। সকাল বেলায় ঐ জলকে অনেকক্ষণ ধরে নাড়তে থাকলে তাতে যখন বেশ ফেনা দেখা দেয়, তখন খোসাশুদ্ধ শাঁসের কুচিগুলিকে সরিয়ে নিয়ে ঐ জলে কাপড় কেচে নিয়ে, ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে নিলেই তা বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়। পশম ও সিল্কের কাপড় রিটা দিয়ে বেশ ভাল করে সস্তায় কাচা যায়। খারাপ সাবানে কাচলে পশম ও রেশমের তন্তুগুলি যে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, রিটা দিয়ে কাচলে তেমন ক্ষতির কোন আশঙ্কা থাকে না, অথচ ঐ কাপড়গুলি সহজেই বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়।

সময়ে সময়ে বীচি ছাড়িয়ে রিটার শুকনো খোসা ও শাঁসকে গুঁড়ো করে রাখা হয়, এবং ঐ ভাবে বাজারেও তা কিনতে পাওয়া যায়। ব্যবহারের আগের রাত্রিতে ঐ গুঁড়ো গরম জলে ভিজিয়ে রাখলে পরদিন সকাল বেলা ঐ জলকে ছেঁকে নিয়ে গরম কাপড়কে তাতে ছাড়বার আগে ফেনিয়ে নিতে হয়।

কলপ দেওয়ার উপাদান-সমূহ

কাচা কাপড়কে ভাল করে পাট, ভাঁজ ও পালিশ করার জন্যই কিছু না কিছুর সাহায্যে তাকে শক্ত করা আবশ্যক। আবার কলপ থাকলে সাধারণতঃ বাইরের ময়লা তারই উপরে থেকে যায় বলে কাপড়ের সূতোগুলির মধ্যে ময়লা প্রবেশ করতে পারে না। সেজন্য একবার ময়লা হয়ে গেলেও আবার কাচতে পরিশ্রম কম হয়। ভাতের ফেন, চিঁড়ে বা খই বা ময়দা বা এরারুট-সিদ্ধ করা জলে শ্বেতসার (starch) থাকাতে, তাতে কিছু নীল মিশিয়ে নিয়ে কাপড়

কাপড়কে ভিজিয়ে শুকিয়ে নিলে বেশ পরিষ্কার কড়কড়ে হয় বলে, তখন ভাঁজ করা, পাট করা কিংবা ইস্ত্রি করা সহজ হয়। আবার অনেক সময়ে ইস্ত্রির জন্য দোকানে প্যাকেট-করা বিশেষ স্টার্চ বা শ্বেতসার পাওয়া যায়, তা সাধারণতঃ শক্ত কলার, ও সার্টের কফহাতা ও ডবলব্রেষ্টকে শক্ত করে ইস্ত্রি করার জন্যই ব্যবহৃত হয়। নিকৃষ্ট ধরণের সিল্ক বা মাথার রিবন প্রভৃতিকে শক্ত করে ইস্ত্রি করতে হলে তাদের প্রথমেই শ্বেতসারের পরিবর্তে গঁদের জলে ডুবিয়ে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ফুটন্ত জলে শ্বেতসার-দ্রব

ঐ বিশেষ শ্বেতসারের প্রায় এক আউন্স খানিকটা (প্রায় এক আউন্স) ঠাণ্ডা জলে গুলে, প্রায় দেড়পো ফুটন্ত জলে আধ চামচ (ছোট) বোরাক্স্ মিশিয়ে তা আগের পাত্রে ঢেলে ক্রমাগত নেড়ে যেতে হবে, যাতে শ্বেতসার ডেলা না পাকিয়ে বেশ চট্‌চটে আঠার মত হয়ে যায়। তার শাদা রঙ যখন অনেকটা ঘোলাটে হয়ে আসবে, তখন আরো ভাল জলে নিংড়ানো কাপড়ের ভাঁজ খুলে ঐ শ্বেতসার দ্রবে ভাল করে ডুবিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে। তারপর খানিকটা শুকিয়ে গেলে ইস্ত্রি করে নিলেই হল।

কাঁচা জলে শ্বেতসার-দ্রব

প্রায় সমপরিমাণ শ্বেতসার একই ভাবে ঠাণ্ডা জলে গুলে, প্রায় একপো বোরাক্স্ মেশানো একই পরিমাণ অল্প গরম জলে, কয়েক ফোঁটা তার্পিন তেল সহ নাড়তে নাড়তে যখন বেশ আঠার মত হয়ে যাবে, তখন তা ছেঁকে, ঐ জলে কলার, শার্টের কফ বা ডবলব্রেষ্টকে ডুবিয়ে ইস্ত্রিং করে নিলেই তা বেশ শক্ত ও পালিশ হয়। এর জন্য ইস্ত্রিকে আগে বেশ কিছু গরম করে নিতে হয় কারণ ভিজে অবস্থায়ই শুকোবার আগে এমনভাবে ইস্ত্রি করতে হবে যাতে ইস্ত্রির গরমেই শ্বেতসার-দ্রব বেশ আঁঠালো হয়ে উঠে এবং তাতেই ইস্ত্রির সঙ্গে ভিজে অংশটি শুকিয়ে যায়।

গঁদ

সিল্কের, বিশেষতঃ পাতলা ও নিকৃষ্ট জাতীয় সিল্ক, রিবন প্রভৃতিকে শক্ত করে ইস্ত্রি করতে হলে গঁদ-ভিজানো হাল্‌কা জলে ভিজিয়ে ইস্ত্রি করলে তা বেশ শক্ত হয়। শ্বেতসার-জাতীয় কলপে রেশমের স্বাভাবিক চক্‌চকে অবস্থা আর থাকে না, এবং ইস্ত্রির পর কড়কড়ে শক্ত ভাব দেখা যায় বলেই গঁদই তার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। গঁদের টুকরোগুলিকে ভাল করে ধুইয়ে, কিংবা পরিষ্কার গঁদের টুকরোকে গুঁড়ো করে প্রায় দেড়পোয়া জলে দু' আউন্স পরিমিত গঁদকে আগের রাত্রিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। পরে ব্যবহারের আগে তাকে ছেঁকে নিয়ে, ঐ জলে সিল্কের কোন কোন অংশ বা রিবন প্রভৃতি ডুবিয়ে ইস্ত্রি করে নিতে হয়। আবার প্রতি দেড়পোয়া গঁদের জলে এক চামচ (বড়) মেথিলেটেড স্পিরিট মিশিয়ে নিলে ইস্ত্রির পর কাপড়ের জলুস ও চক্‌চকে ভাব আরো ফুটে উঠে।

এরূপ গঁদের জলকে শিশি বা বোতলে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য রাখতে হলে তার মধ্যে কয়েক ফোঁটা ক্লোরোফর্ম বা ফর্মালিন (Chloroform or Formalin) মিশিয়ে রাখা ভাল, তা না হলে তাতে ছাতা পড়ে তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়তে পারে। যদি এভাবে রাখা গঁদ প্রয়োজনাতিরিক্ত চট্‌চটে আঠার মত হয়ে যায়, তাহলে তার খানিকটা নিয়ে তার সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে জল মিশিয়ে নিয়ে, ইস্ত্রির আগে কাপড় বা তার অংশকে প্রয়োজন-মত ভিজিয়ে নিতে হবে।

হাতে বোনা পশমের কাপড়-চোপড় কাচা, ভাঁজ, পাট ও ইস্ত্রি করা

এরকম কাপড়-চোপড়ের জন্য পৃথক্ ও বিশেষ ব্যবস্থা আবশ্যক, কারণ সাবান, সোডা প্রভৃতি যে সকল উপাদানে অধিক পরিমাণে ক্ষার থাকার সম্ভাবনা, তাতে অধিক গরম জলে ভিজোলে এবং অধিক নিংড়োলে বা রগড়ালেও পশমের তন্তুগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আবার অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রাখলে, খুব গরম জলে ডুবিয়ে দিলে কিংবা ক্ষার-সংযোগেও গরম কাপড় অত্যন্ত কুঁচকে যায়। সুতরাং এরকম কাপড় সহজে ভালভাবে পরিষ্কার হয় না। পশমের কাপড়ে ময়লা খুব ভিতরে ঢুকে না, সেজন্য পেট্রোল, ইথার, স্পিরিট প্রভৃতি দিয়ে শুকনো অবস্থায়ই গরম কাপড়ের পরিষ্কারের ব্যবস্থা হতে পারে তার নাম

'শুকনা কাচা' (Dry wash)। এভাবে গরম জামা-কাপড়কে মাঝে মাঝে পরিষ্কার করে নিলে তার কোন ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না, কারণ এগুলির কোনটিই ক্ষার বা অম্লধর্মী নয়, এবং পরিষ্কার করার পর তাদের গন্ধ বা রঙও কাপড়ে থাকে না। কিন্তু তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকলে, বাড়ীতে ঐ ভাবে গরম কাপড় পরিষ্কার করা সহজ ত নয়ই বরং বিপজ্জনকও বটে। কারণ ময়লা-পরিষ্কারক পেট্রোল, ইথার, কোহল, স্পিরিট, প্রভৃতি অতি দাহ্য বস্তু এবং তাদের অসতর্ক ব্যবহারের ফলে অগ্নিকাণ্ডে বিপর্যয়ের আশঙ্কা খুবই বেশী!

সাধারণ গরম জামা-কাপড় পরিষ্কার করে কাচতে হলে খুব ভাল সাবান যেমন 'লাক্স্—ফ্লেকস্' কিংবা 'সানলাইট' প্রভৃতি আবশ্যক। আবার দেশীয় প্রথায় রিটার সাহায্যেও হাতে বোনা কিংবা কলে বোনা গরম কাপড়-চোপড়কে কী কী ভাবে পরিষ্কার করতে হয়, তা আগেই বলা হয়েছে। কাচার আগে গরম কোট, প্যাণ্ট, সোয়েটার প্রভৃতিকে বুরুশ দিয়ে ঝেড়ে, কলার, পকেট, প্লিট প্রভৃতি সুতো দিয়ে টেঁকে নিতে হয় এবং কোন ফিতে দিয়ে তাদের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থও মেপে নেওয়া উচিত।

আগের রাত্রিতে গরম জলে রিটার খোসাশুদ্ধ শুকনো শাঁসকে ভিজিয়ে রেখে কিংবা সকাল বেলাই কুসুম-কুসুম কিংবা ঠাণ্ডা জলেই কিছু বোরাক্স-গুঁড়ো ও লাক্স্—ফ্লেকস্ ফেলে, নাড়তে নাড়তে যখন তা ভাল করে ফেনায়িত হয়ে উঠবে, তখন আলাদা আলাদা ভাবে এক-একটি করে জামা-কাপড় তাতে ডুবিয়ে আস্তে আস্তে থুপিয়ে থুপিয়ে কাচতে হয়। সানলাইট সাবানও কখনই গরম জামা-কাপড়ে ঘসে লাগানো উচিত নয়, কারণ তাতে পশমের আঁশগুলি সরে যেতে কিংবা তা কুঁচকে যেতেও পারে। সুতরাং ঐ রকম সাবানকে ছোট ছোট টুকরো করে কুসুম-কুসুম জলে খানিকক্ষণ ভিজিয়ে ফেনা করে নেওয়া উচিত। কাচার সময় কখনই রগড়ানো কিংবা ধুয়ে নিংড়ানোও উচিত নয়। থুপিয়ে থুপিয়ে কাচার পর প্রচুর জলে ডুবিয়ে কয়েকবার ধুয়ে নেওয়ার পর, কাপড়-জামাকে কোণে ধরে না টেনে, দুহাত তার নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে তুলে নেওয়া উচিত। পশমে অতি সহজে ক্ষার বা সাবান লেগে থাকে বলে, তাকে জল বদলে বারবার না ধুলে তাতে সাবান লেগে থাকতে পারে। বাড়ীতে নিংড়ানোর যন্ত্র থাকলে তা দিয়েই নিংড়ানো উচিত, আর না থাকলে কোন তোয়ালের দ্বারা কাচা কাপড় বা জামাকে জড়িয়ে নিয়ে, চেপে চেপে যতটা সম্ভব জল তাতে শুষিয়ে নিতে হবে। পশমের কাপড় রোদে না দিয়ে কোন স্থানে হাওয়াতে শুকোতে দেওয়াই নিয়ম, এবং কখনই দড়িতে ঝুলিয়ে

কিংবা ক্লিপ এঁটে ঝুলিয়ে শুকোতে দিতে নেই, কারণ জলের ভারে জামা-কাপড় তাতে অযথা লম্বা ও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। হাতে বোনা সোয়েটার, জাম্পার, কম্ফোর্টার প্রভৃতি কোন চওড়া টেবিল বা রকের উপর কোন ভারী বস্তু চাপা দিয়ে শুকানোই উচিত ; কারণ তা না হলে দৈর্ঘ্যে বা প্রস্থে অতি বিসদৃশভাবে লম্বা বা চওড়া হয়ে পড়তে পারে। রোদে বা আগুনে শুকোতে দিলে পশমের রঙ এবং মোলায়েম ভাবও নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

কাচার পর গরম কাপড়-চোপড় ইস্ত্রি করাও খুব সহজ নয়। সূতী কাপড়ের জন্য ইস্ত্রি যত গরম করতে হয়, পশমের কাপড়ের জন্য কখনই তত গরম করা উচিত নয় কারণ সূতী কাপড় সহজেই গরম হ'লেও হাওয়াতে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, কিন্তু পশমের কাপড়ে তাপের পরিবহন কম হয় বলে, তাতে অনেকটা তাপ বহুক্ষণ ধরে জমা থাকে, ফলে ইস্ত্রি বেশী গরম হলে তাতে কাপড় পুড়ে যেতে পারে। এজন্যই ইস্ত্রি কখনই ৩০০° ডিগ্রীর বেশী গরম করা উচিত নয়। একটু ভিজে অবস্থায়ই পশমের কাপড়কে ইস্ত্রি করা ভাল, তবে যদি তার আগে খুব বেশী শুকিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সূতী কাপড়ের মত তার উপর জল না ছিটিয়ে, বরং পাট করে তার উপর ভিজে কোন কাপড় পেতে ইস্ত্রি করা উচিত। ভিজে পশমের কাপড় ইস্ত্রি হয়ে গেলেও খানিকক্ষণ হাওয়ায় রেখে দেওয়া উচিত, যাতে একটু ভিজে থাকলেও একেবারে শুকিয়ে যেতে পারে।

রন্ধন ও খাদ্য-প্রস্তুতি

ভাত, ডাল, ডিম, মাছ, মাংস, তরি-তরকারি, শাক-সবজি প্রভৃতি যে অবস্থায় দোকান বা বাজার হতে কিনে আনা হয়, কিংবা বাগান বা ক্ষেত হতে তুলে আনা হয়, ঠিক সে অবস্থায় তাদের খাওয়া চলে না। জলে বা ভাপে সিদ্ধ করে, আগুনে পুড়িয়ে কিংবা সেঁকে, তেলে বা ঘিয়ে ভেজে কিংবা সাঁতলে, ঐ সকল উপাদানকে দেহের পরিপাকযন্ত্রের পক্ষে যতদূর সম্ভব সহজপাচ্য করে নিতে হয়। আবার নানা রকম মসলাপাতি, লবণ, এবং সুবাসযুক্ত কিংবা ভাল রঙের উপাদানের সাহায্যে তাদের স্বাদ, গন্ধ ও রঙকে ইন্দ্রিয়গুলির পক্ষে উপাদেয় বা তৃপ্তিদায়ক করে নেওয়া হয়।

এভাবে তাদের স্বাদ ও সুবাস বাড়িয়ে, দেহের পক্ষে সুপাচ্য করার জন্য আগুন কিংবা বাষ্পের সাহায্যে তাদের প্রস্তুত করার নামই রন্ধন-ক্রিয়া বা রান্না-বান্না। রান্নার ফলে খাদ্যবস্তুগুলির মধ্যে নানারকমের পরিবর্তন ঘটে, যেমন জলে কিংবা বাষ্পে সিদ্ধ হয়ে শক্ত বস্তু কতকটা নরম হয়, আহার্য অংশ অনাহার্য অংশ হতে বিচ্ছিন্ন হয় (যেমন হাড়ের সঙ্গে মাংসের সংযোগ কতকটা আলগা হয়) এবং আগুনে কিংবা উত্তাপে দুষ্ট জীবাণুদেরও বিনাশ ঘটে। রান্নার ফলে চাল, আটা, ময়দা প্রভৃতির শ্বেতসার-জাতীয় প্রধান অংশের কোষগুলি ফেটে যায় বলে তা সহজপাচ্য হয় এবং মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি ভাল ভাল প্রোটীনজাতীয় খাদ্যগুলি গরম জলে, আগুনে, বাষ্পে কিংবা ফুটন্ত তেল বা ঘিতে উপযুক্ত ভাবে তঞ্চিত হয় বলে সারবান, উপাদেয় ও সুপাচ্য খাদ্যে পরিণত হয়। একই ভাবে নানাজাতীয় তরি-তরকারি, শাক-পাতা, ডাল প্রভৃতি কাঁচা অবস্থায় দুষ্পাচ্য উপাদানগুলি রান্না-বান্নার সাহায্যে অনেকটা সুপাচ্যতা লাভ করে। সিদ্ধ করা মাংসে কাঁচা মাংস অপেক্ষা জলীয় ভাগ কম থাকে এবং সুসিদ্ধ হওয়ার ফলে শুধু যে মাংসের তঞ্চনই হয় এমন নয়, তার পৃথক্ পৃথক্ তন্তুগুলিও একে অন্যের সংস্রব হতে মুক্ত এবং তার কলাজেন নামক দুষ্পাচ্য অংশও কতকটা সহজপাচ্য জিলেটিনে রূপান্তরিত হয়। সুসিদ্ধ মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি খুবই মুখরোচক খাদ্য, এবং সেগুলি হজম করাও সহজ, কিন্তু অতি-সিদ্ধ কিংবা অতি ভাজা অবস্থায় (যেমন চপ, কাট্‌লেট, কালিয়া, কোর্মা, কোপ্তা, কাবাব প্রভৃতি) প্রোটীনের প্রয়োজনাতিরিক্ত তঞ্চনের ফলে, এবং রসনার তৃপ্তির জন্য অতিরিক্ত পরিমাণে তেল, ঘি, মসলাপাতি, গরম মসলা, পেঁয়াজ ও রসুন প্রভৃতির সহযোগে ঐ সুপাচ্যতাও যে খানিকটা ব্যাহত হতে পারে, একথা সর্বদা মনে রাখা উচিত। ফেনসমেত মোটা ও লাল (ঢেঁকিছাঁটা) চাল কিংবা সিদ্ধ চালের ভাত ফেন-গালা ভাত হতে অনেক বেশী পুষ্টিকর। যেমন ভাতের ফেন ফেলে দিলে তার সঙ্গে ভাইটামিন, ধাতব লবণ এবং কতকটা প্রোটীনেরও অপচয় হয়, ঠিক তেমনি পুরু করে আলুর খোসা ছাড়িয়ে তাকে ফেলে দিলে কিংবা তরি-তরকারি, শাকপাতা প্রভৃতি সিদ্ধ করে তার জল ফেলে দিলেও ঐ সঙ্গে বহু পুষ্টিকর উপাদান বাইরে চলে যায়। আবার বহুক্ষণ ধরে খোলা অবস্থায় জলে সিদ্ধ, কিংবা তপ্ত তেল বা ঘিতে ভাজা করতে থাকলে, শাকপাতা, টমেটো প্রভৃতির ভাইটামিন 'সি', দুধ, ঘি ও মাখনের ভাইটামিন 'এ', কাঁচা পেঁপের 'পেপেন'-নামক প্রোটীনভঙ্গক এনজাইম প্রভৃতিও নষ্ট হয়ে যায়। এক বলকা জাল দেওয়া দুধে নিজস্ব সুবাস ও ভাইটামিনগুলি অবিকৃত ও

ঠিক থাকে, কিন্তু দুধকে বারবার গরম করলে, কিংবা ক্ষীর বা রাবড়ি করে নিলে, ওগুলি আর তাতে থাকে না বলে তার খাদ্যমূল্য কমে যায়। এইভাবেই দুধের ছানা কেটে যখন ছানার জলকে ফেলে দেওয়া হয়, তখন অ্যাল্‌বুমেন, গ্লোবিউলিন, ল্যাক্‌টোজ ও কিছুটা মাখন, ধাতব লবণ ও ভাইটামিনগুলিকেও ফেলে দেওয়া হয়। সুতরাং উপযুক্ত রান্নার দ্বারা যেমন নানা খাদ্যের সুপাচ্যতা, আস্বাদ ও পুষ্টিকারিতা বাড়ে আবার তেমনি অনুপযুক্ত রান্না-বান্নার ফলে সুপাচ্যতার পরিবর্তে দুষ্পাচ্যতা এবং পুষ্টির পরিবর্তে পুষ্টিহীনতা যাতে না ঘটে, তার প্রতি প্রখর ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। খাদ্যই আমাদের দেহের বৃদ্ধি, ক্ষতিপূরণ, রোগের প্রতিষেধ ও কর্মশক্তির উৎস; উপযুক্ত রান্নার সাহায্যেই ঐ সকল-কিছু দেহায়ত্ত হয় বলে এ বিশেষ ক্রিয়াটির প্রতি আমাদের যথেষ্ট মনোযোগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

আগুন কিংবা উত্তাপ রান্নার পক্ষে অত্যাবশ্যক। তাছাড়া জল, বাষ্প, তেল, ঘি প্রভৃতিও সহকারী উপাদান বটে। এদের কোন কোনটির একত্র প্রয়োগে নানা প্রক্রিয়ায় রান্না-বান্না করা যায়। বিভিন্ন-রন্ধন প্রক্রিয়ার সুবিধে ও অসুবিধে দুটি দিকই আছে। নীচে তাদের একটা মোটামুটি বিবরণ দেওয়া গেল।

সিদ্ধ করা (Boiling)—এটিই রান্নার সকলের চেয়ে সহজ উপায়। কঠিন খাদ্যোপাদানগুলিকে কোন হাঁড়িতে জল ঢেলে, তার মধ্যে ডুবিয়ে, বা তাতে ছেড়ে দিয়ে আগুনের উপর চাপিয়ে দিতে হয়। তারপর যখন কিছুকাল ধরে ফুটন্ত জলে তা ফুটতে থাকে, তখনই তা সিদ্ধ হয়ে খাওয়ার উপযুক্ত হয়। প্রথম অবস্থায় ঢেকে দিলে, সিদ্ধ করতে কম সময় লাগে। ভাত, ডাল, তরকারি, ডিম, মাছ, মাংস প্রভৃতি এভাবেই জলের সাহায্যে সিদ্ধ করা হয়। ১০০° সেন্টিগ্রেড বা ২১২° ফাঃ হিঃ উত্তাপে যখন জল ফুটতে থাকে, তখন এ সকল খাদ্যোপাদানগুলি, তাতে কিছুক্ষণ ধরে থাকলে, তাদের মধ্যে নানা পরিবর্তন হওয়াতে তারা সুপাচ্য হয়। ভাতের শ্বেতসারের কোষের উপরের আবরণ ফেটে যাওয়াতে, লালারসের টায়ালিন নামক এন্‌জাইম, তার উপর কাজ করতে পারে, তা নইলে মুখের মধ্যে শ্বেতসারের কোন পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। জলে সিদ্ধ করলে মাছ, মাংস, ডাল, তরকারি প্রভৃতি হতে তাদের নির্যাস বেরিয়ে আসে; তারই জন্য বিশেষ খাদ্যের রান্না অবস্থায় বিশেষ বিশেষ গন্ধ ও স্বাদ পাওয়া যায়। ঐ নির্যাসে অনেকটা পুষ্টিকর উপাদানও থাকে, সেজন্যই মাংস, ডাল, টমেটো প্রভৃতি সুপুষ্টিকর। সিদ্ধ হলে মাছ বা মাংস,

কাঁটা বা হাড় হতে কতকটা আলগা হয়ে যায়, এবং তাদের তন্তুগুলিও একে অন্য হতে কতকটা আলগা হয়ে যায় বলে তারা কতকটা সুপাচ্য হয়, কিন্তু এভাবে মাছ, মাংস বা ডিমকে অনেকক্ষণ ধরে সিদ্ধ করতে থাকলে, প্রোটীনের অত্যধিক তঞ্চনের জন্য তা পুনরায় কতকটা দুষ্পাচ্য হয়ে পড়তে পারে, এবং তাদের কোন কোন ভাইটামিনও (যেমন ভাইটামিন সি, এ প্রভৃতি) নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ডাল ও চাল পরিমিত জলে মিশিয়ে এক সঙ্গে সিদ্ধ করে নিলে, মুখরোচক কিন্তু কিছুটা দুষ্পাচ্য খিচুড়ী প্রস্তুত হয়। জল ছাড়া অন্য তরল পদার্থেও কোন কোন খাদ্যকে সিদ্ধ করা যায়। যেমন চিনি বা বাতাসা বা ভাল গুড় সহ চালকে দুধে সিদ্ধ করে নিলে অতি উপাদেয় ও সুস্বাদু পায়েস তৈরী হয়। যে কোন তরিতরকারিকেও জলে কিংবা ভাত বা ডাল যখন জলে সিদ্ধ হতে থাকে তখন সিদ্ধ করে নেওয়া চলে। আমরা ভাত ও রুটির সঙ্গে সাধারণতঃ যে সকল ঝোল, ঝাল, চচ্চড়ি, ডালনা প্রভৃতি তরকারি খাই, সবগুলি প্রথম তেল বা ঘিতে মশলা সহযোগে কিছুটা সাঁতলে নিয়ে পরে জলে সিদ্ধ করে নিতে হয়; যেগুলিতে তরল অংশ অধিক থাকে তাকে বলে ঝোল, আবার যেগুলি শুকনা হয় কিছুটা, তাদের রান্নার বিভিন্ন প্রক্রিয়া-অনুসারে হয় ঝাল, চচ্চড়ি, ডালনা, ছেঁচড়া প্রভৃতি। জলে সিদ্ধ করলে ভাত, ডাল, মাংস, তরি-তরকারি প্রভৃতি সিদ্ধ-করা জল ফেলে দিতে নেই, কারণ তার সঙ্গে অনেকটা সারবস্তু ফেলে দেওয়া হয়। কেবল কচু, মানকচু প্রভৃতি এর ব্যতিক্রম।

অল্পতাপে সিদ্ধ করা (Stewing)—আগেই বলা হয়েছে যে টগবগ করে ফুটন্ত জলে অর্থাৎ ১০০° সেঃ কিংবা ২১২° ফাঃ হিঃ তাপে যদি অনেকক্ষণ ধরে মাংসকে সিদ্ধ করা যায় তাহলে তা কতকটা দুষ্পাচ্য হয়ে পড়ে, সেজন্য ঢাকা অবস্থায় অপেক্ষাকৃত কম উত্তাপে অর্থাৎ ৯২° সেন্টিগ্রেড কিংবা ১৮০° ফারেনহিট উত্তাপে যদি ধীরে ধীরে মাংসকে সিদ্ধ করা যায় তাহলে যেমন তার নির্যাসে পুষ্টিকর উপাদানগুলি বেরিয়ে আসে তেমনি তার প্রোটীনেরও যথাযথ তঞ্চন হওয়াতে তা অযথা শক্ত ও দুষ্পাচ্য হয়ে পড়ে না। আবার বহুক্ষণ ধরে তাপ ও আর্দ্রতার প্রভাবে তার দুষ্পাচ্য কলাজেন ও অন্যান্য সংযোজক কলার রূপান্তর হয় অপেক্ষাকৃত সহজপাচ্য জিলেটিনে, ফলে পেশীর তন্তুগুলি একে অন্যের দৃঢ়-সংযোগ হতে কতকটা বিমুক্ত হয়। একইভাবে আপেল ও অন্যান্য ফলকেও অল্প উত্তাপে ঢাকা অবস্থায় কিছুক্ষণের জন্য সিদ্ধ করে নিলে তার দুষ্পাচ্য এমাইলোপেক্টিন হতে কতকটা সহজপাচ্য অন্যান্য শর্করা বেরিয়ে আসে, অথচ তার ভাইটামিনও কতকটা ঠিক থাকে।

ভাপে সিদ্ধ (Steaming)—কোন অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত হাঁড়িতে ঘি-মসলাপাতি, পেস্তা, বাদাম, লবণ প্রভৃতিসহ ভাল সরু চালকে ঢাকা অবস্থায়, জলপূর্ণ অন্য হাঁড়ির উপর যদি এমনভাবে বসানো যায় যে, নীচের হাঁড়ির জল যখন জ্বলন্ত উনানের উপর ফুটতে থাকে, তখন তার বাষ্প বাইরে বেরিয়ে না গিয়ে উপরের হাঁড়ির চালে গিয়ে লাগতে থাকে, তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই উপরের হাঁড়ির চাল সুসিদ্ধ হয়ে ঘি-ভাতে পরিণত হয়। একইভাবে তাতে কিছু মাংস মিশিয়ে নিলে, অতি মুখরোচক পোলাও প্রস্তুত হয়। আর ইক্‌মিক কুকার প্রভৃতিতেও এ প্রণালীতেই একসঙ্গে ডাল, ভাত, তরকারি, খিচুড়ী প্রভৃতি রান্না হয়, তা খেতেও ভাল হয় এবং সকল পুষ্টিকর উপাদান যেমন ভাতের ফেন ভাতের সঙ্গে, এবং তরকারির নির্যাস তরকারিতেই থাকে বলে ইক্‌মিক কুকারে রান্না খাদ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভাল। ইক্‌মিক কুকারের বাটিগুলিতে একসঙ্গে পরিমাণ মত জল, তেল, ঘি, নুন প্রভৃতি দিয়ে কোনটিতে ভাত, কোনটিতে ডাল আর কোনটিতে তরকারি বসিয়ে একটি মুখঢাকা লম্বা লম্বা পাত্রের মধ্যে একসঙ্গে সব ক'টিকে ঢুকিয়ে দিতে হয়। সবক'টির আধার পাত্রের মধ্যে নীচে থাকে জল। আগুন বা ষ্টোভের উপর পাত্রটিকে বসিয়ে দিলে, যে বাষ্প হয়, সে বাষ্পেই সবকটি বাটির উপাদানগুলি সুসিদ্ধ হয়ে খাদ্যের উপযোগী হয়। আজকাল এরই অনুকরণে আরো নানা প্রকারের কুকার বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। অন্যভাবে কোন কৌটো বা মুখবদ্ধ ছোট হাঁড়িতে ডাল, ভাত, কিংবা তরকারির উপাদানগুলিকে রেখে তার মুখে খুব ভাল করে ঢাকনি চেপে দিয়ে, ঐ কৌটো বা ছোট হাঁড়িটিকে যদি অন্য অপেক্ষাকৃত বড় জলপূর্ণ হাঁড়ির মধ্যে পুরে, আগুনের উপর তাকে বসিয়ে দেওয়া হয় তাহলে ঐ জলীয় বাষ্পে কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোট হাঁড়ির মধ্যে বেশ ভাল করেই রান্না হয়ে খাদ্য খাওয়ার উপযুক্ত হয়। এরূপ ভাপে সিদ্ধ খাদ্য সুস্বাদু, নির্দোষ ও খুবই পুষ্টিকর হয়।

সেঁকা (Baking)—আগুনের উপরে চাটু বা তাওয়াতে বসিয়ে, কিংবা ইলেকট্রিক গ্যাস বা কাঠকয়লার বিশেষ উনানে আটা বা ময়দার প্রস্তুত কোন খাদ্যকে রান্না করে যখন খাওয়ার উপযুক্ত করে নেওয়া হয়, তখন ঐ প্রক্রিয়াকে বলা হয় সেঁকা। এভাবেই হাতে গড়া রুটি পাউরুটি, কেক, বিস্কুট প্রভৃতি তৈরী হয়। ময়দাকে ভাল করে থেসে, নেচি করে ঐগুলিকে বেলে প্রথমে তাওয়া বা চাটুর উপরে দুদিক সেঁকে, পরে তা কাঠকয়লার আগুনের উপর আবার সেঁকে নিলেই খুব ভাল হাতে-গড়া রুটি তৈরী হয়। একইভাবে পাঁপরকেও সেঁকে

নেওয়া যায়। পাউরুটি, কেক, বিস্কুট প্রভৃতিকে সেঁকার জন্য উপযুক্ত বিশেষ চুল্লী বা তন্দুর তৈরী করে নিতে হয়। এইভাবে পুডিংও প্রস্তুত হতে পারে। মাংসের শিক্‌কাবাবও অনেকটা এ প্রক্রিয়াতেই তৈরী হয়। মসলাপাতি, নুন ও ঘি দিয়ে ভাল করে মেখে একটি লোহার শিকে পরপর মাংসের টুকরোকে গেঁথে আগুনের তাতে রেখে দিতে হয়। ঐ ভাবেই তেল বা ঘিয়ে না ভাজলেও, ধীরে ধীরে শিকে গাঁথা অবস্থায় প্রথমে প্রোটীন তঞ্চিত হয় ও পরে বেশীক্ষণ থাকলে তা কড়া ভাজার মত হয়ে যেতে পারে। শিক্‌কাবাব আবার অনেকটা



রুটি সেঁকা

রোষ্টিং বা আঁচে সিদ্ধ বা ভাজার মতও বটে। তেল মাখিয়ে বেগুনকে পোড়ানোও অনেকটা ঐ রকমেরই রান্না।

আগুনের আঁচে বা গরম হাওয়ার সাহায্যে সিদ্ধ করা, ঝলসানো বা ভাজা (Roasting)—সাধারণতঃ তাপের পরিবহন বা পরিচলনের পরিবর্তে বিকিরণের দ্বারা জল ছাড়াও রান্না করা সম্ভব, তারই নাম রোষ্টিং। এরূপ উত্তাপ-প্রয়োগের ফলে হাড়ের জোড়গুলি হতে মাংসের নির্যাস বেরিয়ে আসে, এবং ঐ জলীয় নির্যাসকে উপযুক্ত ঘি-মসলাপাতি সহযোগে মাংসের

গায়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়, এবং তাতেই মাংস কতকটা সিদ্ধ এবং উপরের অংশ ভাজার মত হয় বলে, মাংসকে জলে সিদ্ধ করলে পুষ্টিকর উপাদানের যেটুকু ক্ষতি হয় এক্ষেত্রে তা মোটেই হয় না সুতরাং মাংসের রোষ্ট খেতে যেমন ভাল লাগে, আবার তেমনি পুষ্টিকরও বটে। জোড়গুলির সংশ্লিষ্ট মাংসে উত্তাপ অধিক পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হয় বলে, যে নির্যাস বেরিয়ে আসে তার ধাতব লবণগুলি ভিতর হতে বাইরে চলে আসার দরুণই রোষ্ট করা মাংসের গন্ধ ও আস্বাদ উপাদেয় হয়। বিকিরণ উত্তাপ-প্রয়োগে মাংসের জলীয় ভাগ অনেকটা বাষ্পাকারে উবে যায় বলে রোষ্ট করার পর মাংসের ওজন বেশ কিছুটা কমে যায়।

ভাজা (Frying)—বালি, তেঁল বা ঘিকে কড়া গরম করে, তাহার সাহায্যে কোন খাদ্য বস্তুকে রান্না বা খাওয়ার উপযোগী করার নামই ভাজা করা। উনানের উপর কড়াইতে বালিকে খুব গরম করে, তার উপর ধান, ভুট্টার বীচি বা চাল ছেড়ে কিছু দিয়ে নাড়তে থাকলে যে খই, বা মুড়ি পাই, তা যেমন ভাজা খাদ্য, আবার উনানের উপর তেল বা ঘিকে ফুটিয়ে নিয়ে, মাছ, আলু, পটোল, বেগুন, বড়ি, পাঁপর, লুচি, কচুরি, সিঙ্গাড়াও তেমনি আর এক রকমের ভাজা খাদ্য। আবার চাটু বা তাওয়ার উপরে অতি অল্প তেল বা ঘিতে প্রস্তুত পরোটা, সরুচাকলি, ডিমের অমলেট প্রভৃতিও এই প্রক্রিয়ায় রান্নাকরা খাদ্য। লুচি, পুরি, বড়ি, পাঁপর, ধোঁকা, আলু প্রভৃতি যখন ভাজা হয় তখন গরম তেল বা ঘিতে, শ্বেতসারের কোষগুলির আবরণ ফেটে যায় বলে তা যেমন সুপাচ্য হয় আর তাদের মধ্যে যে প্রোটীন থাকে, তাও কতকটা তঞ্চিত হয় বলে পরিপাকের সুবিধে হয়। কিন্তু কড়া ভাজা অবস্থায় অনেক সময়ে খাদ্য অত্যন্ত দুষ্পাচ্য হয়ে পড়ে।

ছাঁকা ঘি বা তেলে ভাজতে হলে কড়াইতে উপযুক্ত পরিমাণে ঘি বা তেল ঢেলে নিয়ে যখন তা গরম হতে থাকে তখন সামান্য জলের ছিটে দিয়ে দেখতে হবে যে তা ভাজা করার মত উপযুক্ত গরম হয়েছে কিনা। যদি জলের ছিটে পড়ে তেলের বুদ্‌বুদ্ হতে থাকে, তবে বুঝতে হবে যে তা ২১২° ডিগ্রীর (ফা. হি.) উপরে উঠেনি। কিছুক্ষণ পরে যখন বুদ্‌বুদ্‌গুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তখনই বুঝতে হবে যে তা ভাজা করার উপযুক্ত হয়েছে। ঐ সময়ে ছোট একটি ময়দার ডেলা যদি তাতে ফেলা যায়, এবং তা তৎক্ষণাৎ যদি লালচে হয়ে যায় তবে বুঝতে হবে যে উত্তাপ ৩৫০° ডিগ্রীর উপরে উঠেছে, অর্থাৎ কিছু ভাজবার উপযুক্ত হয়েছে। তখন ছাঁকা ভাঁজার উপাদান মাছ,

আলু, লুচি, কচুরি, সিঙ্গাড়া প্রভৃতি তৈরী করে তাতে ছেড়ে দিলে ঠিকমত ভাজা হতে পারবে। কোন কোন উপাদান ভাজার কালে তেল বা ঘি শুষে নেয় বলে, সেগুলি অধিক পরিমাণে লাগে, যেমন বেগুনভাজা। আবার কোন কোন জিনিসে তৈলজাতীয় পদার্থ থাকাতে একবার ভাজতে আরম্ভ করলে একরকম নিজের তেলেই নিজে ভাজা হয়, যেমন ইলিশমাছ, খাসীর কিংবা মাছের তেলের বড়া প্রভৃতি।

প্রশ্ন

১। বিভিন্ন পোকা-মাকড়ের উপদ্রব হ'তে পরিত্রাণের উপায় কি ?

২। বিভিন্ন ধাতুনির্মিত দ্রব্যাদিতে মরচে বা কালচে দাগ পড়ার কারণ কি ? কী ভাবে এইগুলি পরিষ্কার ও চকচকে রাখা যায় ?

৩। কলপ দেওয়ার বিভিন্ন উপাদান সমূহের পরিচয় দাও

৪। পশমের কাপড়-চোপড় কাচার উপায় কি ?

চতুর্থ অধ্যায়

খাদ্য

আমাদের দেহ যেন ঠিক একটি ইঞ্জিন। মোটর গাড়ীর ইঞ্জিন যেমন পেট্রোল না হলে চলে না, আমাদের শরীরও তেমনি খাদ্য না পেলে ক্রমশঃ চলনশক্তি হারিয়ে ফেলতে থাকে। পেট্রোল যেমন দহনের ফলে গাড়ীর ইঞ্জিনে তাপ ও তা হতে শক্তি যোগায়, তেমনি আমাদের শর্করা ও স্নেহজাতীয় খাদ্য এবং কতকটা প্রোটীনও খাদ্যরূপে দহনের ফলে আমাদের দেহযন্ত্রকে কর্মশক্তি বা চলনশক্তি জোগায়। কিন্তু গাড়ীর ট্যাঙ্কে যথেষ্ট পেট্রোল থাকা সত্ত্বেও আর একটি তেল অর্থাৎ মোবিল তেলকে গাড়ীতে না ঢাললে যেমন ইঞ্জিনের ক্ষমতা কমতে থাকে, ঠিক সে ভাবেই খাদ্যের ভাইটামিনগুলিও আমাদের দেহযন্ত্রের পক্ষে ঠিক মোবিলের মতই কাজ করে। খাদ্যে কোন কোন ভাইটামিনের অভাবে শিশুদের উপযুক্ত দেহবৃদ্ধি হয় না, আবার সময়ে সময়ে নানা রোগও দেখা দেয়, কিংবা দেহের কোন কাজই ঠিকমত হয় না বলে স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয় ও দেহ অকেজো হয়ে পড়ে।

আমাদের দেহযন্ত্র কিন্তু এ পর্যন্ত মানুষের তৈরী ইঞ্জিনের সঙ্গে তুলনীয় হলেও নানা কারণেই ইঞ্জিনের চেয়ে তা শ্রেয়ঃ, কারণ চলতে চলতে বা কোন কারণে ইঞ্জিনের একটি অংশ ক্ষয়ে গেলে বা বিকল হয়ে পড়লে, যতক্ষণ না তাকে বদলে নেওয়া বা মেরামত করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার আর চলবার বা কাজ করবার ক্ষমতা থাকে না ; কিন্তু প্রাণিদেহের নানা অংশে প্রত্যহই যে ক্ষতি হতে থাকে, খাদ্য হতে প্রয়োজন-মত অংশ নিয়ে দেহী নিজেই অন্যের সাহায্য না নিয়েও সে ক্ষতিপূরণ করতে পারে। আবার ছোট ইঞ্জিন চিরকালই একই আকারের ছোট ইঞ্জিন থাকে, যত দিন যেতে থাকে নিজ হতে সে কখনো বড় হতে পারে না। কিন্তু আজ জন্মেছে যে প্রাণী, কালই সে আর একটু বড় হ'বে এবং ক্রমশই বড় হতে থাকবে, যে পর্যন্ত না সে পূর্ণবয়স্ক হয় এবং সে অনুপাতেই তার দেহযন্ত্রেরও বিভিন্ন অংশ বড় ও অধিক কার্যক্ষম হয়ে উঠতে থাকবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। দেহযন্ত্রের এ ভাবে ক্ষয়বিকৃতির পূরণ ও বৃদ্ধি হয় খাদ্যের দুটি বিশিষ্ট উপাদানের দ্বারা, যথা, প্রোটীন-জাতীয় খাদ্য ও ধাতব উপাদান-সমূহ।

এই কারণেই শরীরের পক্ষে ক্রিয়া-অনুসারে, খাদ্যে বর্তমান বিভিন্ন উপাদানগুলিকে নিম্নলিখিত চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—

(১) অত্যাবশ্যক তরল উপাদান,—যেমন জল।

(২) কর্মশক্তিদায়ক—স্নেহজাতীয় উপাদান,—তেল, ঘি, মাখন প্রভৃতি ও শর্করা জাতীয় উপাদান,—ভাত, রুটি চিনি প্রভৃতি।

(৩) অত্যাবশ্যক সহকারী উপাদান—ভাইটামিন-সমূহ।

(৪) দেহ-সংগঠক উপাদান—প্রোটীন-জাতীয়,—যেমন মাংস, মাছ, ডিম প্রভৃতি এবং ধাতব লবণ জাতীয়,—যেমন ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস, লোহা প্রভৃতি ঘটিত লবণ ও অন্যান্য উপাদান।

অত্যাবশ্যক সহকারী উপাদান (Accessory food factors)—ভাইটামিনগুলি (খাদ্যপ্রাণ) এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কারণ এগুলির দ্বারা প্রোটীনের মত দেহের ক্ষয়-পূরণ কিংবা স্নেহ ও শ্বেতসারের ন্যায় দেহের কর্মশক্তির বর্ধন সম্ভব না হলেও নানা রোগের প্রতিষেধ, ও শরীরে নানা অত্যাবশ্যক প্রক্রিয়ার সাহায্যের জন্য ভাইটামিন অপরিহার্য। সম্প্রতি প্রায় সব ক'টি ভাইটামিনেরই রাসায়নিক প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের নিকট ধরা পড়াতে রাসায়নাগারে তাহাদের কৃত্রিমভাবে উৎপাদন সম্ভবপর হয়েছে। সুতরাং কোন বিশেষ ভাইটামিন-সমন্বিত খাদ্যের অভাব হলেও ঔষধের দোকান হতে কিনে খাদ্যের সঙ্গে খেলে যে তাদের অভাব সহজেই মিটতে পারে, এটা বিজ্ঞানীদের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নহে। দ্রবণীয়তা-ভেদে স্বাভাবিক ভাইটামিনগুলিকে দুটি বিশিষ্ট শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা—

(১) স্নেহে দ্রবণীয়—ভাইটামিন 'এ', 'ডি', 'ই', 'কে' প্রভৃতি;

(২) জলে দ্রবণীয়—ভাইটামিন 'বি-সমষ্টি', 'সি', 'পি' প্রভৃতি।

ভাইটামিন 'এ'—দুধ, মাখন, ডিমের কুসুম এবং কড, হালিবাট, হাঙ্গর প্রভৃতির যকৃৎ-নিঃসৃত তৈলে এই উপাদানটি প্রচুর থাকে। এতদ্ব্যতীত গাজর, পাকা বিলাতি বেগুন, পাকা আম, পাকা পেঁপে ও শাকসবজিতেও 'ক্যারোটিন' নামক যে পদার্থ থাকে তা থেকে প্রাণিদেহের যকৃৎ অনায়াসেই এই ভাইটামিনটি প্রস্তুত করতে পারে। খাদ্যে এর অভাবে শিশুদের সম্যক দেহবৃদ্ধি হয় না, এবং রাতকানা প্রভৃতি চক্ষুরোগ, মাছের আঁইশের মত শুষ্ক চর্মরোগ এবং সর্দি-কাশি প্রভৃতি শ্বাসনালী ও ফুস্‌ফুসের রোগ জন্মে।

ভাইটামিন 'ডি'—দুধ, মাখন, ডিম প্রভৃতি যে সকল প্রাণিদেহজাত স্নেহ-পদার্থে ভাইটামিন 'এ' থাকে, তার সঙ্গে সর্বদাই কতকটা ভাইটামিন

ডি'ও থাকে। এতদ্ব্যতীত দেহের ত্বকে আর্গস্টেরোল নামক যে উপাদানটি



ভাইটামিন 'এ' সমন্বিত বিভিন্ন খাদ্য

থাকে তা ভোরবেলার সূর্যের বেগুনেতর রশ্মির (Ultra-violet rays) প্রভাবে ভাইটামিন 'ডি'তে রূপান্তরিত হয় বলে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এর অভাব-



ভাইটামিন 'ডি' সমন্বিত খাদ্যসমূহ

জনিত 'রিকেটস্' নামক অস্থিবিকৃতি রোগ প্রায় দেখা যায় না।

ভাইটামিন 'ই'—মটর, চা, লেটুস শাক, অঙ্কুরিত গম প্রভৃতিই এ ভাইটামিনের আধার। এর প্রধান কার্য দেহের শক্তি বাড়ানো, মাতৃগর্ভস্থ



ভাইটামিন 'ই' সমন্বিত খাদ্যসমূহ

ভ্রূণের স্বাস্থ্যরক্ষা। এর অভাবে গর্ভস্থ ভ্রূণ প্রায়শঃ জন্মের পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায়।

ভাইটামিন 'কে'—নানাপ্রকার উদ্ভিদকোষে এবং আলফাফা নামক এক প্রকার ঘাসে এ ভাইটামিনটি থাকে। দেহে এই ভাইটামিনটির অভাবে, রক্তের



তঞ্চনকাল বিলম্বিত হয় বলে কোনও কারণে দেহ হতে রক্তপাত হতে থাকলে, বহুক্ষণ পর্যন্ত প্রচুর রক্তপাত চলতে থাকে।

ভাইটামিন 'বি-সমষ্টি'—এ শ্রেণীতে কয়েকটি বিভিন্ন উপাদান আছে বলে তাদের 'সমন্বয়'-কে 'বি-সমষ্টি' বলা হয়।

(ক) ভাইটামিন 'বি,' বা এনিউরিন—এটি সাধারণতঃ চাউলের উপরকার পাতলা লাল আবরণে, অঙ্কুরিত ছোলা ও মুগ প্রভৃতিতে, লাল আটায়, সিদ্ধ

চাউলে ও ঈষ্ট্ নামক বস্তুতে আছে। কলে ছাঁটা চালে, ফেন-গালা ভাতে কিংবা সাদা ময়দায় এ ভাইটামিন একেবারেই থাকে না। এর অভাবে 'বেরি-



ভাইটামিন বি, সমন্বিত খাদ্যসমূহ

বেরি নামক রোগ হয়, দেহের পুষ্টি কম হয় ও অবসন্নতা ঘটে এবং অজীর্ণ ও অম্লরোগ প্রভৃতি পাকযন্ত্রের নানা রোগ জন্মে।

(খ) ভাইটামিন বি₂ (১) বা রিবোফ্লোবিন—দুধ, দই, ঘোল, পনির, ডিম, যকৃৎ, বৃক্ক, কলমি শাক, গমের অঙ্কুর এবং বিভিন্ন ডালে এ ভাইটামিনটি আছে। এর অভাবে জিভে ঘা, চোখের নানা রোগ, শ্বাসকষ্ট, বৃহদন্ত্র-প্রদাহ, দুর্বলতা, অবসন্নতা, ক্ষুধামান্দ্য ও চুল-পড়া প্রভৃতি রোগ জন্মে।

(গ) ভাইটামিন বি₂(২) বা নিকোটিনিক এসিড—এটি ইষ্ট্, যকৃৎ, গমের অঙ্কুর, চীনে বাদাম, ডাল, চালের কুড়া প্রভৃতিতে থাকে। এর অভাবে



ভাইটামিন বি₂ (১) পূর্ণ খাদ্যসমূহ

'পেলাগ্রা' নামক রোগ জন্মে, জিহ্বাতে কাল দাগ পড়ে, ঠোঁটের কোণে ঘা

হয় ; চামড়ায় কালো কালো দাগ পড়ে ও নানা চর্মরোগ হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও মনে অবসন্নতা দেখা যায়।

(ঘ) ভাইটামিন 'বি৩' বা পেণ্টোথেনিক এসিড—যকৃৎ ও বৃক্ক, ঈষ্ট, চালের কুঁড়া, আস্ত শস্য ও ডাল প্রভৃতিতে আছে। খাদ্যে এর অভাব ঘটলে নানা চর্ম রোগ, চুল উঠা, অন্ত্রে ঘা, এবং স্নায়বিক বিকৃতি দেখা দেয়।

(ঙ) ভাইটামিন বি৬ বা পাইরিডোক্সিন—ইষ্ট, চালের কুড়া, অঙ্কুরিত গম ও অন্যান্য শস্য ও ডালে ইহার প্রাচুর্য দেখা যায়। এর অভাবে স্নায়ুচাঞ্চল্য, নিদ্রাহীনতা, অকারণে উত্তেজনা, পেটে ব্যথা, এবং গতিকৃচ্ছতা দেখা যায়।

(চ) ভাইটামিন বি১২ বা ফলিক এসিড—গাছের সবুজপাতা, ব্যাঙের ছাতা, ঈষ্ট্ এবং প্রাণিদেহে যকৃৎ ও বৃক্ক প্রভৃতিতে থাকে। এর অভাবে 'স্প্রু', রক্তাল্পতা প্রভৃতি রোগ জন্মে।

ভাইটামিন 'সি' বা এস্কর্বিক এসিড—বিলাতি বেগুন, আমলকী,



ভাইটামিন 'সি' পূর্ণ খাদ্যসমূহ

প্রভৃতি নানা টাটকা ফলমূল, অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ প্রভৃতি এবং কাঁচালঙ্কাতেও এ ভাইটামিনটি প্রচুর পরিমাণে থাকে। তাছাড়া কমলালেবু, পাতিলেবু, বাতাবীলেবু, মুসাম্বি প্রভৃতি ফলের রসেও তা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। সিদ্ধ অবস্থায় খাদ্যে এই ভাইটামিনটি নষ্ট হয়ে যায় বলে এ খাদ্যগুলিকে যতদূর সম্ভব কাঁচা অবস্থাতেই খাওয়া উচিত। খাদ্যে এর অভাবের জন্য 'স্কার্ভি' নামক রোগ জন্মে এবং দাঁত হতে ও চামড়ার নীচে রক্তপাত হতে থাকে।

ভাইটামিন 'পি' বা সাইট্রিন— এটি প্রায়শঃ যে সকল উপাদানে ভাইটামিন 'সি' থাকে, সেগুলিতেই ঐ ভাইটামিনটির সঙ্গে একত্র বর্তমান থাকে। এর অভাবেও স্কার্ভি রোগে যেভাবে দেহের সর্বত্র রক্তপাত হতে থাকে, সেভাবেই রক্তপাত হয়। সুতরাং এর ক্রিয়াও অনেকটা ভাইটামিন 'সি'রই অনুরূপ।

সাধারণতঃ প্রত্যেকটি ভাইটামিনের অভাবে শরীরে কোন না কোন রোগ হয়। সুতরাং রোগের প্রতিষেধের জন্য ত বটেই, এবং দেহযন্ত্রের নানা অংশের ক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে স্বাভাবিক পথে নিয়ন্ত্রণের জন্যও, এক বা একাধিক ভাইটামিনের প্রয়োজন বড় কম নয়। দৃষ্টান্ত স্থলে, পেশী ও স্নায়ুর সক্রিয়তার জন্য যে অক্সিজেন-সংযোগ আবশ্যক তার জন্য ভাইটামিন বি, ও বি₂ খাদ্যে থাকা চাইই চাই, তা না হলে সহজেই পেশী, মস্তিষ্ক কিংবা স্নায়ু অবসন্ন হয়ে পড়ে। এভাবেই ভাইটামিন 'সি' রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বাড়ায় এবং শরীরে ধাতু-ঘটিত কিংবা জীবাণুঘটিত বিষের ক্রিয়াকেও অনেকটা লাঘব করতে পারে। আবার কোন কোন ভাইটামিন একই উদ্দেশ্যে একযোগে কাজ করে যেমন ভাইটামিন 'এ' ও ভাইটামিন, বি₂ (১) (রিবোফ্লেবিন); এ দুইই দেহবৃদ্ধির সহায়ক সুতরাং তারা ভাইটামিন 'ডি'র সঙ্গে একযোগে কাজ করে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটায়। ভাইটামিন 'সি' ও 'পি' সর্বদাই একসঙ্গে রক্ত-প্রণালীর ঝিল্লীকে স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করে। আবার ভাইটামিন 'ই'র উপস্থিতিতে ভাইটামিন 'এ' কিংবা 'সি' সহজে অক্সিজেন-সংযোগে নষ্ট হতে পারে না।

প্রত্যেকটি ভাইটামিন প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে না খেলে শরীরে তার অভাবে রোগ কিংবা অন্য অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে। সাধারণতঃ প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষে প্রতিদিন গ্রহণীয় পরিমাণ হতে শিশু, রুগ্ন ব্যক্তি, গর্ভিণী ও স্তন্যদাত্রী জননীর পক্ষে গ্রহণীয় পরিমাণ কতকটা বেশি হওয়া উচিত। আবার কোন কোনটির পরিমাণ অত্যধিক হয়ে পড়লে, তা শরীরের পক্ষে হানিকরও হয়ে পড়তে পারে, যেমন ভাইটামিন 'ডি'।

ভাইটামিন 'এ'র দৈনিক গ্রহণীয় পরিমাণ সাধারণতঃ তিন মিলিগ্রাম বা ৪২০০—৫৬০০ ইউনিট (I. U.) হলেও বর্ধনশীল শিশুর পক্ষে প্রতিদিন তার দ্বিগুণ এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী জননীর পক্ষে অন্তত দেড়গুণ আবশ্যক।

বি-সমষ্টির অন্তর্গত ভাইটামিন বি₁, বি₂(১) (রিবোফ্লেবিন), বি₂(২) (নিকোটিনিক অ্যাসিড) প্রভৃতির দৈনিক গ্রহণীয় পরিমাণ যথাক্রমে ৩০০ ইউনিট (বা এক মিলিগ্রাম থায়ামিন ক্লোরাইড), ২—৩ মিলিগ্রাম (রিবোফ্লেবিন) ও ২৫০—৫০০ মিলিগ্রাম (নিকোটিনিক অ্যাসিড)।

ভাইটামিন 'সি'র দৈনিক অবশ্য গ্রহণীয় পরিমাণ ৫০—৭৫ মিলিগ্রাম (এস্কর্বিক অ্যাসিড) মাত্র, এবং ভাইটামিন 'পি'র (সাইট্রীন) ৫০ মিলিগ্রাম মাত্র।

ভাইটামিন 'ডি'র দৈনিক গ্রহণীয় পরিমাণ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে, ৬০০—১০০০ ইউনিট এবং শিশুদের পক্ষে ২০০০—৫০০০ ইউনিট।

ভাইটামিন 'ই'র দৈনিক অত্যাবশ্যক পরিমাণ ২৫ মিলিগ্রাম (আল্‌ফা টকোফেরোল) বা তিন মিলিগ্রাম অঙ্কুরিত গমের তেল।

ভাইটামিন 'কে'র দৈনিক আবশ্যক পরিমাণ কুড়ি ইউনিট মাত্র।

ভাইটামিনগুলির কোন কোনটি আবার আমাদের শরীরেই তৈরী হতে পারে। গাজর, বিলাতি বেগুন, পাকা আম, কাঁটাল, পেঁপে প্রভৃতি ফলে যে কেরোটিন নামক উপাদান থাকে কিংবা নটেশাক, পালংশাক লেটুস্‌শাক, বাঁধাকপি প্রভৃতিতে যে সবুজ ক্লোরোফিল নামক উপাদান থাকে, তার সঙ্গেও যথেষ্ট কেরোটিন থাকাতে, ঐ সকল খাদ্য খেলে যকৃতের মধ্যে যথেষ্ট ভাইটামিন 'এ' উৎপন্ন হতে পারে। গরুর দুধ কিছুটা হলদে হয়; কারণ তাতেও মাখনের ভাইটামিন 'এ'র সঙ্গে এই কেরোটিন আছে। গরু মাঠে চরে সবুজ ঘাস যদি না খেতে পায়, তাহলে তার দুধের রঙ কেরোটিনের অভাবে সাদা হয়ে যায়। সুতরাং বেশী দাম দিয়ে দুধ, ঘি, মাখন বা কডলিভার অয়েল কিনে খেতে না পারলেও যদি প্রচুর পাকা ফল বা শাকপাতা খাওয়া যায়, তাহলেও ঐগুলি শরীরের পক্ষে ভাইটামিন 'এ'র চাহিদা মিটাতে পারে।

খাদ্যে যদি প্রচুর স্নেহজাতীয় পদার্থ, অর্থাৎ ঘি, মাখন প্রভৃতি থাকে তাহলে অন্ত্রের মধ্যে যে সকল জীবাণু থাকে, তারাও কিছু না কিছু ভাইটামিন বি$_১$ তৈরী করে শরীরের কাজে তার যোগান দিতে পারে। অন্ত্রের জীবাণুগুলি শুধু বি$_১$-ই নয় বি$_২$(১), বি$_২$ (২), ভাইটামিন 'কে' প্রভৃতিও সময়ে সময়ে তৈরী করতে পারে।

চামড়ার নীচে কলেষ্টেরোল নামে যে উপাদান থাকে সকালবেলার রোদে যে বেগুনেতর রশ্মি (ultraviolet) থাকে, তারই প্রভাবে তা'তে রিকেট্‌স্-প্রতিষেধক, ভাইটামিন 'ডি' প্রস্তুত হয়। এ জন্যই আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা সর্বদাই প্রচুর রোদ পায় বলে তাদের রিকেট্‌স্ বা অস্থিবিকৃতি রোগ খুব কম হয়। আবার যে সকল মেয়েরা সর্বদা অন্দর মহলে, পর্দার আড়ালে থাকে এবং রোদের মুখ দেখতে পায় না, তাদেরও উঠতি-বয়সে আর এক রকম অস্থিবিকৃতি (osteomalacia) রোগ জন্মে ব'লে, স্বাভাবিকভাবে সন্তান-প্রসব দুর্ঘট হয় ও অনেক সময়ে ঐ কারণে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে।

কোন কোন ভাইটামিন দেহে তৈরী হতে পারে ব'লে নিশ্চিন্ত থাকা কোন কাজের কথা নয়। দেহের দৈনন্দিন ক্ষতিপূরণ ও কর্মশক্তিলাভের জন্য প্রতিদিন খাদ্যতালিকায় যেমন নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রোটীন, শর্করা ও স্নেহজাতীয় উপাদানের উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক, ঠিক তেমনি বয়স ও শারীরিক প্রয়োজনানুযায়ী ভাইটামিনগুলিও যাতে সে তালিকার অন্তর্ভুক্ত খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে থাকে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আবার শুধু থাকলেই চলবে না, যাতে ঐগুলি রান্নার কালে উত্তাপের দ্বারা কিংবা ক্ষার প্রভৃতি হানিকর উপাদানের সংস্পর্শে নষ্ট না হয়ে যায় তার প্রতিও নজর রাখতে হবে। ভাইটামিন 'সি' ও 'পি' প্রভৃতি ৭৫° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের চেয়ে বেশী উত্তাপে কিংবা ক্ষার-সংযোগে (সোডি বাই কার্ব) অতি সহজে নষ্ট হয়ে যায়। একইভাবে ভাইটামিন 'সি' অক্সিজেন-সংযোগে অতি সহজে, এবং ভাইটামিন 'এ'-ও বহুক্ষণ ধরে খোলা অবস্থায় অক্সিজেনের সংযোগে যখন রান্না করা হয়, তখন নষ্ট হয়ে যায়। ভাইটামিন বি-সমষ্টি ও 'ডি' বা 'ই' সহজে খুব একটা নষ্ট হয় না। কিন্তু যদি কোন কারণে খাদ্য-তালিকায় কোন ভাইটামিনের অভাব হয়, তাহলে ওষুধের দোকান হতে তা কিনে এনে প্রত্যহ উপযুক্ত পরিমাণে খাওয়া উচিত।

খাদ্যের ধাতব উপাদান-সমূহ

ভাইটামিনগুলির মতই ধাতব লবণগুলিও দেহবৃদ্ধিকারক ও দেহরক্ষাকারী অত্যাবশ্যক উপাদান বলে পরিচিত। যে কোন খাদ্যের উপাদানের মধ্যেই, সে প্রাণিজ হোক আর উদ্ভিজ্জই হোক, কিছু না কিছু ধাতব লবণ থাকে। ঐগুলির মধ্যে ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস, লোহা, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, আয়োডিন, তামা, নিকেল, কোবাল্ট্ প্রভৃতিই প্রধান।

ক্যাল্‌সিয়াম—দুধ, ডিম প্রভৃতি প্রাণিজ এবং শিম, ফুলকপি, বাদাম প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ খাদ্যেই সাধারণতঃ এ উপাদানটি অধিক পরিমাণে থাকে, সেজন্যই হাড়ের ও দাঁতের প্রধান উপাদান ক্যাল্‌সিয়াম ব'লে, শিশুদের খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে দুধ ও ডিম থাকা আবশ্যক। তা না হলে তাদের দেহের সম্যক্ বৃদ্ধি হয় না। তা ছাড়া হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক ক্রিয়া, রক্তের তঞ্চন, পাকস্থলীতে দুধের তঞ্চন, স্নায়ুর সাম্যভাব ও দুধের ক্ষরণ প্রভৃতির জন্যও ক্যাল্‌সিয়ামের আবশ্যক। দৈনিক গ্রহণীয় পরিমাণ শিশুদের পক্ষে এক গ্রাম মাত্র; বয়স্কদের পক্ষে ০·৬৮ গ্রাম মাত্র।

ফস্‌ফরাস্—দুধ, ডিম, মাছ, মাংস প্রভৃতি প্রাণিজ খাদ্যে ফস্‌ফরাস্ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। নানা তরিতরকারিতে এবং গম, চাল প্রভৃতিতেও ফস্‌ফরাস্ বেশ কিছু থাকলেও, বিশেষতঃ শস্যজাতীয় খাদ্যে ফাইটিন-সংযোগে থাকাতে তা দেহের কোন কাজেই লাগে না। খাদ্যে ক্যাল্‌সিয়ামের অভাব হলেও ফস্‌ফরাস বিশেষ কোন কাজেই লাগে না। আবার যদি ক্যাল্‌সিয়াম উপযুক্ত পরিমাণে থাকে তাহলে ফাইটিন-সংযুক্ত নিষ্ক্রিয় অবস্থাও সক্রিয় ফস্‌ফরাসে রূপান্তরিত হয়। অন্যদিকে খাদ্যে ভাইটামিন 'ডি'র অভাবে স্বাভাবিক হাড়-তৈরীর জন্য অত্যাবশ্যক ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাসের সমতা রক্ষা হয় না বলে রিকেট্‌স্ রোগ জন্মে। ফস্‌ফরাসের অভাবে পেশী ও স্নায়ুর ক্রিয়া ভাল হয় না, শরীরের হাড়গুলিও ঠিক মত বাড়ে না, এবং শর্করা, প্রোটীন ও স্নেহজাতীয় উপাদানেরও সম্যক্ আশোষণ ঘটে না অন্ত্রগুলির মধ্যে। দৈনিক গ্রহণীয় পরিমাণ প্রায় দেড়গ্রাম মাত্র।

লোহা—রক্তের লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিন নামক বর্ণদ্রব্যের জন্য লোহা অত্যাবশ্যক। আবার দেহের অক্সিজেন-সংযোগ প্রক্রিয়াতেও লোহা কতকটা সাহায্য করে। সাধারণতঃ মাংস, ডাল ও শাকপাতা প্রভৃতিতেই লোহা অধিক পরিমাণে থাকে। দৈনিক অন্ততঃ কুড়ি মিলিগ্রাম আবশ্যক।

সোডিয়াম—সাধারণতঃ প্রায় প্রত্যেক প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ খাদ্যেই কিছু না কিছু সোডিয়াম থাকে। রক্ত বা শরীরের যে কোন কলার জলীয় ভাগ-রক্ষার জন্য সোডিয়াম অত্যন্ত আবশ্যক। প্রত্যহ মূত্র ও ঘামের সঙ্গে অনেকটা সোডিয়াম লবণ শরীর হতে বেরিয়ে যায় বলে, আমাদের খাদ্যে খাদ্যলবণ থাকা চাই-ই-চাই। সেজন্যই আমরা সমুদ্রের জল হতে প্রস্তুত কিংবা সৈন্ধব লবণ রান্নাবান্নায় ও প্রয়োজন-মত খাদ্যের সঙ্গেও খাই। আবার এ খাদ্য লবণ হতেই আমাদের পাকস্থলীতে পাচকাম্লরসের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরী হয়।

পটাশিয়াম—সোডিয়ামের সঙ্গে প্রায়ই নানা খাদ্যে পটাশিয়ামও কিছু না কিছু বর্তমান থাকে। মাংস, মাছ ও মাটির নীচে জন্মায় যে সকল শিকড়-জাতীয় তরি-তরকারি, তাতেই পটাশিয়াম অধিক পরিমাণে থাকে। স্নায়ুর সক্রিয়তা ও কটিগ্রন্থির বহিরংশের হর্মোন-ক্ষরণের জন্য পটাশিয়াম অত্যাবশ্যক।

ক্লোরিন—সোডিয়াম ও পটাশিয়াম ও ক্যাল্‌সিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্লোরাইড লবণ-রূপেই কাজ করে ও তাদের সঙ্গে থাকে।

আয়োডিন—গলগ্রন্থির স্বাভাবিক ক্ষরণের জন্যই আয়োডিন আবশ্যক। সাধারণতঃ সামুদ্রিক মাছ ও কোন কোন শিকড়-জাতীয় তরি-তরকারিতেও কিছু আয়োডিন থাকে।

তামা, নিকেল, কোবাল্ট্, প্রভৃতি—এ সকল ধাতুর প্রয়োজন শুধু রক্তের হিমোগ্লোবিন উপাদানে লোহার সহায়ক হিসেবেই, সেজন্য অতি সামান্যমাত্র হলেই কাজ চলে। সাধারণতঃ শাকসবজি ও তরিতরকারিতেই এগুলি অল্প পরিমাণে থাকে, এবং কখন কখন রান্নার বাসন-কোসন হতেও খাদ্যে ঢুকে পড়ে—কিন্তু অম্লসহযোগে অধিক পরিমাণে খাদ্যে ঢুকলে বিষ হয়ে যায়। ভাইটামিন বি$_{১২}$-তে সর্বদাই অল্প পরিমাণে কোবাল্ট্ থাকে। ঐগুলির অভাবে অনেক সময়ে রক্তাল্পতা রোগ জন্মে।

প্রচুর শর্করা-জাতীয় উপাদানের সঙ্গে, সাধারণতঃ ভাইটামিন ও খাদ্য লবণ থাকে বলেই আমাদের খাদ্য-তালিকায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু ফলমূল, শাক-সবজি ও তরি-তরকারি থাকা উচিত।

ফল—ফলে সাধারণতঃ শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ জল থাকে। প্রোটীন ও স্নেহপদার্থ খুবই কম থাকলে কিংবা একেবারেই না থাকলেও তাদের মধ্যে পাকা অবস্থায় প্রচুর গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ-জাতীয় শর্করা, কেরোটিন, ভাইটামিন 'সি'ও ধাতব লবণ থাকে। কাঁচা অবস্থায় কোন কোন ফলে যে শ্বেতসার, অ্যাসিড, বা ট্যানিক অ্যাসিড থাকে, তাতেই সেগুলি হয় স্বাদহীন না হয় টক্ কিংবা কষায় কিন্তু যখন তা পাকে তখন ঐ উপাদানগুলিরই পরিবর্তন হয় গ্লুকোজ বা ফ্রুক্টোজে ব'লে, তাদের খেতে মিষ্টি লাগে। তাদের মধ্যে কোন কোন জাতীয় ফলে, যেমন কমলা, পাতিলেবু প্রভৃতিতে সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে, কোন কোনটিতে যেমন আপেল, নাশপাতি প্রভৃতিতে ম্যালিক অ্যাসিড থাকে, আবার কোন কোনটিতে যেমন তেঁতুলে থাকে টার্টারিক অ্যাসিড। সাইট্রিক ও ম্যালিক অম্ল অ্যাসিডযুক্ত ফলগুলি টক্ হলেও খেলে কোন অনিষ্ট হয় না, কারণ ঐগুলি সোডিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অ্যাসিডের পরিবর্তে ক্ষারেরই সৃষ্টি করে। ফলের মধ্যে সাধারণতঃ পেক্টিন নামক যে উপাদান থাকে তাতেই যখন চিনি, টক্ ও জল দিয়ে তাদের সিদ্ধ করা হয়, তখন তা চটচটে 'জেলি'তে পরিণত হয়। আবার ফলের মধ্যে কতকগুলি 'এন্‌জাইম' থাকাতে খিদে বাড়ে, এবং সেলুলোজ বা ছিবড়ে-জাতীয় শর্করা থাকাতে পায়খানাও পরিষ্কার হয়। ফলের কেরোটিন হতে অতি সহজেই যকৃতে ভাইটামিন 'এ' তৈরী হয় ব'লে ছোটছোট ছেলে-মেয়েদের পক্ষে ফল খাওয়া খুব ভাল, আর তাতে ভাইটামিন 'সি'-ও প্রচুর

থাকাতে ফল খেলে কখনই স্কার্ভি রোগ হয় না। ফলের মধ্যে যে ক্যাল্‌সিয়াম আছে, সিদ্ধ করলে ছিবড়ে হতে মুক্ত হয়ে তা বেরিয়ে আসে ব'লে কোন কোন ফলকে সিদ্ধ করে খেলে তাহতে বেশী ক্যাল্‌সিয়াম পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি ফলেরই একটা নিজস্ব স্নিগ্ধ ও উপাদেয় গন্ধ আছে। ফল পচে গেলে কখনই তা খাওয়া উচিত নয় কারণ তাহতে পেটের অসুখ হতে পারে। ফল খাওয়া মানে এই নয় যে আঙুর, আপেল, বেদানা ও কিশমিশ খেতে হবে। আমাদের দেশে সব ঋতুতেই কিছু না কিছু মৌসুমী ফল পাওয়া যায়, তারা সুলভ ও সুলভ্যও বটে। সুতরাং আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায়, সর্বদাই কিছু না কিছু এরকম ফল থাকা উচিত।

শাকসবজি ও তরি-তরকারি—উদ্ভিদের শিকড়, কাণ্ড, ফুল, পাতা, ফল প্রভৃতি সবই এর অন্তর্গত। আলু, রাঙা আলু, শালগম, মূলো, ওলকপি, ওল প্রভৃতি শিকড়জাতীয়; ডাঁটা, কুমড়ো ও লাউ'র ডাঁটা, কচুশাক প্রভৃতি কাণ্ড জাতীয়; বকফুল, লাউ বা কুমড়োর ফুল, ফুলকপি, পদ্ম প্রভৃতি ফুল জাতীয়; লাউ, কুমড়ো, শিম, শশা, বেগুন, বিলাতি বেগুন, ঝিঙ্গে, পটোল, উচ্ছে প্রভৃতি ফল জাতীয় এবং নটেশাক, লেটুসশাক, পালংশাক, কুমড়োশাক, পাটশাক, মেতিশাক, বাঁধাকপি প্রভৃতি পাতাজাতীয় সবজি। এদের মধ্যে জলীয় ভাগই প্রচুর, অর্থাৎ শতকরা ৭৫-৯৫ ভাগ, এবং দেহের ক্ষতিপূরক প্রোটীন ও কার্যক্ষমতা-দায়ক শর্করা বা স্নেহ-পদার্থেরও একান্ত অভাব। শর্করা প্রায়ই সেলুলোজ-রূপে থাকাতে তা শরীরের বিশেষ কাজে লাগে না, কিন্তু শিকড়জাতীয় আলু, রাঙাআলু প্রভৃতিতে যে শ্বেতসার থাকে শুধু তাহতেই যথেষ্ট কর্মশক্তির উদ্ভব সম্ভবপর, আর ঐ উপাদানের সঙ্গে যে প্রোটীন থাকে, তাও দেহের ক্ষতিপূরণের পক্ষে বেশ ভাল প্রোটীন বলে বিবেচিত হয়। তাদের মধ্যে প্রচুর ধাতব লবণ এবং কোন কোনটিতে প্রচুর কেরোটিন ও ভাইটামিন 'বি,' ও 'সি' থাকে ব'লেই তাদের খাদ্যমূল্য অবহেলার বস্তু নয়। আবার শাকসবজির ছিবড়ে-জাতীয় উপাদান অন্ত্রগুলির সঞ্চলন বাড়ায় সেজন্য খাদ্যে তাদের উপযুক্ত পরিমাণে উপস্থিতিতে কখনই কোষ্ঠকাঠিন্য ঘটতে পারে না। এ সকল নানা কারণেই প্রত্যহ আমাদের কিছু না কিছু শাকসবজি খাওয়া আবশ্যক। শাকপাতা সাধারণতঃ দামে সস্তা বলে, তাদের অবহেলা করা উচিত নয়, কারণ ঐ শাকপাতা হতে অতি সহজেই আমরা দেহের প্রয়োজন মত লোহা, ভাইটামিন 'এ'র পূর্ববর্তী কেরোটিন ও ভাইটামিন 'সি' পেতে পারি। কিন্তু তাই বলে ওগুলি বেশি...

নয়, কারণ তাতে পেটের অসুখ হতে পারে। আবার তাদের রান্নার সময়ও যাতে ভাইটামিন 'সি' ও কেরোটিন নষ্ট না হয়, তার জন্যও চেষ্টা করা উচিত। শাক-সবজিকে সিদ্ধ করে কখনই ঐ জল ফেলে দেওয়া উচিত নয় কারণ, তার সঙ্গে নানা প্রয়োজনীয় ধাতব উপাদানকে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। আবার বহুক্ষণ ধরে ঐ সকল উপাদানকে খোলা কড়াই বা পাত্রে উনুনের উপর সিদ্ধ বা ভাজা করতে থাকলেও ভাইটামিনগুলি নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য সিদ্ধ করতে হলে ঢাকা অবস্থায় যতটা কম সময়ে হয় তা করতে হবে, এবং ভাজা করতে হলে কড়া গরম তেল বা ঘিতে ফেলে দিয়ে কয়েক মিনিট নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিতে হবে। তা না হলে ভাইটামিনগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার অত্যন্ত আশঙ্কা থাকে।

সুসমঞ্জস খাদ্য-তালিকা

কোন কোন খাদ্যবস্তুতে কোন কোন উপাদান অধিক থাকে, আবার অন্যান্য খাদ্যবস্তুতে কোন কোন উপাদানের অভাবও লক্ষিত হয়। এজন্য দেহবৃদ্ধি, পরিপুষ্টি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নানা খাদ্যবস্তু-সমন্বিত সুসমঞ্জস খাদ্য প্রত্যহ গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। সুসমঞ্জস খাদ্য-তালিকা বলতে আমরা এমন একটি মিশ্র খাদ্য বুঝি যাতে প্রোটীন, শর্করা, স্নেহ, ধাতবলবণ ও ভাইটামিনগুলির সব কিছুই পরিমাণ এবং গুণানুসারে যথাযথভাবে আছে। যে কোন একটি খাদ্যবস্তুতে এরূপ সমন্বয় ও সামঞ্জস্য একান্ত বিরল। কেবল দুধ ও ডিম, এ দুটি পদার্থকেই কতকটা এরূপ সুসমঞ্জস এবং সম্পূর্ণ খাদ্য বলা চলে কারণ এ দুটির মধ্যেই দেহের বৃদ্ধি, পুষ্টি ও শক্তিবর্ধনোপযোগী উপাদানগুলি এবং অত্যাবশ্যক কয়েকটি ভাইটামিনও আছে। এজন্যও একক বস্তু-হিসেবে কেবল এ দুটি পদার্থকেই আদর্শ খাদ্য বলে মনে করা যেতে পারে। **দুধে** শতকরা চারভাগ সহজপাচ্য ও দেহপুষ্টিকারক প্রোটীন, যথেষ্ট পরিমাণে ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস এবং ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি' থাকাতে শিশুদের দেহবৃদ্ধি, রুগ্ন ও বৃদ্ধদের পরিপুষ্টির জন্য এবং গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদান কালে জননীদের পক্ষেও এটি একটি অত্যাবশ্যক মূল্যবান্ খাদ্য। শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তিদের পক্ষে দুধ একটি প্রকৃষ্ট খাদ্য হলেও বয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষে কেবল দুধ পান করে বেঁচে থাকা চলে না; কারণ দুধে খাদ্যোপাদানের তুলনায় জলীয় ভাগ এত অধিক যে দিনে কমপক্ষে চার-পাঁচসের দুধ পান করা আবশ্যক, সুতরাং শুধু যে তা দুর্মূল্য এমনই নহে, পরন্তু বারবার কেবল দুধ পান করে থাকা

অত্যন্ত একঘেয়ে ও বিরক্তিকরও বটে। সুতরাং কেবল দুধের উপর নির্ভর না করে দুগ্ধজাত নানা রসনা-তৃপ্তিকর আহার্য, যেমন ক্ষীর, দই, ঘোল, পনির, ছানা,সন্দেশ, রসগোল্লা, ঘি, মাখন প্রভৃতিও গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু ঐ সকল মূল্যবান্ উপাদেয় খাদ্য-সম্ভারের ব্যয়-বহন জনসাধারণের সাধ্যায়ত্ত নয়। দুধের মত **ডিমও** একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্য। ডিমের শ্বেতাংশ ও কুসুমে প্রচুর প্রোটীন ত আছেই, এতদ্ব্যতীত কুসুমাংশে লেসিথিন প্রভৃতি স্নেহজাতীয় উপাদান, ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাস্ প্রভৃতি ধাতব লবণ এবং ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি'ও যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় এটিও শিশু, রোগী, গর্ভিণী ও জননী প্রভৃতির পক্ষে একটি অতি পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু কেবল ডিম খেয়ে বেঁচে থাকা কিংবা স্বাস্থ্যরক্ষা করা সম্ভবপর নয়, কারণ এতে অজীর্ণ-দোষ, যকৃতের ও বৃক্কের বৈকল্য প্রভৃতিরও যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। কাঁচা কিংবা আধসিদ্ধ ডিম সুপাচ্য হলেও অধিক সিদ্ধ কিংবা ভাজা ডিম অত্যন্ত গুরুপাক খাদ্য।

দুধ ও ডিমের পরই খাদ্য-মূল্য হিসেবে **মাংস ও মাছের** স্থান। যে কোন প্রাণীর মাংসেই প্রোটীন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, তাছাড়া খাসী, রাজহাঁস প্রভৃতির মাংসে যথেষ্ট পরিমাণে চর্বিও থাকে। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অধিক মাংস খাওয়া উচিত নয় কারণ তাতে সর্বদাই শরীরে অত্যধিক উত্তাপ বেড়ে যায় এবং অত্যধিক ডিমের আহার-জনিত কুফলগুলিও দেখা দিয়ে স্বাস্থ্য নষ্ট করে ফেলতে পারে। সেজন্য জৈব প্রোটীন হিসেবে চতুষ্পদ প্রাণীর দুষ্পাচ্য লাল মাংস অপেক্ষা পাখীর কিংবা খরগোশের সুপাচ্য সাদা মাংস কিংবা **মাছই** সর্বদা খাওয়া উচিত। কোন কোন মাছে, যেমন ইলিশ, বাচা, পাকা রুই, কাতলা প্রভৃতিতেও চর্বি কতকটা থাকে। নিরামিষাশী ব্যক্তির পক্ষে সর্বদাই ছানা, রসগোল্লা, সন্দেশ, পনির প্রভৃতি জৈবপ্রোটীন খাওয়া আবশ্যক। উদ্ভিজ্জ প্রোটীন-হিসেবে নানাপ্রকারের ডাল, কড়াইশুঁটি, শিমের বীচি, বরবটি প্রভৃতিরও কিয়ৎপরিমাণে খাদ্য-তালিকায় স্থান হওয়া উচিত। অঙ্কুরিত ছোলা কিংবা মুগে যথেষ্ট পরিমাণে ভাইটামিন 'বি,' ও 'সি' ও ধাতব লবণ প্রভৃতি থাকাতে নারকেল ও গুড় কিংবা আদা, কাঁচালঙ্কা ও লবণ-সহযোগে তাও অতি মুখরোচক ও পুষ্টিকর খাদ্য।

সিদ্ধ চালের ফেনসমেত ভাত এবং হাতে গড়া লাল আটার রুটিই আমাদের খাদ্য-তালিকার প্রধান উপাদান। চালের প্রোটীন দেহগঠনের পক্ষে গমের প্রোটীনের চেয়ে অধিক কার্যকর হলেও, গমে চাল অপেক্ষা প্রোটীনের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৩-৪ ভাগ বেশী। এজন্য ভাতের সঙ্গে কতকটা

আটার রুটি কিংবা পুরী খাওয়া উচিত। খাদ্য-হিসাবে ময়দা আটা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর।

স্নেহজাতীয় খাদ্যরূপে বিশুদ্ধ মাখন, ঘি, সরষের তেল, চীনে বাদাম তেল, নারকেল তেল, তিল তেল প্রভৃতি কিছু না কিছু গ্রহণ করা উচিত।

আলু, রাঙ্গা আলু, প্রভৃতিতে শ্বেতসার ও ভাল প্রোটীন আছে। মূলজাতীয় তরকারিতে ক্যাল্‌সিয়াম ও অন্যান্য ধাতব লবণ থাকে। শিমজাতীয় তরকারিতে প্রোটীনের প্রাধান্য দেখা যায়। গাজরে যথেষ্ট কেরোটিন আছে এবং বিলাতি বেগুনে ভাইটামিন 'সি' প্রচুর পরিমাণে থাকে। বিটমূলে যথেষ্ট চিনি থাকে। এবং কাঁচা পেঁপেতে প্রোটিনের পরিপাকের সহায়তার জন্য 'পেপেন' নামক একটি এন্‌জাইম থাকে। সুতরাং তরকারি-হিসেবে এগুলিই অধিক পরিমাণে খাওয়া উচিত।

শাক-পাতা প্রভৃতিতে যথেষ্ট পরিমাণে কেরোটিন, ভাইটামিন 'সি', ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস, ও লোহাঘটিত ধাতব লবণগুলি থাকে। এতদ্ব্যতীত এগুলিতে প্রচুর ছিবড়ে-জাতীয় সেলুলোজ নামক পদার্থ থাকাতে কোষ্ঠ-পরিষ্কারেরও সাহায্য হয়। আবার শাক্-সবজির দ্বারা রক্তের ক্ষারত্ব বৃদ্ধি পায় বলে তা খেলে সহজেই নানা রোগের প্রতিষেধক শক্তি জন্মে। এজন্যই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রত্যহ শাকপাতা ও সবজি প্রভৃতি কতকটা খাওয়া অত্যাবশ্যক। শাককে ভাজা না করে অল্প সিদ্ধ করে অথবা 'স্যালাড'রূপে কাঁচা অবস্থায় খেলে অধিকতর উপকার পাওয়া যায়।

খাদ্যকে উপাদেয় ও মুখরোচক করার জন্য অল্প পরিমাণে হলুদ, ধনে, লঙ্কা ও সরষে প্রভৃতি মসলা ও পরিমিত খাদ্যলবণও অত্যাবশক। কোন অবস্থাতেই অধিক মসলা খাওয়া উচিত নয়, কারণ তাতে পরিপাকশক্তি নষ্ট হতে পারে।

ফলমূলও সর্বদা কিছু না কিছু খাওয়া উচিত। প্রত্যেক সুমিষ্ট ফলেই যথেষ্ট পরিমাণে গ্লূকোজ ও ফ্রুক্টোজ নামক দুটি শর্করা ও ভাইটামিন 'সি' থাকে। কমলালেবু, পাকা পেঁপে, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলে যথেষ্ট কেরোটিন থাকে। নারকেল, বাদাম, পেস্তা, আখরোট প্রভৃতি ফলে স্নেহজাতীয় উপাদানের সঙ্গে কতকটা প্রোটীনও দেখা যায়। কমলালেবু, পাতিলেবু, বাতাবিলেবু, মুসাম্বি প্রভৃতি ফলে সাইট্রিক অ্যাসিড, আপেল প্রভৃতিতে ম্যালিক এসিড ও তেঁতুল প্রভৃতিতে টার্টারিক এসিড আছে; অ্যাসিডগুলির দ্বারা পরিপাকের যথেষ্ট সাহায্য হয়। আবার ফলগ্রহণে একদিকে যেমন রক্তের ক্ষারত্ব বৃদ্ধি হয়

আবার তেমনি কোষ্ঠ-পরিষ্কারেরও সাহায্য হয়। এজন্য স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খাদ্য-তালিকায় ফলমূল একটি অত্যাবশ্যক উপাদান।

চিনিতে শর্করা ছাড়া আর কিছু থাকে না, কিন্তু গুড়ে শর্করা-ব্যতীত নানা ধাতব লবণ এবং অন্যান্য উপাদানও অল্পমাত্রায় থাকাতে খাদ্য-হিসেবে চিনি অপেক্ষা গুড় অধিক মূল্যবান্।

দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ—সকলের পক্ষে আবশ্যক দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ ঠিক এক নয়। বয়স, কায়িক পরিশ্রম, শরীরের কোন বিশেষ অবস্থা এবং আবহাওয়া-অনুসারে খাদ্যের পরিমাণেরও কম-বেশি হয়। গৃহীত খাদ্যের দ্বারা কী পরিমাণে উত্তাপ উৎপন্ন হয়, তার উপরই খাদ্যের পরিমাণ নির্ভর করে। খাদ্য হতে সঞ্জাত উত্তাপ **ক্যালরি** * -হিসেবে পরিমিত হয়। একজন বয়স্ক স্বল্পশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে দৈনিক ২৫০০ হতে ২৬০০ ক্যালরি আবশ্যক। কিন্তু একেবারেই পরিশ্রম না করে শয্যায় শুয়ে থাকলেও হৃৎপিণ্ড, অন্ত্র প্রভৃতি দেহের আন্তর যন্ত্রের ক্রিয়ার জন্যও ন্যূনকল্পে ১৬০০ ক্যালরি না হলে চলে না। যাদের অতিরিক্ত পরিমাণে কায়িক পরিশ্রম করতে হয় তাদের পক্ষে দৈনিক কার্যের পরিমাণ-অনুসারে ২৮০০—৩২০০ ক্যালরি প্রয়োজন। মেয়েদের গর্ভাবস্থায় কিংবা স্তন্যদানকালেও কতকটা বেশি অর্থাৎ ২৬০০-২৮০০ ক্যালরি আবশ্যক। শীতপ্রধান দেশেও গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা ক্যালরির পরিমাণ কতকটা অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। জন্ম হতে সম্যক্ দেহবৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত গৃহীত ক্যালরির অনুপাত বয়স্ক ব্যক্তির তুলনায় অধিকতর হওয়া উচিত।

প্রত্যহ ন্যূনকল্পে ৬০ গ্রাম প্রোটীন (এর মধ্যে অবশ্যই জৈব প্রোটীনের পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ থাকবে), ৪৫০ গ্রাম শ্বেতসার ও শর্করা এবং ৫০ গ্রাম স্নেহ, ০·৫-০·৭ গ্রাম ক্যাল্‌সিয়াম, ১ গ্রাম ফস্‌ফরাস, ২০ মিলিগ্রাম লোহা ও যথেষ্ট পরিমাণে নানাপ্রকারের ভাইটামিন থাকা আবশ্যক। শিশুদের পক্ষে অস্থিবৃদ্ধির জন্য ন্যূনকল্পে দৈনিক এক গ্রাম ক্যাল্‌সিয়াম এবং প্রচুর ভাইটামিন 'ডি'র প্রয়োজন।

একজন পূর্ণবয়স্ক বাঙালীর পক্ষে বিভিন্ন খাদ্যের পরিমাণ ও ক্যালরি-সমন্বিত খাদ্যতালিকার নমুনা দেওয়া গেল। ইচ্ছে এবং রুচি-অনুসারে প্রয়োজন-মত তার কতকটা পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধন করা যেতে পারে।

* একহাজার গ্রাম জলের উত্তাপকে এক ডিগ্রী বাড়াতে হলে যে পরিমাণ উত্তাপ আবশ্যক তারই নাম ক্যালরি।

খাদ্য-তালিকা

খাদ্যোপাদান	পরিমাণ	ক্যালরি
সিদ্ধ চাল	ছয় ছটাক	১১৭৩
লাল আটা	দু "	৩৫০
ডাল	এক "	১৯৩
দুধ	ছয় "	২২৪
তরকারি	তিন "	৯৩
শাকপাতা (নটেশাক)	দু "	২০
তেল বা ঘি	আধ "	২৫২
ফলমূল	এক "	৮২
মাছ	দু "	১২০
গুড় বা চিনি	আধ "	১০৭
		মোট ২৬১৪

আমরা সাধারণতঃ যে সকল বস্তু প্রতিদিন খাই সে অনুসারেই এ খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। ইচ্ছে ও পছন্দমত সুসমঞ্জস কোনও খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করতে হলে কোন কোন খাদ্যে, কী কী পরিমাণে বিভিন্ন উপাদানগুলি আছে, তা জানা আবশ্যক ; পরিপুষ্টি ও খাদ্যতালিকা-প্রণয়ন করতে হলে ভাল বই হতে এরূপ কোন তালিকা দেখে বিভিন্ন সাধারণ খাদ্যবস্তুর উপাদানগুলির পরিমাণ জেনে, উপরের তালিকার আদর্শে যে কোন সুগৃহিণীই প্রয়োজন, রুচি, পছন্দ ও বস্তুগুলির সুলভ্যতা-অনুসারে গৃহের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকা এমনভাবে প্রস্তুত করতে পারবেন, যাতে উপযুক্ত কায়িক পরিশ্রম-সত্ত্বেও পরিবারের প্রত্যেকেরই উপযুক্তভাবে দেহের পরিপুষ্টি হবে ও স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকবে। রুগ্ন ব্যক্তির কিংবা গর্ভিণী ও প্রসূতির জন্য বিশিষ্ট খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে হলে কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ-অনুসারেই খাদ্যবস্তুর নির্বাচন ও তাদের সমন্বয়ে খাদ্যতালিকাটি ঠিক করা উচিত। প্রাত্যহিক খাদ্যতালিকাতে একই বস্তুর বহুদিন ধরে পুনরাবৃত্তি হতে থাকলে, সময়ে সময়ে তা অত্যন্ত একঘেয়ে ও অরুচিকর হয়ে উঠে। সেজন্য মাঝে মাঝে খাদ্য-তালিকাতে একই গুণ অর্থাৎ সম উপাদান ও খাদ্যমূল্য ও আস্বাদযুক্ত যে কোন বস্তুর আবশ্যকমত কিছুটা অদল-বদল, সামান্য পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধন কিংবা একই উপাদানের সাহায্যে পৃথক্ পৃথক্ পদ রান্না করলেও খাদ্যের এরূপ বিরক্তিকর একঘেয়েমি দূর করা যেতে পারে।

শিশু ও বালক-বালিকার খাদ্য

একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের পক্ষে দৈনিক যে পরিমাণ ক্যালরি আবশ্যক, যাদের শরীর বাড়বে, অর্থাৎ শিশু বালকবালিকার পক্ষে (অর্থাৎ চৌদ্দ বছরের কম) তার অনুপাত কী হওয়া উচিত তা নীচে দেওয়া গেল।

বয়স	অনুপাতের হার	স্বল্প পরিশ্রমীর পক্ষে আবশ্যক ক্যালরির পরিমাণ
১৪ বৎসরের উপরের	১	২৬০০
১২—১৪ বৎসর	$\frac{৪}{৫}$	২০৮০
১০—১১ "	$\frac{৭}{১০}$	১৮২০
৮—৯ "	$\frac{৩}{৫}$	১৫৬০
৬—৭ "	$\frac{১}{২}$	১৩০০
৪—৫ "	$\frac{২}{৫}$	১০৪০
২—৩ "	$\frac{৩}{১০}$	৭৮০
০—২ "	$\frac{১}{৫}$	৫২০

আবার দেহবৃদ্ধির জন্য শিশু ও বালকবালিকার পক্ষে দেহের প্রোটীনের অনুরূপ প্রোটীন, লবণ-জাতীয় উপাদান ও কোন কোন ভাইটামিনও অধিক পরিমাণে আবশ্যক। সে জন্য যেখানে দেহবৃদ্ধির কোন প্রশ্ন নেই অর্থাৎ বয়স্ক লোকের পক্ষে কেবল দেহের ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে প্রতিসের ওজনের জন্য এক গ্রাম করে প্রোটীন আবশ্যক সেখানে এক হতে তিন বছরের শিশুর পক্ষে সাড়ে তিন গ্রাম, তিন হতে পাঁচ বছরের শিশুর পক্ষে তিন গ্রাম এবং পাঁচ হতে পনর বছরের বালক-বালিকার পক্ষে আড়াই গ্রাম করে আবশ্যক। এইজন্যই উপযোগী প্রোটীন আছে যে সকল খাদ্য-বস্তুতে যেমন দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, আলু ও ভাত, তাই একবছরের অধিক বয়স্ক শিশু ও বালকবালিকার পক্ষে উপযুক্ত খাদ্য। পরিমিত ক্যালরির জন্য অবশ্যই কিছু না কিছু শর্করা-জাতীয় ও স্নেহ-জাতীয় উপাদান আবশ্যক। আলু ও ভাতের কথা আগেই বলা হয়েছে, তার সঙ্গে কিছু আটার রুটিও দেওয়া ভাল। যে সকল স্নেহজাতীয় খাদ্যে ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি' আছে যেমন দুধ, ঘি, মাখন প্রভৃতি, সেগুলি খেতে দিলে একই সঙ্গে উপযুক্ত ক্যালরি ও দেহবর্ধক ও অস্থিবর্ধক ভাইটামিনগুলিও পাওয়ার সুবিধে

হয়। আর তা না দিতে পারলে অবশ্যই কিছু পরিমাণে কডলিভার অয়েল, হ্যালিবাট-অয়েল কিংবা হাঙ্গরের যকৃৎ-নিঃসৃত তেল (Shark-liver oil) কিছু কিছু রোজ দিলে ভাল হয়। দেহবর্ধক অপর ভাইটামিন বি$_2$ (১) এর জন্য দুধ, ঈষ্ট প্রভৃতিও তাদের খাদ্যে থাকা উচিত। ভাইটমিন 'এ' ও 'সি'র জন্য আম, কাঁঠাল, পেঁপে প্রভৃতি পাকা ফল, এবং গাজর, বিলাতি বেগুন ও শাকপাতা প্রভৃতিও যথেষ্ট দেওয়া উচিত যাতে শিশুদের ও বালকবালিকার পক্ষে বয়স্ক লোকের জন্য আবশ্যক পরিমাণের দেড় গুণ (অর্থাৎ ৬৩০০—৮৪০০) হতে দ্বিগুণ (৮৪০০—১১২০০) ইউনিট প্রত্যহ থাকে। একই ভাবে ভাইটামিন বি$_2$ (১) অর্থাৎ রিবোফ্লেবিনেরও পরিমাণ তিন হতে পাঁচ মিলিগ্রাম এবং ভাইটামিন 'ডি'র পরিমাণ ২০০০—৫০০০ ইউনিট হওয়া চাই। ভাইটামিন 'সি' কিন্তু দৈনিক ৫০ মিলিগ্রাম হলেও চলে ; ফলমূল প্রভৃতি হতেই তা সহজে পাওয়া যায়।

ধাতব লবণগুলির মধ্যে অস্থিবৃদ্ধির জন্য ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাসের এবং রক্ত তৈরীর জন্য লোহার আবশ্যক থাকাতে, প্রাপ্তবয়স্ক লোকের তুলনায় শিশুর ও বালকবালিকার দৈনন্দিন খাদ্যে ওগুলির পরিমাণও কিছুটা বেশী থাকা আবশ্যক। যেমন বয়স্ক লোকের পক্ষে দৈনিক ০·৬৮ গ্রাম ক্যাল্‌সিয়াম আবশ্যক হলেও শিশু ও বালকবালিকার পক্ষে অন্ততঃ এক গ্রাম না হলে চলে না। একই ভাবে তাদের খাদ্যে ফস্‌ফরাস্‌ ও লোহার পরিমাণও কিছু বেশী থাকা অত্যাবশ্যক।

জন্ম হতে প্রায় দশ মাস পর্যন্ত শিশুর পক্ষে মায়ের দুধই সর্বাপেক্ষা উপযোগী খাদ্য। কোন অবস্থাতেই শিশুকে ভগবানের দেওয়া খাবার হতে বঞ্চিত করে অন্য খাদ্য দেওয়া উচিত নয়। কেবল মা মরে গেলে কিংবা অত্যন্ত অসুস্থা হয়ে পড়লে, গরুর দুধে সমপরিমাণ জল মিশিয়ে তার সঙ্গে কিছু চিনি, ক্রীম, ও ফলের রস দেওয়া যেতে পারে। এ ভাবেই গরুর দুধকে অনেকটা মায়ের দুধের মত করে খেতে দিলে ভাল হয়। গাধার দুধ অনেকটা মানুষের দুধের মত বলে, তাও দেওয়া যেতে পারে।

এক হতে দেড় বছরের শিশুকে মায়ের দুধ বন্ধ করে ঐ রকম গরুর দুধ (কিন্তু জলের ভাগ ক্রমশঃই কম), ডিম (আধসিদ্ধ), পুডিং, আলুসিদ্ধ, অল্প ভাত এবং ফলের রস দেওয়া উচিত।

দেড় হতে তিন বছরের শিশুকে সকালে পরিজ (ওট), দুধ, আধসিদ্ধ ডিম, রুটি ও মাখন ; দুপুরে ভাত কিংবা রুটি, মাছ বা মাংস, পুডিং, ফল প্রভৃতি

বিকেলে রুটি, মাখন ও দুধ এবং রাত্রিতে ভাত বা রুটি, দুধ, মাছ, পুডিং, ফল প্রভৃতি দেওয়া উচিত।

বালকবালিকাদিগকে প্রাপ্তবয়স্কদের মতই মিশ্র খাদ্য দিনে চারবার করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সব সময়েই লক্ষ্য রাখতে হবে যে তারা যেন দেহের পক্ষে উপযোগী প্রোটীন, ভাইটামিনপূর্ণ স্নেহপদার্থ, কোরোটিন ও ভাইটামিন 'সি' পূর্ণ ফলমূল ও শাকসবজি, এবং ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস, ও লোহা-পূর্ণ খাদ্যাদি—যেমন দুধ, ডিম, মাছ ও মাংস প্রভৃতি উপযুক্ত পরিমাণে খেতে পায়।

শিশু ও বালকবালিকার দেহবৃদ্ধির পক্ষে অত্যাবশ্যক সকল উপাদানই—যেমন প্রোটীন, স্নেহ, ক্যাল্‌সিয়াম, ফস্‌ফরাস্ প্রভৃতি ধাতব লবণ, 'এ', 'ডি' ও 'বি$_২$' (২) প্রভৃতি ভাইটামিনও প্রচুর থাকাতে দুধ ও ডিম, এ দুটিই শিশুদের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্য। সুতরাং অন্য বস্তুর উপর বিশেষ জোর না দিয়ে যদি শিশু ও বালকবালিকার খাদ্যে যাতে অন্ততঃ এ দুটি উপাদান উপযুক্তভাবে থাকে, তার ব্যবস্থা করা যায় তাহলেই তাদের সম্যক্ দেহবৃদ্ধি সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন আশঙ্কার কারণ থাকে না।

প্রশ্ন

(১) গৃহস্থালি-পরিচালনার অর্থ কি?

(২) বাসগৃহে মানুষের শত্রু কতকগুলি কীট-পতঙ্গের নাম কর। কী কী ভাবে তাদের অনিষ্টকারিতা দূর করা সম্ভবপর?

(৩) নিত্য ব্যবহার্য বাসন-কোসন কীরূপে রাখা যায়?

(৪) জলীয় চক্রচিহ্ন কাকে বলে? তার প্রতিষেধের ও তাকে দূর করার উপায় কি?

(৫) কাপড় কাচার কয়েকটি উপাদানের দোষগুণ বিচার কর?

(৬) হাতে বোনা গরম সোয়েটার কী ভাবে বাড়ীতে কাচা উচিত?

(৭) খাদ্য রান্না করে খাওয়ার প্রয়োজন কি?

(৮) ভাইটামিন 'এ' ও 'সি' সম্বন্ধে কি জান?

(৯) সুসমঞ্জস খাদ্য কাকে বলে?

(১০) শিশুর পক্ষে উপযুক্ত খাদ্য কী ভাবে ব্যবস্থা করা যায়?